অপরাজিতা

শারদ সংকলন ■ ১৪২৫ ২০১৮ ■ দ্বিতীয় সংখ্যা

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
Tejgaon Sanatan Samaj Unnaayan Parishad

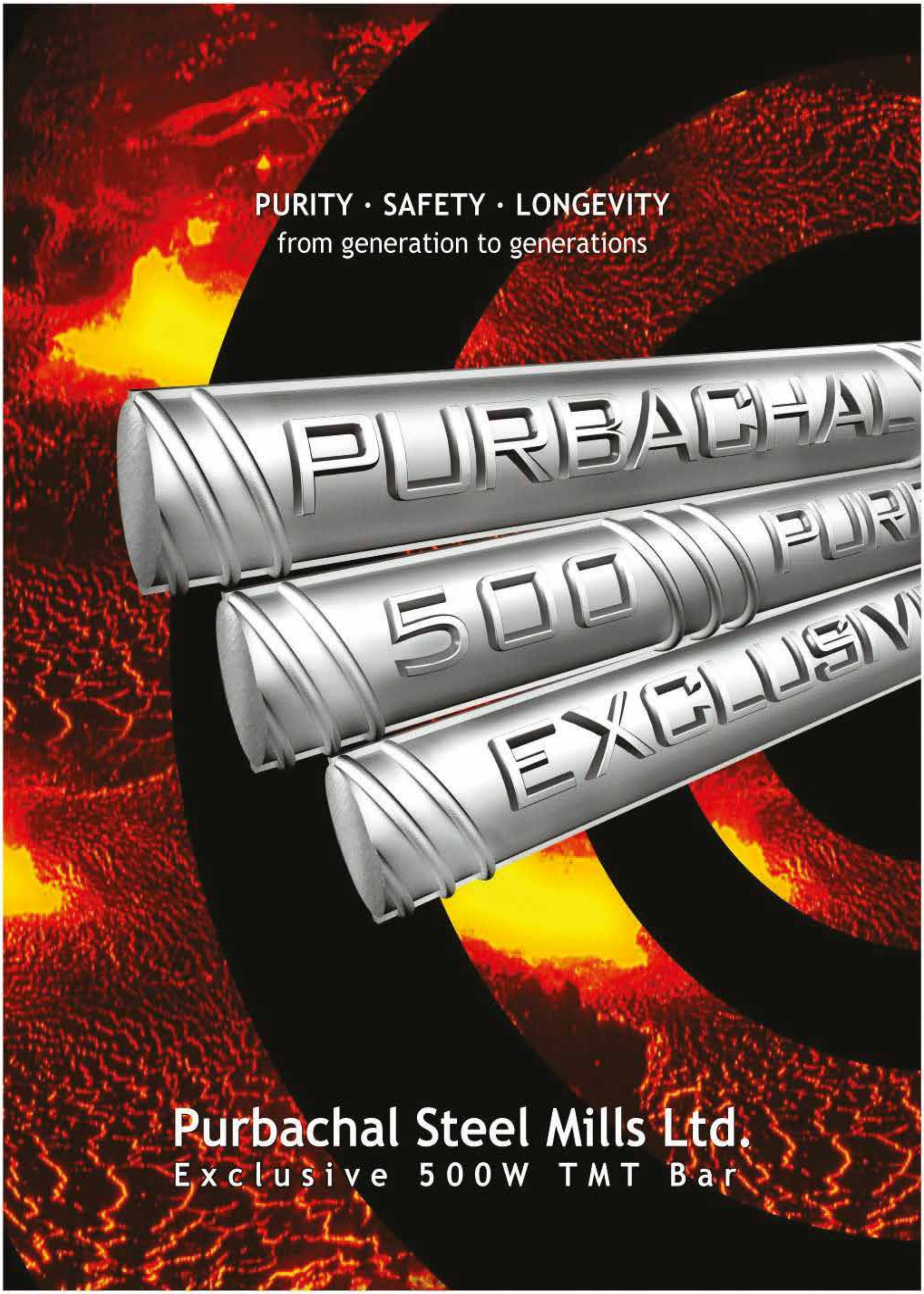
PURITY · SAFETY · LONGEVITY
from generation to generations
PURBACHAL
500
Purbachal Steel Mills Ltd.
Exclusive 500W TMT Bar

শারদ দুর্গোৎসব
২০১৯

অপরাজিতা

শারদ সংকলন
১৪২৫ বঙ্গাব্দ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় সংখ্যা

উৎসর্গ
বিশ্বের সকল নিপীড়িত মানুষের উদ্দেশ্যে

সম্পাদক
প্রফেসর স্বপন কুমার বনিক

সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য
সঞ্জীব মৈত্র
নিখিল চন্দ্র সরকার
অপূর্ব কুমার রাহুত
সুবিমল সিকদার
অসীম কুমার দাস
প্রকাশ আদিত্য
কেশব সেন
রনজিৎ পাল
প্রদীপ কুমার সাহা
মৃত্যুঞ্জয় রায়
দীপক লাল কর্মকার

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

সার্বিক সহযোগীতায়
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন
দীপক লাল কর্মকার
প্রকাশ আদিত্য

প্রকাশনায়
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

মুদ্রণে
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
Mob: 01715-596421, E-mail: shabdakoli70@gmail.com

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

০৪ কার্তিক ১৪২৫
১৯ অক্টোবর ২০১৮

বাণী

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আবহমানকাল ধরে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদযাপন করে আসছে। দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক উৎসবও। দুর্গোৎসব উপলক্ষে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী একত্রিত হন, মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সার্বজনীন। দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা দেশের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠুক; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধনকে আরো সুসংহত করুক-এ কামনা করি।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় জীবনে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মানও অব্যাহতভাবে বাড়ছে। কমছে দারিদ্র্যের হার। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে সম্মিলিত প্রয়াস। আমাদের চিরাচরিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই।

মানবতাই ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে, দেখায় মুক্তির পথ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। দুস্থ ও অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে উদ্বুদ্ধ করুক, বিশ্ব মানবতার জয় হোক-এ প্রত্যাশা করি।

শারদীয় দুর্গোৎসব সফল হোক-এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ কার্তিক ১৪২৫
১৯ অক্টোবর ২০১৮

বাণী

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা উপলক্ষে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এ আপ্ত বাক্যে উজ্জীবিত হয়ে আমরা সবাই একসাথে উৎসব পালন করব। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সকলে মিলে যুদ্ধ করে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। তাই এই দেশ আমাদের সকলের।

আমার প্রত্যাশা, বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে সক্ষম হব।

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রীশ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক অপরাজিতা শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব নয়। এটি আজ সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানব জাতিসহ সকল জীবের কল্যাণ কামনায় বাঙ্গালির অন্যতম উৎসব। অশুভ শক্তির বিনাশ ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে দিয়ে উদযাপন করা হয় শারদীয় দুর্গোৎসব। শারদীয় দুর্গোৎসবের এ আনন্দঘন সময়ে আমি সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

দুর্গাপূজা বাঙ্গালী চেতনার মানসপটে এক সংহতির প্রতীক। জগজ্জননীর আগমনী বার্তায় সকলের প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছে মঙ্গলবার্তা। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা এই শাশ্বত মন্ত্রে সবাইকে এক করেছে, এক সুরে বেঁধেছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বাংলাদেশ রয়েছে এক ধাপ এগিয়ে। এদেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অংশগ্রহণে হয়ে ওঠে সার্বজনীন। আনন্দঘন ও উৎবমূখর পরিবেশে এ দুর্গোৎসব পালনে সরকার বিভিন্ন সহায়তা দিচ্ছে। এ বছরও এ উৎসব সকলের মাঝে সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি শারদীয় দুর্গাপূজার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(ওবায়দুল কাদের, এমপি)

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির মূল সুর-ধর্মাচরণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের, কিন্তু উৎসব সব মানুষের। বাঙালি চেতনা থেকে উৎসারিত আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় শারদীয় দুর্গোৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ পূজোয় সার্বজনীনতার বাণী সেভাবেই উঠে এসেছে।

শারদীয় দুর্গোৎসবে দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ দ্বিতীয়বারের মত এবছরও শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রথম বারের মত এবারেও প্রকাশ করতে যাচ্ছে "অপরাজিতা" শীর্ষক একটি স্মরণিকা। আমি তাদের এ মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

পুরাণ মতে, অসুরের আস্ফালনে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, দেবতারা যার যার অস্ত্র তুলে দিলেন মা দুর্গাকে। মা দুর্গা হলেন দশভুজা। এই দশভুজা মা দুর্গার হাতেই বধ হল অসুর, জয় হল দেবকূলের। অশুভ শক্তি আজও বিরাজমান সর্বত্র। কালের বিবর্তনে আজ এর রূপ হয়েছে ভিন্ন হতে ভিন্নতর। আজ শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বের মানুষ ধর্মান্ধতা ও সহিংসতার ভয়াবহ দানবের হাতে পীড়িত হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ আজ সেই অসুরশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। মা-দূর্গার কাছে প্রার্থনা দেশ, বিশ্ব, সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা, বর্বরতা দূর হোক। মানুষের মন থেকে দূর হোক লোভ, লালসা আর হিংসা।

জগতের সকল প্রাণি শান্তিতে থাকুক, শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করুক এ প্রত্যাশা রইল।

(আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি)

মন্ত্রী
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুর্গাপূজা আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানব জাতিসহ সকল জীবের কল্যাণ কামনায় বাঙালির অন্যতম উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, কারণ এই উৎসব হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারন করে রেখেছে। বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা এই শাশ্বত মন্ত্রে সবাইকে এক করেছে। এক সুরে বেধেঁছে। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ দ্বিতীয়বারের মত এবছর শারদীয় দূর্গাপূজার আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে “অপরাজিতা” শীর্ষক একটি স্মরণিকা। আমি তাঁদের এ মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মানুষের উচিৎ বিশ্বের সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা। সকলে শান্তিতে থাকুক, শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করুক এ প্রত্যাশা রইল। সবাইকে শারদ উৎসবের শুভেচ্ছা। সেই সাথে “অপরাজিতা” এর দ্বিতীয় সংখ্যার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ মুজিবুল হক, এমপি)

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির মূল সুর-ধর্মাচরণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের, কিন্তু উৎসব সব মানুষের। বাঙালি চেতনা থেকে উৎসারিত আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় শারদীয় দুর্গোৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ পূজোয় সার্বজনীনতার বাণী সেভাবেই উঠে এসেছে।

শারদীয় দুর্গোৎসবে দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ দ্বিতীয়বারের মত এবছরও শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রথম বারের মত এবারেও প্রকাশ করতে যাচ্ছে "অপরাজিতা" শীর্ষক একটি স্মরণিকা। আমি তাদের এ মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

পুরাণ মতে, অসুরের আস্ফালনে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, দেবতারা যার যার অস্ত্র তুলে দিলেন মা দুর্গাকে। মা দুর্গা হলেন দশভুজা। এই দশভুজা মা দুর্গার হাতেই বধ হল অসুর, জয় হল দেবকূলের। অশুভ শক্তি আজও বিরাজমান সর্বত্র। কালের বিবর্তনে আজ এর রূপ হয়েছে ভিন্ন হতে ভিন্নতর। আজ শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বের মানুষ ধর্মান্ধতা ও সহিংসতার ভয়াবহ দানবের হাতে পীড়িত হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ আজ সেই অসুরশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। মা-দূর্গার কাছে প্রার্থনা দেশ, বিশ্ব, সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা, বর্বরতা দূর হোক। মানুষের মন থেকে দূর হোক লোভ, লালসা আর হিংসা।

জগতের সকল প্রাণি শান্তিতে থাকুক, শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করুক এ প্রত্যাশা রইল।

(আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি)

মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নীলাকাশের মাঝে খণ্ড খণ্ড মেঘের ভেলা, চারিদিকে তেমন তাতানো প্রখরতা নেই। এরই মাঝে পৃথিবীকে জানান দেয়, এখন আসছে প্রকৃতির সেই শরৎকাল। আর এই শরতেই শুরু শারদোৎসব। শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দুদের প্রধান উৎসব। শক্তি, কল্যাণ, শান্তি, শ্রী ও সমৃদ্ধি কামনা পূজিতা দেবীর সৃষ্টির কারণ স্বরূপ। মহিষাসুর বধের জন্য দেবতাদের প্রার্থনায় ও সম্মিলিত তেজে মা দুর্গা আবির্ভূত হয়ে মহিষাসুরকে বধ করে। দেবকুল মাতৃরূপে দেবী দুর্গাকে বন্দনা করেন। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দঘন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশকে করেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্ম যার যার উৎসব সবার।

"তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ" দ্বিতীয়বারের মত সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে "শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা" আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই দুর্গাপূজা উৎসবে সংগঠন থেকে দ্বিতীয়বারের মত "অপরাজিতা" নামে স্মরণিকা প্রকাশের জন্য আমি আনন্দিত এবং উক্ত পরিষদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সর্বত্র আজ মহিষাসুর নামক দানবদের বিচরণ। তাই মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা, এই অশুভ শক্তির বিনাশ করে দেশ ও পৃথিবীর মঙ্গল বয়ে আসুক। মা দুর্গার কাছে আরো প্রার্থনা দেশ, বিশ্ব, সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা, বর্বরতা দূর হোক। মানুষের মন থেকে দূর হোক লালসা, লোভ আর হিংসা।

শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকলের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। এ উৎসব সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আসুক - এ প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান নূর, এমপি)

মন্ত্রী
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুর্গাপূজা আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানব জাতিসহ সকল জীবের কল্যাণ কামনায় বাঙালির অন্যতম উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, কারণ এই উৎসব হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারন করে রেখেছে। বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা এই শাশ্বত মন্ত্রে সবাইকে এক করেছে। এক সুরে বেধেঁছে। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ দ্বিতীয়বারের মত এবছর শারদীয় দূর্গাপূজার আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে "অপরাজিতা" শীর্ষক একটি স্মরণিকা। আমি তাঁদের এ মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মানুষের উচিৎ বিশ্বের সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা। সকলে শান্তিতে থাকুক, শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করুক এ প্রত্যাশা রইল। সবাইকে শারদ উৎসবের শুভেচ্ছা। সেই সাথে "অপরাজিতা" এর দ্বিতীয় সংখ্যার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ মুজিবুল হক, এমপি)

মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শারদীয় দুর্গাপূজা একটি জাতীয় উৎসব। অশুভ শক্তির বিনাশ ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে বিপুল উৎসহ উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন হয় শারদীয় দুর্গা উৎসব। দুর্গাপূজা বাঙালি চেতনার মানসপটে এক সংহতির প্রতীক। সাথে সাথে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ দ্বিতীয় বারের মত এ বছরও শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করায় পরিষদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ এ বছর তাদের বার্ষিক প্রকাশনা "অপরাজিতা" দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে আমি হিন্দু ধর্মালম্বীসহ সকলের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(অধ্যক্ষ মতিউর রহমান)
মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ দ্বিতীয়বারের মত এবছরও শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে "অপরাজিতা" শীর্ষক একটি স্মরণিকা। আমি তাদের এ মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ধর্ম মানুষের মানবিক ও আত্মিক গুণাবলী বিকশিত করে, শিক্ষা দেয় সংযম, ঐক্য সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের। সম্প্রীতির এই ঐতিহ্যকে সম্মিলিতভাবে সমুন্নত রাখতে হবে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দঘন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বাংলাদেশকে করেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সকল ধর্মেরই মূল বাণী হচ্ছে সৃষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। তাই মানুষের উচিৎ বিশ্বের সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা।

সব ধর্মের মূলবাণী মানুষের কল্যাণ করা এবং জগৎ, দেশ ও সমাজ থেকে বর্বরতা এবং ধর্মান্ধতা দূর হোক। জাগ্রত হোক মানুষের মুক্ত মন আর বিবেক। জগতের সকল প্রাণি শান্তিতে থাকুক, শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করুক এ প্রত্যাশা রইল। সবাইকে শারদ উৎসবের শুভেচ্ছা। সেইসাথে "অপরাজিতা" এর দ্বিতীয় প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি ও স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত শারদীয় দুর্গোৎসব-২০১৮ উদযাপন এবং এ উপলক্ষ্যে বার্ষিক প্রকাশনা "অপরাজিতা" দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

জগৎ জননী মা দুর্গার আগমনে আনন্দ মুখরিত বিশ্বচরাচর। শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা সার্বজনীন রূপ নিয়ে প্রতিবছর আমাদের মাঝে আগমন করে এবং সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই উদযাপিত হয়। আমরা ধর্ম পালন করি মানুষের মাঝে দেবত্বকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে। মানুষকে সত্য সুন্দর ও ন্যায়বোধের চেতনায় অভিসিক্ত করতে, জাগ্রত করতে। ধর্মের এ সমস্ত মূল চেতনাকে আমাদের লালন করতে হবে।

বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্গোৎসবের শিক্ষার মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তি বিনাশ ও মানুষকে সত্য সুন্দর এবং ন্যায়বোধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশকে আরো সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মাঝে পরিচিত করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। তাহলে এ দেশ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে শান্তি ও কল্যাণের বার্তা বয়ে আনুক। আমি তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ এবং এলাকাবাসীকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং স্মরণিকার সাফল্য কামনা করছি। স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত লখক / কলাকুশলী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিন্দন।

(ডঃ শ্রী বীরেন শিকদার, এমপি)

ভাইস-চেয়ারম্যান
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বাণী

মায়ের আগমন সত্যিই আনন্দের। এ মা তো আমার আপনার একার মা নয়, সকলের। জগতের মা তাইতো তিনি জগৎ জননী। আর শুধু জননীই বা কেন হবেন? তিনিতো আমাদের সকলের দুর্গতিনাশিনীও বটে অর্থাৎ দুর্গা।

মায়ের আগমন এবার ঘোটকে। এর ফল বোঝায় ছন্দ পতন। ভালো বা মন্দ দুই-ই হতে পারে, আমরা চাই ভালোটাই হউক। সামনে নির্বাচন। নির্বাচন মানেই আমাদের দুর্ভোগের। অশুভ শক্তি প্রতিবারই নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো না কোনো ছলছুতোয় আক্রমন করে। এবার যেন অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, মা যেন অশুভ বা আসুরিক শক্তি ধ্বংস করে দিয়ে তাঁর সন্তানদের শান্তিতে রাখেন সে প্রার্থনা তাঁর রাতুল চরনে।

বর্তমান সরকার এ বছর দুই কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন অসহায় হিন্দুদের শারদীয় দুর্গাপূজাকে সাবলীল করতে। জননেত্রীর এ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকল হিন্দু জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে।

আপনাদের সকলকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মায়ের এ আগমন বার্তাকে আরো স্মরণীয় করতে 'অপরাজিতা' নামে একটি প্রকাশনা বের করছেন জেনে। এর সাথে জড়িত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

মা আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও সুখী করুক সে প্রার্থনা করি তাঁর কাছে।

(সুব্রত পাল)

সাধারণ সম্পাদক
ইস্‌কন বাংলাদেশ

বাণী

শারদীয় দুর্গোৎসব ২০১৮ উপলক্ষে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে যেনে আমি আনন্দিত।

শরতের শুভ্র আকাশে মায়ের শুভ আগমনী বার্তা। আসুরিক অশুভ শক্তিকে অপসারণ করে সমাজে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর আগমন। তিনি "শ্রীবিষ্ণুমায়য়া" অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তি। অপ্রাকৃত জগতে তিনি যোগমায়া নামে শ্রীবিষ্ণুর লীলা-সহযোগিতায় তৎপর। কিন্তু প্রাকৃত জগৎ অর্থাৎ এ জড় জগতে শ্রীবিষ্ণু বিমুখ জীবকে তাঁর ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিদ্বারা কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ করে জন্ম, মৃত্যু, জড়া ও ব্যাধির মাধ্যমে জড় সুখ-দুঃখ প্রদান করেন, তাই তিনি ত্রিশূল ধারিণী। তিনি বিষ্ণু ভক্তিপরায়ন ভক্তকে জড় জগতের কারাগার হতে মুক্ত করে অপ্রাকৃত জগতে ফিরে যেতে সাহায্য করেন।

জগজ্জননীয় আগমনে ও শুদ্ধ পূজা-আরাধনায় জগৎ পবিত্র হয়ে উঠুক, অপ্রাকৃত জ্ঞানে আলোকিত হয়ে অজ্ঞানতা দূরীভূত হোক, সকলে শান্তি লাভ করুক– এই প্রার্থনা করি।

আমি তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের ভক্তবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই ও তাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

চারুচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী

(শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী)

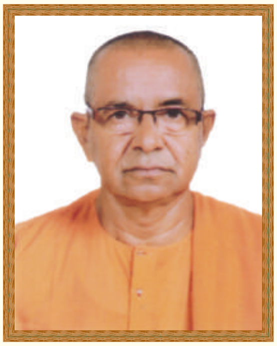

অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা

বাণী

শারদীয়া দুর্গোৎসবে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ "অপরাজিতা" নামে স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমরা আনন্দিত।

জগতের সকল জীবে বুদ্ধিবৃত্তির কম-বেশী প্রকাশ দেখা গেলেও একমাত্র মানুষেই বুদ্ধিবৃত্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়; ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অর্ধম বিচার করার ক্ষমতা অর্থাৎ বিবেকবোধ মানুষের মধ্যে বর্তমান। আমাদের চিত্ত যতই শুদ্ধ হয় ততই আমরা বুদ্ধিবৃত্তির যর্থাথ প্রকাশ অনুভব করি, কল্যাণ কাজের প্রেরণা লাভ করি; এতে আমাদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার উন্নতি সাধিত হয়।

নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের ভেলা, মৃদু মন্দ বাতাসে কাশফুলের দোল, ভোরের শিউলি, শস্য-শ্যামলা ধরণী-শরতের এমনই স্নিগ্ধ প্রকৃতিতে ভক্তের দুর্গাপূজার আয়োজন, সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মার্তৃরূপে আরাধনা, আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করার প্রয়াস।

আমাদের যাতে সতত বিবেকবোধ জাগ্রত থাকে, আমরা যাতে শুদ্ধচিত্ত হয়ে আমাদের হৃদয়ে জগজ্জননীর প্রকাশ অনুভব করতে পারি এবং আমাদের সকল কাজে তাঁরই মহিমা যাতে প্রকাশিত হয়– মায়ের কাছে এ প্রার্থনা।

শারদীয় দুর্গোৎসবে সকলকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সকলের কল্যাণ হোক।

এক প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের অভিনন্দন।

সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে বিরাজিতা জগজ্জননীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম–

"যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ৷৷"

Dhruveshanand

(স্বামী ধ্রুবেশানন্দ)
অধ্যক্ষ

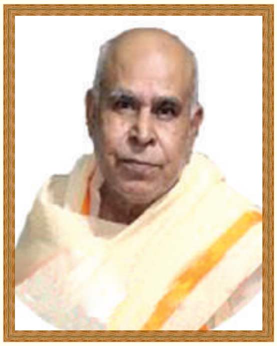

শ্রী শ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ
ঢাকা।

বাণী

জয় জগদ্বন্ধু হরি

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন যারা বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মের অনুসারী এরা সনাতন ধর্মের সামাজিক এবং ধর্মীয় নিয়মরীতি নীতিকে মেনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে। অপারাজিতা নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে তাদের শ্রম ও উদ্দেশ্যে সার্থক হোক এই কামনা করি শ্রী ভগবানের চরণে।

কান্তি বন্ধু ব্রহ্মচারী

কান্তি বন্ধু ব্রহ্মাচারী
সভাপতি
মহানাম সম্প্রদায়
শ্রী শ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ, ঢাকা।

সাবেক সভাপতি
বিজিএমই

বাণী

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২৬ নং ওয়ার্ডের তেজগাঁও এলাকায় বসবাসরত হিন্দু ধর্মাবলম্বীগনের নিরলস প্রচেষ্ঠায় গঠিত হয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ'। এ প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের উদ্যেগে দ্বিতীয়বারের মত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং উৎসবমুখর পরিবেশে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে বলে আমি খুবই আনন্দিত। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমি অত্র এলাকাসহ বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তেজগাঁও এলাকায় কোন স্থায়ী মন্দির না থাকায় অত্র এলাকার মাননীয় সাংসদ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্টমন্ত্রী, ওয়ার্ড কাউন্সিলারগন, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের একান্ত সহযোগিতায় বি.কে আফতাব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন খালি সরকারি জায়গায় মন্দির নির্মাণ করে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমি আশাকরি এ মন্দির সকলের সহযোগিতায় স্থায়ী মন্দির হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনুপম দেশ। ধর্ম মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ করে সমাজকে সুন্দর করে। সকল ধর্মের মূলবাণী সৃষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। অশুভ শক্তির বিনাশ ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে ধর্মীয় মনোভাবের মধ্য দিয়ে বিপুল উৎসাহ- উদ্দীপনায় শারদীয় দুর্গাপূজা পালন করে বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়। সমাজে অন্যায়, অবিচার, অশুভ ও অসুর শক্তি দমনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানা উপচার ও অনুষ্ঠানাদির মধ্যদিয়ে দুর্গাপূজা উদযাপন করা হয়। দুর্গাপূজার শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক উৎসবও।

শারদীয় দুর্গাপূজার সাথে মিলে মিশে আছে বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এ পূজা দেশের জনগনের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শারদীয় দুর্গোৎসব ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে সবার মাঝে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধনকে আরো সুসংহত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ধর্ম মানুষকে ন্যায় পথে চলার আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্যকে বিতারিত করে, মানবতার প্রতি আকৃষ্ট করে। তাই ধর্মীয় বিধান যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসতে হবে। বাঙালি জাতির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যকে অটুট রেখে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রা। পারস্পারিক ঐক্য ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সকলকে উদ্ধুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করছি। শারদীয় দুর্গোৎসব সফল হউক এ কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ।

(মোঃ আতিকুল ইসলাম)

সভাপতি
বাংলাদেশ পুজা উদ্‌যাপন পরিষদ

বাণী

স্রষ্টার আশীর্বাদ লাভের আশায় সাংবাৎসরিক নানাবিধ পূজা-পার্বনের যে আনন্দযজ্ঞের সমাহার তাঁর মধ্যে প্রধানতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গোৎসব যা সময়ের পরিক্রমায় সর্বজনীন উৎসবের রূপ লাভ করেছে। বছর ঘুরে আবারো আমরা একত্রিত হয়েছি মাতৃবন্দনায় যিনি শুধু আমাদেরকে আশীর্বাদই করেন না, শক্তি দেন, সাহস যোগান, অশুভ শক্তির অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে। আমরা নতুন করে শপথ নিই মানব জাতির জন্য এক শান্তিপূর্ণ ও মঙ্গলময় বিশ্ব গড়ে তোলার প্রত্যয়ে।

মানুষ ধর্ম পালন করে। ধর্ম পালনের আন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ভিতরে থাকা দেবত্বকে জাগিয়ে তোলা। কারণ মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রকাশই সভ্যতা যা অন্যায়, অসত্যকে দূরে রেখে মানুষকে সত্য সুন্দর ও ন্যায়বোধের চেতনায় অভিষিক্ত করে। মানবতায় ধর্মের শাশ্বত বাণী। সকল ধর্মই একই চেতনাতে বিশ্বাসী। তবুও নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় নেমে ধর্মের নামে হানাহানি, বিভেদ, অনৈক্য, সংঘাত সুন্দরকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অসুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করে, শক্তিশালী করে আসুরিক শক্তিকে। বিশ্বের নানা দেশে সংঘাতের বলি হচ্ছে হাজারো নিরীহ মানুষ। নিজ দেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে ভিনদেশে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হচ্ছে। কারো কারো কাছে মানুষের চাইতে পশুর মূল্য অনেক বেশি। সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ শক্তির উত্থান সভ্যতার অগ্রগতিকে বারবার পিছনে ঠেলে দিতে চায়। বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠিকে নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হতে হয়, নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার ইন্ধন যোগায়। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির নির্যাতন নিপীড়নের মুখোমুখি হতে হয়েছে এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠিকে। অথচ সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এ ধরনের বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি হওয়ার কথা নয়। এটি সত্য যে আসুরিক শক্তি সাময়িকভাবে তার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবী কখনও আসুরিক শক্তির কাছে পরাভূত হয়নি, মাথা নত করেনি। আমরা মাতৃ পূজার মাধ্যমে আমাদের অন্তরের ও বাহিরের আসুরিক শক্তিকে অবশ্যই পরাজিত করে সত্য ও সুন্দরকেই প্রতিষ্ঠিত করব।

এবারের দুর্গোৎসবের মাস তিনেকের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে একাদশ জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচন হিন্দুদের কাছে এখন আতংক ও বিপর্যয় হিসেবে দেখা দেয়। অতীতের একাধিক নির্বাচন পূর্বাপর ও নির্বাচনকালীন পরিস্থিতি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য সুখকর ছিল না। বিভিন্নভাবে তাদেরকে নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে অনেককেই দেশান্তরী হতে বাধ্য করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচনকে সামনে রেখে এ সম্প্রদায় আতঙ্কিত ও আস্থার সংকটে আছে। আশার কথা স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকায় হিন্দু জনগোষ্ঠি তার ওপর আস্থাশীল। আমরা আশাবাদী ও বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যেমন উচ্চকণ্ঠ তেমনি আসন্ন নির্বাচন পূর্বাপরও নির্বাচনকালিন আইনশৃংখলা রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ নিবেন। পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠিকেও তাদের মনোবল দৃঢ় রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং যে কোনো পরিস্থিতি সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

দেবী দুর্গা দশভূজা। তিনি উগ্রতা, হিংসা, ঘৃণা, রাগ, লোভ, স্বার্থপরতা, কুসংস্কারসহ সকল মন্দ শক্তিকে ধ্বংস করে সৃষ্টির যা কিছু শুভ তাকে রক্ষা করেন। তিনি তার সন্তানদের দশ হাতে দশ দিক থেকে আগলে রেখে অশুভ শক্তির হাত থেকে সুরক্ষা দেন। দেবী জগজ্জননী, দুর্গতিনাশিনী। তিনি অবশ্যই সকল অপশক্তির হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন।

শারদীয় দুর্গোৎসব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করার মাধ্যমে মানবতায় বিশ্বাসী সর্বজনীন রাষ্ট্র গঠনে অবদান রাখার পাশাপাশি বয়ে আনুক বিশ্বের সকল মানুষের জীবনে কল্যাণ ও শান্তির বার্তা। প্রতিষ্ঠিত হোক মানব সত্ত্বার মহিমা। দূর হোক সকল অপশক্তি। মায়ের আশীর্বাদ সবার ওপর বর্ষিত হোক।

(মিলনকান্তি দত্ত)

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ

বাণী

বাঙালি হিন্দুর প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব পালিত হবে। প্রতি বছর দুর্গাপূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সম্প্রদায়ের জন্যে আনন্দদায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক। এটি সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে ইতিবাচক দিক।

দুর্গাপূজা একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও এর উৎসবের ব্যাপ্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সময়ের পরিক্রমায় সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এই শ্লোগানকে ধারণ করে এখন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উৎসবে অংশ গ্রহণ, মানুষে মানুষে ঐক্য, পারস্পারিক সহমর্মিতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ভিত্তি করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সম্প্রদায়িকীকরণের অপচেষ্টা নিয়ে থাকে, দ্বন্দ্ব- সংঘাত সৃষ্টিরমাধ্যমে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে পিছনে ঠেলে দিতে চায়। এরা মানবতার শত্রু। দেবী দুর্গা অসুর শক্তিকে বিনাশ করে সুর শক্তির জয় এনে দেয়। সমাজের অন্যায়, অবিচার ও অশুভ শক্তি দমনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবহমানকাল থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা দেবী দুর্গার আরাধনা করে আসছে। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা অবশ্যই আমাদের সকলকে অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা করবেন। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল অপশক্তিকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করব। পৃথিবী কখনোও অসুর শক্তির কাছে পরাভূত হয়নি, মাথানত করেনি। সুর শক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী।

শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য সুন্দরের আলোকে ভাস্কর হয়ে উঠুক। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার মাঝে পারস্পারিক ঐক্য সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হোক। পৃথিবী হয়ে উঠুক সবার জন্য মঙ্গলময় ও শান্তিপূর্ণ আবাসভূমি।

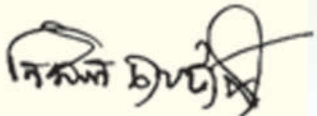

(নির্মল কুমার চ্যাটার্জী)

সভাপতি
মহানগর সার্বজনীন পুজা কমিটি

বাণী

মা দুর্গা সকল দেবতার শক্তির আধার হলেও ধরাধামে নেমে আসেন সন্তানের কল্যাণ কামনায়। তাঁর মহা আগমনে পৃথিবীও কল্যাণী রূপের সাঁজে মূর্ত হয়ে উঠে। পৃথিবী বাসীরাও মহামায়ার রূপ দর্শনে খুঁজে পায় সার্বজনীন উৎসব ও আনন্দের।

শারদীয় দুর্গোৎসব মূলত সনাতন ধর্মীয় বাঙালির উৎসব হলেও এটি এখন সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে।

এই উৎসব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের চিন্তা চেতনা ও উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে। এই চেতনাকে ধারণ করে বাঙালি তার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। চিরায়ত দেবী বন্দনার প্রেক্ষাপট হলো অন্তরের আসুরীয় শক্তির বিনাশ করা। শারদীয় দুর্গোৎসব সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজা হলেও এই উৎসবের ব্যাপ্তি সর্বজনীন। সমঅধিকার ও সমমর্যাদার অনুভূতি সর্বস্তরে মূর্ত হয়ে ওঠে শারদীয় দুর্গোৎসবে।

মাতৃবন্দনায় আজ আমরা পৃথিবীর সকল মানুষ এক সুরে গাইছি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মহাকল্যাণ। মাতার পাদপদ্মে দাঁড়িয়ে সকল ধর্মের সকল মতবাদের মানুষকে জানাচ্ছি মাতার অভয়বাণী, সকল মানুষের কল্যাণ হোক। আজ সকল ভেদাভেদ ভুলে অতীতের কাল অন্ধকার মুছে ফেলে আসুন আমরা আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে যাই। মাতা দুর্গা ঈশ্বরের কল্যাণ নিয়ে আমাদের অভয়দানের আশ্রয় হোন- এই আমাদের প্রার্থনা।

দেশবাসীকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা। দুর্গোৎসব জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুক।

শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার

সাধারণ সম্পাদক
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি

বাণী

ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

আবহমান কাল ধরে দুর্গাপূজা এলেই মানুষের মনে সৃষ্টি হয় নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা, তাই আজ এদেশের সব মানুষই শারদীয় উৎসবের অংশ। শারদীয় উৎসব কেবল বাৎসরিক কোনো ধর্মীয় পার্বণ নয়। আদ্যাশক্তি মহামায়া জগৎজননীর বন্দনা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে গণ্য হলেও, মাতৃভাব ও অসুর শক্তিকে নিধনের দৃঢ় চেতনা সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন। দুর্গা উৎসবের শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী, অসুর শক্তির বিরুদ্ধে সুর শক্তির বিজয়ের চেতনা কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তি বিজয় হয়ে আসছে এবং যতকাল সৃষ্টি থাকবে ততকালই সত্যের বিজয় অনিবার্য। তাই মানুষ সকল ভেদাভেদ, বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক গণ্ডি ভেদ করে সকল মানুষ মিলিত হয় ও উৎসবে মেতে ওঠে। মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি পূজার এই মর্ম বাণী তুলে ধরে।

ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্মাই সকল। আদ্যাশক্তি মহামায়া, মা দুর্গা ব্রহ্মেরই স্বরুপ। পরব্রহ্ম বিশভ্রমাণ্ডে বিভিন্নরূপে, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ভাবে আবির্ভূত। তাই ভিন্নতার মধ্যেও এক মহা ঐক্য।

ব্রহ্মবৈর্বত্য পুরানে দেখা যায়, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন, দ্বিতীয় বার ব্রহ্মা স্বয়ং, তৃতীয় বার মধু ও কৈটভ অসুরকে নিধন করার জন্য মহাদেব দুর্গাপূজা করেছিলেন, এরপর দেবরাজ ইন্দ্র চতুর্থবাররে মতো এ পূজা করেন, এরপর স্বয়ং রামচন্দ্র অকাল বোধন করে দুর্গাপূজা করেন। এই পূজায় পুরোহিত ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। তখন শরৎকাল দক্ষিণায়ন, দেবতাদের নিদ্রার সময়, ব্রহ্মার স্তব স্তুতিতে মা দুর্গা জাগ্রত হলেন উগ্র চণ্ডিরূপে। ব্রহ্মা বললেন, রাবনবধে রামচন্দ্রকে তোমার অনুগ্রহ করতে হবে, যতদিন রাবন বধ না হয় ততদিন তোমার পূজা করবো, মায়ের অনুগ্রহে সেদিন রাবনরূপী অশুভ শক্তি বধ হয়েছিল, ব্রহ্মা আরো বলেছিলেন, যতদিন সৃষ্টি থাকবে ততদিন তুমি পূজা পাবে, সেই থেকে শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে।

১৯৭৮ সালে জাতির ক্রান্তিলগ্নে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যখন আক্রান্ত তখনই সৃষ্টি হয় মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি। এই কমিটি পূজাঙ্গন ও অধিকার আদায়ের চেতনার একটি সেতুবন্ধন রচনা করেছে, সৃষ্টি হয়েছে নির্যাতিত মানুষের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি। পরবর্তীতে সমঅধিকার ও সমমর্যাদার লড়াই সংগ্রামের ধারা এভাবে রচিত হয়েছে। তাই আজ মহানগরের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে দাবী আদায়ের এক ঐক্যের সুর। জন্ম দিয়েছেন নতুন বিশ্বাসের। মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি মাতৃবন্ধনাকে আরও সুদৃঢ় করে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজা পার্বন ও সর্বক্ষেত্রে সমধিকার ও সমমর্যাদা আদায়ের বদ্ধ পরিকর। মায়ের কাছে প্রার্থনা আদ্যাশক্তি মহামায়াজাগ্রত হউক সকলের হৃদয়ে। ঢাকা মহানগরে পূজার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩৩ এ। এসবই সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফল। আগামী দিনে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোকিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কল্যাণ বর্ষিত হউক সবার ওপর, আসুন দেশ জাতির মঙ্গল কামনায় মা দুর্গার বন্ধনা করি।

(কিশোর রঞ্জন মণ্ডল)

সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা মহানগর উত্তর
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শুভেচ্ছা

“ধর্ম যার যার, উৎসব সবার”- এই শ্লোগানের প্রাসঙ্গিকতা সমকালীন হলেও এর চেতনা আমাদের জীবনের সাথে মিশে আছে প্রাচীন কাল থেকেই। প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু সমাজ দুর্গোৎসব পালন করে আসছে। এ সময় দিকে দিকে অশুভ শক্তির দোর্দন্ড প্রতাপে দানবের পাষান-কঠিন পদভারে ত্রস্ত যখন সভ্যতা, ঠিক তখনই অশুভ শক্তির বিনাশে পৃথিবীকে শুভবাদী মানুষের বাসযোগ্য করে দেওয়ার জন্য আর্বিভূত হন জগৎ জননী অসুরবিনাশিনী দেবী দুর্গার। আজ পৃথিবীর সর্বত্র কিছু অসুরের আনা-গোনা বিরাজিত। তাই মায়ের মত পৃথিবীর সর্বত্র অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে দেশ, জাতি ও সমাজকে মুক্ত করে মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই মানুষের উচিৎ, বিশ্বের সকল ধর্ম-বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা।

গত বছরের মত এবছরও “তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ” ২৬ নং ওয়ার্ডে (তেজকুনীপাড়া) সকলের সাহায্য, পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে “শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা” উদযাপন করতে যাচ্ছে শুনে আমি খুবই আনন্দিত ও অভিভূত। এই মহৎ উদ্দেশের জন্য তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সকলকে আমার অন্তরের আন্তরিক ভালবাসা, অভিনন্দন সহ এই পূজার সার্বিক মঙ্গল কামনায় সর্বাঙ্গীন সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণীকা “অপরাজিতা” পুনরায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে শুনে আমি বেশ আনন্দিত। প্রকাশের আয়োজনকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং উন্নতি কামনা করছি। আমি হিন্দু ধর্মালম্বী সহ দেশের সকল মানুষকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি দুর্গোৎসবে এবং সকলের সুখ, শান্তি, সম্মৃদ্ধি কামনা করছি।

০৮/১০/২০২৫

জহিরুল হক (জিল্লু)

কাউন্সিলর
২৬ নং ওয়ার্ড (তেজকুনী পাড়া)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শুভেচ্ছা

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা উপলক্ষে দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিককে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শারদীয় দুর্গা পূজা একটি জাতীয় উৎসব। পূজার ধর্মীয় অংশটি হিন্দুদের কিন্তু মেলা, উৎসব ও আপ্যায়নে অংশগ্রহণ করে সবাই। বাঙালী জীবনে এই উৎসবের সূচনার সময়টি যেমন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না, তেমনি এর বিশেষত্ব নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই, তবে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই উৎসব সমস্ত বাঙালীকে এক মায়াবী বন্ধনে জড়িয়ে রাখে। তৈরী হয় নতুন ভ্রাতৃত্ব বোধের। তাই প্রথম বারের মত এ বৎসরেও "তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ" শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন করতে যাচ্ছে। পূজার সাথে সাথে প্রথম বারের মত এবছরও প্রকাশ করতে যাচ্ছে "অপরাজিতা" নামক স্মরণিকাটি। দুর্গাপূজা উৎযাপন এবং স্মরণিকা প্রকাশে আমি খুবই আনন্দিত এবং এই মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

"তেজগাঁও সনাতন উন্নয়ন পরিষদ" ২৬ নং ওয়ার্ড তেজকুনী পাড়া প্রথম বারের মত এবারেও এলাকার সকলের সাহায্য সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন করবেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এ ব্যাপারে বেশ আনন্দিত এ কারণে, আমার ২৬ নং ওয়ার্ডে পুনরায় এবছরও দূর্গা পূজা হচ্ছে এবং এ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়সহ সকলের প্রধান এ উৎসবে মিলে মিশে আনন্দ করবে এ ভেবে নিজেকে বেশ ধন্য মনে করছি। সাথে সাথে এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য পুনরায় "তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদকে" আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সর্বোতভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

পরিশেষে, ২৬ নং ওয়ার্ড (তেজকুনী পাড়া) সহ দেশের সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(শামীম হাসান)

মহিলা কাউন্সিলর
২৬, ২৭ ও ২৮ নং ওয়ার্ড (তেজকুনী পাড়া)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শুভেচ্ছা

শারদীয় দুর্গাপূজা তথা শারদোৎসব বাঙালি জাতীর বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুদের একটি প্রধান মহোৎসব। এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষ ঐক্যবদ্ধ ও একত্রে মিলিত হন। চিরায়ত দেবী বন্দনার প্রেক্ষাপট হলো অন্তরের আসুরিক শক্তির বিনাশ। এই চেতনাকে ধারণ করে বাঙালি তার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। জগজ্জননীর আগমনী বার্তায় সকলের প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছে মঙ্গলবার্তা। এই আনন্দঘন মঙ্গলবার্তা শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাম্বলীসহ দেশের সকলকে জানাই আমার উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। মহামায়ার অভয় বাণীর জন্যই আজ শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। তাছাড়া আজ সকলের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে একই উচ্চারণ "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার"। স্বাধীনতার অপশক্তি যুগে যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণ, দখলদারিত্ব, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ইত্যাদি কারণে সাম্প্রদায়িক ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েও বাংলাদেশের হিন্দুরা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারার বিকাশে যুগিয়েছে শক্তি সাহস ও প্রেরণা। শুভ শক্তির আবির্ভাবের প্রার্থনায় শারদীয় দূর্গাপূজা পরিনত হয়েছে সর্বজনীন দুর্গোৎসবে।

"তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ" গত বছরের মত এবছরও তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন করছে। ২৬ নং ওয়ার্ডের সকল মানুষের সাহায্য ও সহযোগীতার মধ্য দিয়ে এই দুর্গাপূজা উদযাপনের জন্য এই সংগঠনকে আমার অন্তরের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সর্বাঙ্গীন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবারেও প্রকাশিত "অপরাজিতা" নামক স্মরণিকাটি প্রকাশের জন্য। 'স্মরণিকা প্রকাশ' সুন্দর ও সাবলিল হোক এটাই কামনা করছি।

পরিশেষে, দেশবাসীসহ সকল হিন্দু সম্প্রদায়কে আমার অভিনন্দন ও সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(শামীমা রহমান)

সভাপতি
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শুভেচ্ছা

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তেজগাঁও এলাকায় বসবাসরত হিন্দু ধর্মালম্বীসহ বাংলাদেশের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ দ্বিতীয়বারের মত ঢাকার তেজগাঁও থানার তেজকুনিপাড়ায় ধর্মপ্রাণ সনাতন ধর্মের লোকজনের অক্লান্ত প্রচেষ্ঠার শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে।

বাঙালী হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। পুরাণমতে, অসুরের আস্ফালনে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, তখনি দেবতারা যার যার অস্ত্র তুলে দিলেন দেবী দুর্গাকে। দেবী দুর্গা হলেন দশভূজা। এ দশভূজা মা দুর্গার হাতে বধ হল অসুর, জয় হল দেবকুলের। মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। মা দুর্গা অন্যায়, অত্যাচার ও অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য দেবকুল থেকে মনুষ্যকুলে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। তাই প্রতিবছর শরৎকালে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ মা দুর্গার পূজা-অর্চনায় মিলিত হয়।

মানব জাতির মঙ্গল কামনায় এবং সকলের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অপশক্তিরোধে উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গোৎসব পালিত হয়। দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয় যা সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এ উৎসবে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী একত্রিত হন এবং পূজা-অর্চনার পাশাপাশি সকলে আনন্দ-উৎসবে মিলিত হন। তাই উৎসব সর্বজনীন।

শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব মূখর পরিবেশে বাস্তবায়ন ও "অপরাজিতা" শিরোনামে স্মরণিকা প্রকাশে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমি তাঁদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সর্বোপরি পূজানুষ্ঠানে যাঁরা মূল্যবান উপদেশ ও অর্থ দিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার গভীর কৃতজ্ঞতা। শারদীয় দুর্গাপূজা সকলের জীবনে কল্যাণ ও মঙ্গল বয়ে আনুক এ প্রত্যাশা রইলো।

শারদীয় দুর্গাপূজা সফল হোক- এ কামনা করি।

(প্রদীপ কুমার সাহা)

সাধারণ সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

শুভেচ্ছা

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বী গণের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে তেজগাঁও এলাকাসহ বাংলাদেশে বসবাসরত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ অত্র এলাকায় স্থায়ী মন্দির না থাকায় অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ করে দ্বিতীয় বারের মত জন প্রতিনিধি ও জনগণের সহাযোগিতায় শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ একটি অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন। এ সংগঠনটি যুব সমাজকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান, গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান, রক্তদান কর্মসূচি, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, যথাযথ মর্যাদায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধদিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় সফলভাবে পালন করে যাচ্ছে।

মা দুর্গার আগমনে সকলের প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছে মঙ্গল বার্তা। বিশ্বের সকল অপশক্তির বিনাশ, সমাজের অন্যায়, অবিচার, অশুভ ও অসুর শক্তির দমন, সকলের সুখ-শান্তি ও সমাজের অস্থিরতা রোধ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট। ফলে দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক উৎসব হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ দুর্গা পূজায় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে আনন্দ-উৎসবে মিলিত হন। তাই এ উৎসব সর্বজনীন।

শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে 'অপরাজিতা' শিরোনামে দ্বিতীয় বারের মত প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। অপরাজিতা প্রকাশের মাধ্যমে সংগঠনের লক্ষ, উদ্দেশ্য ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রকাশনা সকলের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সংকলন কমিটির সকল সদস্যের নিরলস প্রচেষ্ঠায় অপরাজিতা শীর্ষক প্রকাশনাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে বলে তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

তেজগাঁও এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকজন বসবাস করেন। কিন্তু কোন স্থায়ী মন্দির না থাকায় নিয়মিতভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই এ এলাকায় বসবাসরত হিন্দু সমাজের দীর্ঘ দিনের দাবী একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। মন্দির প্রতিষ্ঠার লক্ষে আমরা অত্র এলাকার সাংসদ ও মাননীয় মন্ত্রী, ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ এবং সকল স্তরের জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় একটি স্থান নির্বাচন করে অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি মন্দির স্থাপন করে তাতে এবার প্রথমবারের মতো শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন করতে যাচ্ছি। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে স্থানীয় আপামার জনসাধারণ, স্থানীয় সংসদ সদস্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, কাউন্সিলর মহোদয়গণ ও স্থানীয় সকল নেতৃবৃন্দকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সকল সদস্য, উপদেষ্টা মণ্ডলী ও যুব পরিষদের সকল সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্ঠায় শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে বলে আমি তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সর্বোপরি পূজানুষ্ঠানে যাঁরা মূল্যবান উপদেশ ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো গভীর কৃতজ্ঞতা।

শারদীয় দুর্গা পূজা সফল হোক - এ কামনা করি।

সুখলাল নন্দী

(সুখলাল নন্দী)

অধ্যাপক স্বপন কুমার বনিক
আহবায়ক স্মরণিকা কমিটি
ও উপদেষ্টা
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

সম্পাদকীয়

সিন্ধু সভ্যতাসহ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার প্রায় সবগুলোরই ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল বিভিন্ন দেবতার মূর্তি পূজা করা। মূর্তি হল পরম সত্তার প্রতিভু। মূর্তিতে ভাষা স্তব্ধ হলেও এর মধ্য দিয়েই পরম তত্ত্বের সাক্ষাত অনুভব এবং অসীমের উপলব্ধি সম্ভব বিধায় বছর ঘুরে শরৎ এলেই বাঙালী হিন্দুরা তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গা মূর্তির পূজা করার জন্য নানা আয়োজনে এবং আনন্দে মেতে উঠে। প্রাচীন পুরাণে শরৎ কালে দুর্গা দেবীর অকাল বোধনের উল্লেখ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে দ্বিমত থাকলেও এ অঞ্চলে মা আসেন শরতেই এবং এটাই প্রচলিত হয়ে আসছে। শুধু এ অঞ্চলেই দুর্গাপূজার গন্ডী সীমাবদ্ধ নেই বরং আজ সারা বিশ্বের প্রায় সব দেশেই প্রবাসি বাঙালী হিন্দুরা এ সময়ে দেবী দুর্গার পূজা করে থাকে। তাই মা বৈশ্বিক রূপ লাভ করে সার্বজনীন থেকে হয়ে উঠেছেন বিশ্বজনীন। সন্তানের আহবানে মা আসেন তাদের দূর্গতি নাশ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। বিভিন্ন সমস্যার কারণে বিশ্ব শান্তি আজ হুমকির সম্মুখীন। এরই প্রেক্ষাপটে অশুভ শক্তির বিনাশ করে শান্তি স্থাপন করে মানব-সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাঙালী হিন্দুদের জন্য বিশ্বের সর্বত্রই আজ দুর্গাপূজা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান সময় প্রত্যেকের জন্য নিরাপদে স্ব স্ব ধর্ম পালনের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সকল দিক দিয়েই এই সময়টি স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত। তাই তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত দুর্গাপূজা অনায়াসেই সম্মানীত জন প্রতিনিধি তথা এলাকার সকল জনগণের সহযোগিতায় দ্বিতীয় বছরে পা দিয়েছে। একই সময়ে নিজস্ব আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে সম্পূর্ণ নতুন প্রত্যয়ে সমিতির মুখপত্র হিসেবে পরিচিত স্মরণিকা 'অপরাজিতা'রও দ্বিতীয় সংকলন বের হতে যাচ্ছে। পূজা সংকলন একটি দীর্ঘ সময়ের বিশাল কর্মযজ্ঞ। সম্পাদনার দায়িত্ব আমার হলেও সম্পাদনা পর্ষদ, কার্যকরী কমিটি ও পরিষদের সকল সদস্যের সহযোগিতা ব্যতিত এটা বের করা সম্ভব হত না। যাঁরা মূল্যবান বাণী, বিজ্ঞাপন, লেখা, উপদেশ, নেপথ্য শ্রম, অকুণ্ঠ উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা দান করেছেন- সংশিষ্ট সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কাছেও। প্রথম সংকলনের মত এবারেও হিন্দু সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ও বিশেষ করে দেবী দুর্গার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে সহজ আলোচনা এবং নির্ভুল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে স্মরণিকা হাজির করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা হয়েছে। স্মরণিকা কতটুকু শিল্পমানের হয়েছে- এবং এই প্রয়াসের সার্থকতাই বা কতটুকু তা পাঠকের তৃপ্তির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তবে পাঠকের গঠনমূলক সমালোচনা ভবিষ্যৎ সংকলনকে আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত করবে বলে আমার বিশ্বাস। 'অপরাজিতা'র সকল লেখা লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত বিধায় বিতর্কিত লেখার জন্য সম্পাদনা পর্ষদ দায়ী থাকবে না এবং অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ ত্রুটির প্রতি ক্ষমাসুন্দর সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করছি। পরিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি।

(অধ্যাপক স্বপন কুমার বনিক)

We are humbled by the opportunity to deliver the smiles of good health to humanity across colors, creed and communities. With a string of 5 Export Gold Trophies, an array of international approvals, and a sea to travel lying open in front, at Beximco Pharma, we are committed to excellence by setting high standards of quality and safety of our products.
Here's to the future. Here's to life.
100 ml
The first Bangladeshi pharma company approved by the US FDA
Also approved by:
AGES
Health Canada
FDA
BEXIMCO PHARMA

সূচীপত্র

শুভেচ্ছা বাণী	-
সম্পাদকীয়	-
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী	৩৩
মহামূল্যবান বাণী	৩৪
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উদ্দেশ্যোবলী	৩৫
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন	৩৭
দুর্গাপূজা	৪১
হিন্দু দেব-দেবী	৫৩
ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির	৬৩
আদিনাথ মন্দির	৬৫
সীতাকুন্ড মন্দির	৬৮
শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর	৭০
শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মাচারীর কয়েকটি শাশ্বত বাণী	৭১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৩
তেসসউপ কর্তৃক অস্থায়ী মন্দিরের উন্নয়ন কাজের কিছু চিত্র	৭৫
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি কর্তৃক প্রথম সংকলনের পুরষ্কার	৭৬
ধান, দূর্বা, শাখাঁ ও সিদূঁর ব্যবহারের যৌক্তিকতা	৭৬
শিক্ষকদের ধর্ম, দায়িত্ব ও ভূমিকা	৭৭
সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণের ধর্মদর্শন	৭৯
আমাদের পূজা: আমার নিজের পূজা	৮১
পূরীর জগন্নাথ মন্দিরের অজানা কাহিনী	৮৩
দুর্গা, দিদি ও আমি	৮৪
বিভিন্ন ধর্ম মতে মা দুর্গা	৮৪
প্রথাভঙ্গ	৮৫
কল্যান্দী সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের দুর্গা পূজা	৮৭
সমবায়	৮৯
হৃদরোগ এবং আমাদের করণীয়	৯০
দুর্গার নানা রূপ	৯১
দুর্গাপূজার স্মরণী কথা	৯৩
সংগঠন ও নানা কথা	৯৫
ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগর সাক্ষাৎকার	৯৭
মানব জীবনে সাফল্যের নিগূঢ় রহস্য	১০১
হিন্দুধর্ম	১০৩
চড়ংরঃরাব ধহফ ঘবমধঃরাব ওহভষঁবহপব ড়ভ এঁবপযহড়ষড়মু	১০৫
আমারে কেউ ছুঁয়ো না গো সজনী	১০৯
শারদীয় দুর্গোৎসব	১১১
আমার জীবনের বাসনা ও আমাদের দুর্গা পূজা	১১৩
শারদীয় দুর্গা পূজা-২০১৮	১১৯
দেবী দুর্গার আগমণ ও প্রভাব	১২২
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ	১২৬
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি	১২৮
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ	১৩০
তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি	১৩৪
তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য	১৩৫
দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর কার্যকরী কমিটি	১৪০
দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সদস্যবৃন্দ	১৪১
দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৪৭
কবিতা	১৫৪

অটো লোন
AB RETAIL
www.abbl.com
আপনার শখ ও
সাধ্যের ঘাটতি পুরণে
এবি ব্যাংক অটো লোন
AB Bank
এবি ব্যাংক লিমিটেড
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন: ০১৮১৯১৬৩৯৪০/৯৫৬০৩১২ এক্স.-১৪০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী

১. **শ্রেয়াণ স্বধর্মো বিগুণ পর ধর্মাৎ স্বনুতিষ্ঠান স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ।**

অর্থাৎ- নিজের ধর্মানুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিজের ধর্মে মৃত্যুও ভাল।

২. **পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়াং যোমে ভক্তা প্রদচ্ছতি তদহং ভক্তুপহৃতমশ্রামি প্রযতান্মান"**

অর্থাৎ- যে বিশুদ্ধ ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল আমাকে অর্পণ করেন, আমি তার ভক্তিপূর্ণ উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।

৩. **যজ্ঞ শিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিলবিষৈঃ ভঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম কারনাৎ।**

অর্থাৎ- যে সদাচরগণ যঞ্জাবশেষ ভোজন করেন তাঁরা সকল পাপ হতে মুক্ত হয়। যে শুধু নিজের জন্য অন্ন পাক করে সে পাপান্ন ভোজন করে।

৪. **ন মে পার্থস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন নানাবাপ্তম বাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মনি"।**

অর্থাৎ- হে পার্থ, আমার কোন কর্তব্য কর্ম নাই। তবুও কর্মে ব্যপ্ত আছি। কর্ম ত্যাগ করি নাই।

৫. **ণ জায়তে খ্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভুত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ।**

অর্থাৎ- আত্মার কোন জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা পুণঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না।

৬. **কোটী-জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত?**

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অর্থাৎ- যত মত তত পথ। সব ধর্মের লোকেরা একজনকেই ডাকছে। কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ আললা, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু।

৭. **বেশ্চৈ সর্বৈরহমেব বেদাঃ।**

অর্থাৎ- সমস্ত বেদে একমাত্র জানবার বিষয় হচ্ছে- আমি।

মহামূল্যবান বাণী

১। "ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। ক্রোধের অধীন হলে মানুষ যে কোন পাপের কাজ করতে পারে, গুরুকে হত্যা করতে পারে, এমনটি নিজেকেও মেরে ফেলতে পারে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি না করতে পারে এমন কোনো কাজ নেই, না বলতে পারে এমন কোনো কথা নেই। তাই ক্রোধকে দমন করতে সদাসর্বদা চেষ্টা করবি।"

– শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

২। কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে
এতে মন খারাপ করো না,
কারণ এক জীবনে সবার কাছে
ভালো হওয়া যায় না।

- মা সারদা

৩। জীবনে তিনটি কথা মনে রাখবে,
১) যে তোমাকে সাহায্য করবে
তাকে কোনদিনও ভুলবে না
২) যে তোমাকে ভালোবাসবে
তাকে কখনোও ঘৃণা করবে না।
৩) যে তোমাকে বিশ্বাস করবে
তাকে ধোঁকা দিয়ো না।

– মা সারদা

৪। যতো বেশী নাই নাই করবে
গতকালের চেয়ে আগামীকাল
আরো বেশী শূন্য হয়ে পড়বে।
যে ব্যাক্তি বর্তমান নিয়ে সন্তুষ্ঠ
থাকে অব্যশই সে সৃষ্টিকর্তার
দ্বারা পুরস্কৃত হন।

– চাণক্য

৫। যারা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে
তারা কখনও অন্যের দুঃখ
কষ্টকে উপলব্ধি করতে পারে না।

– মাদার টেরেজা

৬। রাগ হচ্ছে ব্যাক্তির পরম শত্রু
যে ব্যক্তির রাগ যত বেশি
ব্যস্তবে সেই ব্যক্তি তত বেশি
সমস্যায় জর্জরিত

– ভগবান শ্রী কৃষ্ণ

৭। নিজেকে কখনো ঘাসের মত
বিছিয়ে দিওনা যাতে সবাই
তোমাকে মারিয়ে চলতে পারে!
নিজেকে আকাশের মত মেলে ধর
যাতে সবাই তোমার নিচে আশ্রয় পায়
কিন্তু কেউ ছুঁতেও না পারে!
টাকা পয়সা না থাকলেই
মানুষ কখনও গরীব হয় না।
প্রকৃত গরীব তো সে
যার সুন্দর একটা মন নেই।

– স্বামী বিবেকানন্দ

৮। কখনও মিথ্যা কথা বলো না
কারণ মিথ্যা মানুষকে ধংসের দিকে
আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়

– ভগবান শ্রী কৃষ্ণ

৯। আমার চরণ ধরিসনা
কারণ আমি ঈশ্বর নই।
আমার আচরণ ধর।
তাতেই তুই ঈশ্বরকে পাবি।

– বাবা লোকনাথ বহ্মচারী

১০। কোন কাজ শুরু করার পূর্বে আমার
স্মরণ করো না,
প্রথমে চেষ্টা করো যদি ব্যর্থ হও তখন
আমায় স্মরণ করো
আমি পথ দেখাব।

– স্বামী বিবেকানন্দ

১১। সারাদিন চলার পথে আপনি যদি
কোন বাধার সম্মুখীন না হন,
তাহলে ভাববেন আপনি
ভুল পথে হাঁটছেন

– স্বামী বিবেকানন্দ

১২। চন্দ্রের যা কলঙ্ক
সেটা কেবল মুখের উপরে
তার জ্যোৎস্নায় কোনো
দাগ পড়ে না।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩। মৃত্যুর যন্ত্রনার চেয়ে
বিরহের যন্ত্রনা যে কতো কঠিন
কতো ভয়ানক তা
একমাত্র ভুক্তভুগিই
অনুভব করতে পারে।

–কাজী নজরুল ইসলাম

১৪। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে
নিজেকে মুক্ত না করিলে
অন্যে মুক্তি দিতে পারে না
অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া
উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্তি

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম।
দূর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ।
পরোপকারিতাই ধর্ম,
পরপীড়নই পাপ।

–স্বামী বিবেকানন্দ।

১৬। বিষ থেকে সুধা,
নোংরা স্থান থেকে সোনা,
নিচ কারো থেকে জ্ঞান
এবং নিচু পরিবার থেকে
শুভলক্ষ্যণা স্ত্রী–
এসব গ্রহণ করা সঙ্গত।

–চাণক্য

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উদ্দেশ্যাবলী

"তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ" ইহা একটি সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয়, সমাজ কল্যাণমূলক, অরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল বর্ণের মানুষকে সংগঠিত করে পূজা-পার্বন ও ধর্মীয় উৎসবাদি সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে উদযাপন, ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, ধর্ম প্রচার, ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় পুস্তকাদির প্রকাশ, ধর্মীয় শিক্ষাদান, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন। বর্ণ বৈষম্যের অবসান করে একই সমাজ গড়ে তোলা, মানবাধিকার, সাংবিধানিক সমঅধিকার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ এবং সমাজ সচেতনাতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সবকিছুর সাথে সাথে আজ আমাদের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। পূজা ও অন্যান্য কার্যসম্পাদনের জন্য অতিব প্রয়োজন একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা। যেহেতু আমাদের সংগঠনের প্রধান কার্যই মন্দির ভিত্তিক।

উপরোক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ সামনে রেখে এই প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পন্ন করবে:-

০১. জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে সকলের প্রতি সহমর্মিতার পরিবেশ, ঐক্য, বিশ্বাস, সততা, কর্ম ও স্বাবলম্বীতা সাধন।

০২. পরিষদের আওতাভুক্ত এলাকায় মন্দির, মঠ, আশ্রম, মিশন, শ্মশান নির্মাণ এবং দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ ও যথাযথভাবে পরিচালনায় সচেষ্ট হওয়া।

০৩. পরিষদের আওতাভুক্ত এলাকায় (তেজকুনীপাড়া) একটি স্থায়ী অফিস গৃহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

০৪. সর্বপ্রকার ধর্মীয় কার্যাবলী যাহাতে সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পালন করা যায় সেই লক্ষ্যে সকলকে সংগঠিত করা এবং পূজা পার্বন আচার অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে পালনে সকলকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত করা।

০৫. ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যাদি চিহ্নিত করে ধর্মের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং সমাজ জীবনে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা ও প্রতিফলন ঘটানো।

০৬. ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধের মাধ্যমে সনাতন (হিন্দু) সম্প্রদায়কে সমাজকর্মে উদ্দীপ্ত এবং ধর্মীয় বিদ্যালয়, পাঠাগার ও ধর্মীয় আলোচনা কেন্দ্র স্থাপন এবং সনাতন (হিন্দু) সম্প্রদায়ের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা লাভের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

০৭. পরিষদের সদস্য ও পোষ্যদেরসহ সনাতন (হিন্দু) সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহ প্রদান করা।

০৮. মহাপুরুষদের আবির্ভাব, তিরোধান এবং বরণ্য মনীষী, কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্ম দিবস উদযাপন ও জাতীয় উৎসবাদি পালন করা।

০৯. বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রথায় নিরুৎসাহিত, অসমবর্ণ বিবাহে উৎসাহ দান করা এবং অসচ্ছল পরিবারকে সাহায্য সহযোগিতা করা।

১০. তীর্থে গমনেচ্ছুকদের সহযোগিতা করা। জাতীয় দুর্যোগ ও মানব কল্যাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ধর্মীয় বৈষম্য, নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা।

১১. বার্ষিক নামযজ্ঞ ও কীর্তন অনুষ্ঠান করা।

Pragati Insurance
Limited
Achieved
AAA
CREDIT RATING
প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় অনবদ্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মানের সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং “AAA” অর্জন করেছে, যা বাংলাদেশের বীমা শিল্পে এক অনন্য রেকর্ড।
Pragati Insurance Limited made an outstanding record by achieving International standard “AAA” Credit rating in the non-life Insurance sector in Bangladesh.
প্রগতি ইন্সুরেন্স লিমিটেড
Pragati Insurance
Limited
Symbol of Security
Tel : +880 2 58150727 & 9133680-2
Web : www.pragatiinsurance.com
27 June 2018

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

উদ্বোধন করবেনঃ
কাউন্সিলর ২৫ নং ওয়ার্ড, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন।
আয়োজনেঃ তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
সহযোগিতায়ঃ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

দুর্গাপূজা

দুর্গোৎসব হল হিন্দু দেবী দুর্গার পূজাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত একটি উৎসব। দুর্গাপূজা সমগ্র হিন্দুসমাজেই প্রচলিত। তবে বাঙালি হিন্দু সমাজে এটি অন্যতম বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। আশ্বিন বা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসের দুর্গাপূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। শারদীয়া দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বেশি। বাসন্তী পূজা মূলত কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

দুর্গাপূজা ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রে পালিত হয়ে থাকে। তবে বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে এবং বাংলাদেশে দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। এমনকি ভারতের অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর এবং ওড়িশা রাজ্যেও দুর্গাপূজা মহাসমারোহে পালিত হয়ে থাকে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রবাসী বাঙালি ও স্থানীয় জনসাধারণ নিজ নিজ প্রথামাফিক শারদীয়া দুর্গাপূজা ও নবরাত্রি উৎসব পালন করে। এমনকি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কর্মসূত্রে বসবাসরত বাঙালিরাও দুর্গাপূজা পালন করে থাকেন। ২০০৬ সালে গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট হলে "ভয়েসেস অফ বেঙ্গল" মরসুম নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় বাঙালি অভিবাসীরা ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এক বিরাট দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন।

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে "দুর্গাষষ্ঠী", "মহাসপ্তমী", "মহাষ্টমী", "মহানবমী" ও "বিজয়াদশমী" নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষটিকে বলা হয় "দেবীপক্ষ"। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যাটির নাম মহালয়া; এই দিন হিন্দুরা তর্পণ করে তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে। দেবীপক্ষের শেষ দিনটি হল কোজাগরী পূর্ণিমা। এই দিন হিন্দু দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। কোথাও কোথাও পনেরো দিন ধরে দুর্গাপূজা পালিত হয়। সেক্ষেত্রে মহালয়ার আগের নবমী তিথিতে পূজা শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর শহরের মৃন্ময়ী মন্দির এবং অনেক পরিবারে এই রীতি প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে মহাসপ্তমী থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত চার দিন সরকারি ছুটি থাকে। বাংলাদেশে বিজয়াদশমীতে সর্বসাধারণের জন্য একদিন ছুটি পালন করা হয়।

পারিবারিক স্তরে দুর্গাপূজা প্রধানত ধনী পরিবারগুলিতেই আয়োজিত হয়। পারিবারিক দুর্গাপূজাগুলিতে শাস্ত্রাচার পালনের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। পূজা উপলক্ষে বাড়িতে আত্মীয়-সমাগম হয়ে থাকে। অন্যদিকে আঞ্চলিক স্তরে এক একটি অঞ্চলের বাসিন্দারা যৌথভাবে যে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন তা বারোয়ারি পূজা বা সর্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় সর্বজনীন পূজা শুরু হয়। মুলত দেবী দুর্গাকে

মাথায় রেখেই দেশমাতা বা ভারতমাতা বা মাতৃভূমির জাতীয়তাবাদী ধারনা বিপ্লবের আকার নেয়। দেবী দুর্গার ভাবনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম গানটি রচনা করেন যা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী নেতারা বিভিন্ন সর্বজনীন পূজার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এখন সর্বজনীন পূজায় "থিম" বা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক মণ্ডপ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। থিমগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে "শারদ সম্মান" নামে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়। এছাড়া বেলুড় মঠ সহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে সন্ন্যাসীরা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন।

দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজন প্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তাঁরা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্টা দেবীর বরে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর এক নাম বাসন্তীপূজা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা। বাসন্তী পূজা হয় চৈত্রের শুক্লপক্ষে, আর শারদীয়া পূজা হয় সাধারণত আশ্বিনের কখনও বা কার্তিকের শুক্লপক্ষে। বর্তমানে শারদীয়া পূজাই সমধিক প্রচলিত। এসময় শুক্লা ষষ্ঠীতিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী (মহানবমী)-তে পূজা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এদিন দশোহরার মেলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নতুন পোশাক পরে দশোহরার মেলায় যায়। মেলার দিন নৌকা বাইচ বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। সকলে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাদির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করে।

দুর্গাপূজা তিন প্রকার: সাত্ত্বিক, তামসিক ও রাজসিক। অতীতে দুর্গাপূজার সময় ছাগ, মেষ, মহিষ, হরিণ, শূকর, গন্ডার, ব্যাঘ্র, গোসাপ, কচ্ছপ বা পাখি বলি দেওয়া হতো। বর্তমানে অবশ্য বলির প্রচলন নেই বললেই চলে।

দেবী সাধারণত দশভুজা, তবে শাস্ত্রানুসারে তাঁর বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোলো, আঠারো বা কুড়ি।

প্রতিমার রং হতে পারে অতসীপুষ্পবর্ণ বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কখনও বা রক্তবর্ণ। প্রতিমা ছাড়াও পূজা হতে পারে দর্পণে, অনাবৃত ভূমিতে, পুস্তকে, চিত্রে, ত্রিশূলে, শরে, খড়গে বা জলে।

বলা হয়ে থাকে যে, বঙ্গদেশে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) রাজত্বকালে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, মতান্তরে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮৩)। কিন্তু জীমূতবাহনের (আনু. ১০৫০-১১৫০) দুর্গোৎসব নির্ণয়, বিদ্যাপতির (১৩৭৪-১৪৬০) দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী, শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) দুর্গোৎসব বিবেক, কৃত্তিবাস ওঝার (আনু. ১৩৮১-১৪৬১) রামায়ণ, বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫-১৪৮০) ক্রিয়াচিন্তামণি, রঘুনন্দনের (১৫শ-১৬শ শতক) তিথিতত্ত্ব ইত্যাদি গ্রন্থে দুর্গাপূজার বিস্তৃত বর্ণনা থাকায় অনুমান করা হয় যে, বাংলায় দুর্গাপূজা দশম অথবা একাদশ শতকেই প্রচলিত ছিল। হয়তো কংসনারায়ণ কিংবা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে তা জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। উনিশ শতকে কলকাতায় মহাসমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষ অব্দি ইউরোপীয়ানরাও দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করত। কোথাও কোথাও যাত্রাগান, পাঁচালি ও কবি গানের আসর বসত।

পূজার আগে খড়-মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে তাতে কাঞ্চন বর্ণের রং লাগানো হয়। অতীতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িসহ আরও কয়েকটি সম্পন্ন পরিবার প্রতিমায় দামি শাড়ি, এমনকি সোনার গহনা পর্যন্ত পড়াত এবং তৎসহ প্রতিমা বিসর্জন দিত। বাংলাদেশের সর্বত্রই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেউ ব্যক্তিগতভাবে করে, কেউবা সমষ্টিগতভাবে।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন সকলে একত্র মিলিত হয়। ঢাকার সর্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। এছাড়া শতাধিক মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন-মন্দিরে অষ্টমীর দিন আট/নয় বছরের একটি বালিকাকে দুর্গা সাজিয়ে কুমারী পূজা করা হয়। দশমীর দিন সরকারি ছুটি থাকে। এদিন সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে এবং বেতার-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। দশমীর দিন সকাল থেকে চলে বিসর্জনের আয়োজন। মিছিল সহকারে প্রতিমা নিয়ে বিকেল থেকে শুরু হয় নিকটস্থ নদী কিংবা পুকুরে বিসর্জনের পালা। ঢাকার অধিকাংশ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় বুড়িগঙ্গার জলে। এভাবে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় পাঁচদিন ব্যাপী দুর্গোৎসব।

রামচন্দ্র অকালবোধন :-

রামচন্দ্র হিন্দু দেবতা ও বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ত্রেতাযুগের শেষে পৃথিবীর উপদ্রবস্বরূপ দানবদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি নররূপ গ্রহণ করেন। পিতা অযোধ্যার রাজা দশরথ, মা রাণী কৈশল্যা এবং স্ত্রী সীতা। তিনি রামায়ণের প্রধান চরিত্র। রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি রাম-চরিত্রটিকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে, এর প্রভাব যুগ যুগ ধরে সনাতন সমাজে অটুট রয়েছে। পিতৃভক্তি, প্রজাবাৎসল্য, পরোপকার, মানবপ্রেম, লোভহীনতা, সত্যপালন ইত্যাদি রাম-চরিত্রের আকর্ষণীয় দিক।

রাম-চরিত্রে পরোপকারের বিষয়টি তাঁর বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তপোবনে এক সময় মুনি-ঋষিরা দানবদের অত্যাচারে যজ্ঞ করতে পারছিলেন না। তখন বিশ্বামিত্রের আহবানে অনুজ লক্ষ্মণসহ রাম সেখানে যান এবং দানবদের হত্যা করে ঋষিদের যজ্ঞক্রিয়া নির্বিঘ্ন করেন।

পুত্র হিসেবে পিতার প্রতি এবং রাজা হিসেবে প্রজাদের প্রতি কর্তব্য কি হওয়া উচিত তার চমৎকার দৃষ্টান্ত রাম-চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। রামের যেদিন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার কথা, সেদিন পিতৃসত্য পালন এবং পিতার সম্মান রক্ষার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় রাজত্ব ত্যাগ করে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যান।

রাম বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু মনুষ্যরূপে জন্ম নিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি মানবীয় আচরণই করেছেন। রাবণের লঙ্কাপুরীতে অবস্থানহেতু সীতার চরিত্র সম্পর্কে নিজের কোনো সংশয় না থাকলেও প্রজাদের সন্দেহের কারণে রাম সীতাকে বিসর্জন দেন। নিষ্পাপ চরিত্র সীতাকে বিসর্জন দিয়ে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হলেও নিজের সুখের চেয়ে রাজ্যের মঙ্গল ও প্রজাদের সুখের বিষয়টিই তাঁর নিকট বড় হয়ে দেখা দেয়। যে বিমাতার ষড়যন্ত্রে অভিষেকের দিন রামকে বনবাসে যেতে হয়েছিল, সেই কৈকেয়ীকেও তিনি নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর পুত্র ভরতকে তিনি সহোদর ভাইয়ের মতোই দেখতেন। অবতার হয়েও রাম এভাবে একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন এবং সমাজে আইন-শৃঙ্খলা, সত্য, মানবতা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই হিন্দুরা তাঁকে শুধু দেবতা হিসেবেই নয়, একজন আদর্শ পুত্র, আদর্শ রাজা, আদর্শ পতি এবং ক্ষমা, সততা ও মহত্তের প্রতীক হিসেবে শ্রদ্ধা করে; সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তারা তাঁকে নিত্য স্মরণ করে।

হিন্দুসমাজে রামের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। মন্দিরে ও গৃহে প্রায়শই রাম-সীতার ছবি দেখা যায়। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে এক সময় ব্যাপকভাবে রামকাহিনীমূলক পালাগান অনুষ্ঠিত হতো। অতীতের মতো না হলেও বর্তমানেও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যও রাম-কাহিনী দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

শারদীয়া দুর্গাপূজাকে "অকালবোধন" বলা হয়। কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দুর্গাকে পূজা করা হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, শরৎকালে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। তাই এই সময়টি তাঁদের পূজার যথাযথ সময় নয়। অকালের পূজা বলে তাই এই পূজার নাম হয় "অকালবোধন"।

এই দুই পুরাণ অনুসারে, রামকে সাহায্য করার জন্য ব্রহ্মা দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর রামায়ণে লিখেছেন, রাম স্বয়ং দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। তবে রামায়ণের প্রকৃত রচয়িতা বাল্মিকী মুনি রামায়ণে রামচন্দ্রকৃত দুর্গাপূজার কোনো উল্লেখ করেন নি। উপরন্তু রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদেও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এই প্রচলিত তথ্য অনুসারে স্মৃতি শাস্ত্রসমুহে শরৎকালে দুর্গাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে, অকালবোধন শরতে বৈদিক যজ্ঞের আধুনিক রূপায়ণ ছাড়া আর কিছুই না।"

দুর্গাপূজার পৌরাণিক উপাখ্যান :

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এ কৃষ্ণকে দুর্গাপূজার প্রবর্তক বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীরা কিভাবে দুর্গাপূজা করেছিলেন, তার একটি তালিকা এই পুরাণে পাওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে কোনো পৌরাণিক গল্পের বিস্তারিত বর্ণনা এই পুরাণে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছেঃ

প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদ্যৌ গোলকে রাগমণ্ডলে।
মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
ত্রিপুরপ্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা।।
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেন শাপাদ্দুর্বাসসঃ পুরা।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী।।
তদা মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈর্দেবৈশ্চ মুনিমানবৈঃ।
পূজিতা সর্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা।।

অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রথম যুগে পরমাত্মা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের আদি-বৃন্দাবনের মহারাসমণ্ডলে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। এরপর মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুরের ভয়ে ব্রহ্মা দ্বিতীয় দুর্গাপূজা করেছিলেন। ত্রিপুর নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শিব বিপদে পড়ে তৃতীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। দুর্বাসা মুনির অভিশাপে লক্ষ্মীকে হারিয়ে ইন্দ্র যে পূজার আয়োজন করেছিলেন, সেটি ছিল চতুর্থ দুর্গাপূজা। এরপর থেকেই পৃথিবীতে মুনিঋষি, সিদ্ধপুরুষ, দেবতা ও মানুষেরা নানা দেশে নানা সময়ে দুর্গাপূজা করে আসছে।

শাক্তধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে, ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু পৃথিবীর শাসক হয়ে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে দুর্গার মাটির মূর্তি তৈরি করে পূজা করেন। এই সময় তিনি "বাগ্‌ভব" বীজ জপ করতেন এবং আহার ও শ্বাস গ্রহণ ত্যাগ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে একশো বছর ধরে ঘোর তপস্যা করেন। এর ফলে তিনি শীর্ণ হয়ে পড়লেও, কাম ও ক্রোধ জয় করতে সক্ষম হন এবং দুর্গানাম চিন্তা করতে করতে সমাধির প্রভাবে স্থাবরে পরিণত হন। তখন দুর্গা প্রীত হয়ে তাঁকে বর দিতে আসেন। মনু তখন দেবতাদেরও দুর্লভ একটি বর চাইলেন। দুর্গা সেই প্রার্থনা রক্ষা করেন। সেই সঙ্গে দুর্গা তাঁর রাজ্যশাসনের পথ নিষ্কণ্টক করেন এবং মনুকে পুত্রলাভের বরও দেন।

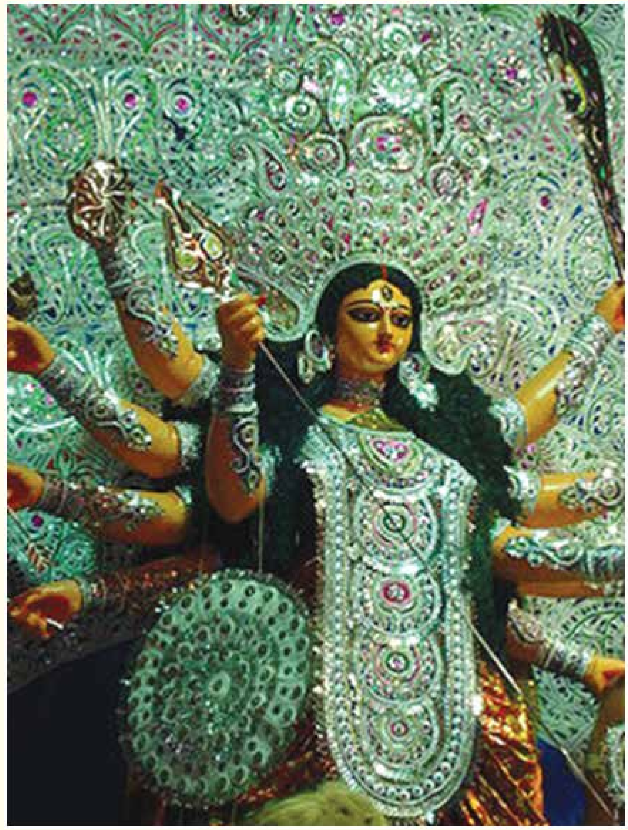

দুর্গা ও দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যতগুলি পৌরাণিক গল্প প্রচলিত আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পটি পাওয়া যায় শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্যম্-এ। এই গল্পটি হিন্দুরা এতটাই মান্য করে যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পাঠ দুর্গাপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। দেবীমাহাত্ম্যম্ আসলে মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর একটি নির্বাচিত অংশ। এতে তেরোটি অধ্যায়ে মোট সাতশোটি শ্লোক আছে। এই বইতে দুর্গাকে নিয়ে প্রচলিত তিনটি গল্প ও দুর্গাপূজা প্রচলনের একটি গল্প রয়েছে। প্রতিটি গল্পে দুর্গাই কেন্দ্রীয় চরিত্র।

রাজা সুরথের গল্প

রাজা সুরথের গল্পটি শ্রীশ্রীচণ্ডী-র প্রধান তিনটি গল্পের অবতরণিকা ও যোগসূত্র। সুরথ ছিলেন পৃথিবীর রাজা। সুশাসক ও যোদ্ধা হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কিন্তু একবার এক যুদ্ধে এক যবন জাতির হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। সেই সুযোগে তাঁর মন্ত্রী ও সভাসদেরা তাঁর ধনসম্পদ ও সেনাবাহিনীর দখল নেন। সুরথ মনের দুঃখে বনে চলে আসেন। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মেধা নামে এক ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। মেধা রাজাকে সমাদর করে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দেন। কিন্তু বনে থেকেও রাজার মনে সুখ ছিল না। সব সময় তিনি তাঁর হারানো রাজ্যের ভালমন্দের কথা ভেবে শঙ্কিত হতেন। এমন সময় একদিন বনের মধ্যে সুরথ সমাধি নামে এক বৈশ্যের দেখা পেলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সুরথ

জানতে পারলেন, সমাধির স্ত্রী ও ছেলেরা তাঁর সব টাকা-পয়সা ও বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাও তিনি সব সময় নিজের স্ত্রী ও ছেলেদের কল্যাণ-অকল্যাণের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হন। তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগল, যারা তাঁদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, তাদের প্রতি তাঁদের রাগ হচ্ছে না কেন? কেনই বা তাঁরা সেই সব লোকেদের ভালমন্দের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হচ্ছেন? দুজনে মেধা ঋষিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, ঋষি বললেন, পরমেশ্বরী মহামায়ার প্রভাবেই এমনটা হচ্ছে। সুরথ তাঁকে মহামায়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি একে একে তাঁকে তিনটি গল্প বলেন। এই গল্পগুলিই শ্রীশ্রীচণ্ডী-র মূল আলোচ্য বিষয়। বইয়ের শেষে দেখা যায়, মেধার গল্প শুনে সুরথ ও সমাধি নদীর তীরে তিন বছর কঠিন তপস্যা ও দুর্গাপূজা করলেন এবং শেষে দুর্গা তাঁদের দেখা দিয়ে সুরথকে হারানো রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং বৈশ্যকে তত্ত্বজ্ঞান দিলেন।

মধুকৈটভব ধরত নারায়ণ, সপ্তদশ শতাব্দীর পুথিচিত্রণ

মধুকৈটভের কাহিনি

শ্রীশ্রী চণ্ডীগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে মধুকৈটভের উপাখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে : প্রলয়কালে পৃথিবী এক বিরাট কারণে-সমুদ্রে পরিণত হলে বিষ্ণু সেই সমুদ্রের উপর অনন্ত নাগকে শয্যা করে যোগ নিদ্রায় মগ্ন হলেন। এই সময় বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য নির্গত হয়ে বিষ্ণুনাভি পদ্মেস্থিত ব্রহ্মাকে বধকরতে উদ্যত হল। ভীত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্যে তাঁর নয়নাশ্রিতা যোগনিদ্রার স্তব করতে লাগলেন। এই স্তবটি গ্রন্থে উল্লিখিত চারটি প্রধান স্তব মন্ত্রের অন্যতম। এই স্তবে সন্তুষ্টা দেবী বিষ্ণুকে জাগরিত করলে তিনি পাঁচ হাজার বছর ধরে মধু ও কৈটভের সঙ্গে মহা সংগ্রামে রত হলেন। মহামায়া শেষে ঐ দুই অসুরকে বিমোহিত করলে তারা বিষ্ণুকে বলে বসে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা প্রীত; তাই আপনার হাতে মৃত্যু হবে আমাদের শ্লাঘার বিষয়। পৃথিবীর যে স্থান জল প্লাবিত নয়, সেখানে আপনি আমাদের উভয়কে বিনাশ করতে পারেন। বিষ্ণু বললেন, তথাস্তু এবং অসুরদ্বয়ের মাথা নিজের জঙ্ঘার উপর রেখে তাদের বধ করলেন।

শুম্ভ-নিশুম্ভের কাহিনি

শুম্ভ ও নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধরত দুর্গা।

দেবীমাহাত্ম্যম্-এ বর্ণিত দেবী দুর্গা সংক্রান্ত তৃতীয় ও সর্বশেষ কাহিনিটি হল শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনি। গ্রন্থের উত্তর চরিত্র বা তৃতীয় খণ্ডে বিধৃত পঞ্চম থেকে একাদশ অধ্যায়ে এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে : শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুরভ্রাতা স্বর্গ ও দেবতাদের যজ্ঞভাগ অধিকার করে নিলে দেবগণ হিমালয়ে গিয়ে বৈষ্ণবী শক্তি মহাদেবীকে স্তব করতে লাগলেন (পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত এই স্তবটি অপরাজিত স্তব নামে পরিচিত; এটি হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র ও নিত্যপাঠ্য একটি স্তবমন্ত্র; যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতাও সমরূপ মন্ত্রগুলি এই স্তবের অন্তর্গত)। এমন সময় সেই স্থানে পার্বতী গঙ্গা স্নানে উপস্থিত হলে, আদ্যাদেবী ইন্দ্রাদি দেবতার স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে তাঁর দেহকোষ থেকে নির্গত হলেন। এই দেবী কৌশিকী নামে আখ্যাত হলেন ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের চর চণ্ড ও মুণ্ড তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজ প্রভুদ্বয়কে বললেন যে এমন স্ত্রীলোক আপনাদেরই ভোগ্যা হবার যোগ্য। চণ্ড-মুণ্ডের কথায় শুম্ভ-নিশুম্ভ মহাসুর সুগ্রীবকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করে দেবীর নিকট প্রেরণ করলেন। সুগ্রীব দেবীর কাছে শুম্ভ-নিশুম্ভের কুপ্রস্তাব মধুরভাবে ব্যক্ত করল। দেবী মৃদু হেসে বিনীত স্বরে বললেন, তুমি সঠিকই বলেছ। এই বিশ্বে শুম্ভ-নিশুম্ভের মতো বীর কে আছে? তবে আমি পূর্বে অল্প বুদ্ধিবশতঃ প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে আমাকে যুদ্ধে পরাভূত করতে পারবে, কেবলমাত্র তাকেই আমি বিবাহ করব। এখন আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করি কি করে! তুমি বরং মহাসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভকে বল, তাঁরা যেন এখানে এসে আমাকে পরাস্ত করে শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করেন। আর বিলম্বে কি প্রয়োজন? সুগ্রীব ক্রোধান্বিত হয়ে দেবীকে নিরস্ত হতে পরামর্শ দিল। কিন্তু দেবী নিজবাক্যে স্থির থেকে তাকে শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে প্রেরণ করলেন।

দেবীর কথায় কুপিত হয়ে অসুররাজ শুম্ভ তাঁকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দৈত্য সেনাপতি ধূম্রলোচনকে প্রেরণ করলেন। ধূম্রলোচনের সঙ্গে দেবীর ভয়ানক যুদ্ধ হল ও সেই যুদ্ধে ধূম্রলোচন পরাজিত ও নিহত হল। এই সংবাদ পেয়ে শুম্ভ চণ্ড-মুণ্ড ও অন্যান্য অসুরসৈন্যদের প্রেরণ করল। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দেবী

নিজ দেহ থেকে দেবী কালীর সৃষ্টি করলেন। চামুণ্ডা ভীষণ যুদ্ধের পর চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করলেন। তখন দেবী দুর্গা তাঁকে চামুণ্ডা আখ্যায় ভূষিত করলেন।

চণ্ড-মুণ্ডের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সকল দৈত্য সেনাকে সুসজ্জিত করে প্রেরণ করলেন দেবীর বিরুদ্ধে। তখন তাঁকে সহায়তার প্রত্যেক দেবতার শক্তি রূপ ধারণ করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। এই দেবীরা হলেন ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী প্রমুখ। এঁরা প্রচণ্ড যুদ্ধে দৈত্য সেনাদের পরাভূত ও নিহত করতে লাগলেন। এই সময় রক্তবীজ দৈত্য সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হল। তার রক্ত একফোঁটা মাটিতে পড়লে তা থেকে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ দৈত্য সৃষ্টি হয়। এই কারণে দুর্গা কালীর সহায়তায় রক্তবীজকে বধ করলেন। কালী রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়তে না দিয়ে নিজে পান করে নেন।

এরপর শুম্ভ আপন ভ্রাতা নিশুম্ভকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দেবী দুর্গা নিশুম্ভকে বধ করলেন। প্রাণ প্রতিম ভাইয়ের মৃত্যুর শোকে আকুল হয়ে শুম্ভ দেবীকে বলল, তুমি গর্ব করো না, কারণ তুমি অন্যের সাহায্যে এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছ। তখন দেবী বললেন,
একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মামপরা। পশ্যৈতা দুষ্ট মধ্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।।
-একা আমিই এ জগতে বিরাজিত। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কে আছে? রে দুষ্ট, এই সকল দেবী আমারই বিভূতি। দ্যাখ্, এরা আমার দেহে বিলীন হচ্ছে।

তখন অন্যান্য সকল দেবী দুর্গার দেহে মিলিত হয়ে গেলেন। দেবীর সঙ্গে শুম্ভের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধান্তে দেবী শুম্ভকে শূলে গ্রথিত করে বধ করলেন। দেবতারা পুনরায় স্বর্গের অধিকার ফিরে পেলেন।

কৃত্তিবাসি রামায়ণ

বাল্মীকির রামায়ণে রামের দুর্গাপূজার কোনো বিবরণ নেই। কিন্তু রামায়ণের পদ্যানুবাদ করার সময় কৃত্তিবাস ও ঝাকালিকাপুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ-এর কাহিনি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে সংযোজিত করেছেন। কৃত্তিবাসি রামায়ণ অনুসারে, রাবণ ছিলেন শিবভক্ত। শিব তাঁকে রক্ষা করতেন। তাই ব্রহ্মা রামকে পরামর্শ দেন, শিবের স্ত্রী দুর্গার পূজা করে তাঁকে তুষ্ট করতে। তাতে রাবণবধ রামের পক্ষে সহজসাধ্য হবে। ব্রহ্মার পরামর্শে রাম শরৎ কালে দুর্গার বোধন, চণ্ডীপাঠ ও মহাপূজার আয়োজন করেন। আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন রামকল্পারম্ভ করেন। তারপর সন্ধ্যায় বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস করেন। মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও সন্ধিপূজার পরেও দুর্গার আবির্ভাব না ঘটায়, রাম ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে মহানবমী পূজার পরিকল্পনা করেন। হনুমান তাঁকে ১০৮টি পদ্ম জোগাড় করে দেন। দুর্গা রামকে পরীক্ষা করার জন্য একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। একটি পদ্ম না পেয়ে রাম পদ্মের বদলে নিজের একটি চোখ উপড়ে দুর্গাকে নিবেদন করতে গেলে, দুর্গা আবির্ভূত হয়ে রামকে কাঙ্ক্ষিত বর দেন।

পূজামন্ত্র

সনাতম ধর্মের যেকোনো পূজার ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সংস্কৃত মন্ত্রগুলি। দূর্গা পূজার মন্ত্র গুলি সাধারণত শ্রী শ্রী চণ্ডি থেকে পাঠ করা হয়। ঢাক-ঢোল, খোল করতাল, সুগন্ধী আগর বাতি তার সাথে এই সংস্কৃত মন্ত্রগুলি এক পবিত্র পরিবেশের জন্ম দেয়।

দুর্গা পূজার পুষ্পাঞ্জলি দেয়ার মন্ত্রঃ

ওঁজয়ন্তিমঙ্গলাকালী, ভদ্রকালীকপালিনী, দূর্গাশিবাক্ষমাধাত্রী, স্বাহাস্বধানমস্তুতে। এসস্বচন্দন পুষ্পবিল্ব পত্রাঞ্জলীনম ভগবতী দূর্গাদেবীনমহ্।

দুর্গা প্রণাম মন্ত্রঃ

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যেশিবেসর্বার্থসাধিকে
শরণ্যেত্রম্বকেগৌরিনারায়নীনমস্তুতে

অর্থঃ হে দেবী সর্বমঙ্গলা, শিবা, সকল কার্য সাধিকা, শরণযোগ্য, গৌরি ত্রিনয়ণী, নারায়নী তোমাকে নমস্কার।

মূর্তিতত্ত্ব

বাংলার মৃৎশিল্পের ছোঁয়ায় দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি সচরাচর দেখা যায় সেটি পরিবার সমন্বিতা বা সপরিবার দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তির মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী ও মহিষাসুরমর্দিনী; তাঁর মুকুটের উপরে শিবের ছোট মুখ, দেবীর ডানপাশে উপরে দেবী লক্ষ্মী ও নিচে গণেশ; বামপাশে উপরে দেবী সরস্বতী ও নিচে কার্তিক। কলকাতায় সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার ১৬১০ সালে এই সপরিবার দুর্গার প্রচলন করেন। তাঁরা কার্তিকেয়র রূপ দেন জমিদারপুত্রের, যা তৎপূর্ব ছিল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আদলে যুদ্ধের দেবতা রূপে। এছাড়াও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-সংলগ্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার এক বিশেষ মূর্তি দেখা যায়। সেখানে দেবীর ডানপাশে উপরে গণেশ ও নিচে লক্ষ্মী, বামে উপরে কার্তিক ও নিচে সরস্বতী এবং কাঠামোর উপরে নন্দী-ভৃঙ্গীসহ বৃষভবাহন শিব ও দুইপাশে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া অবস্থান করেন। কলকাতার কোনও কোনও স্থানে দুর্গোৎসবে লক্ষ্মী ও গণেশকে সরস্বতী ও কার্তিকের সঙ্গে স্থান বিনিময় করতে দেখা যায়। আবার কোথাও কোথাও দুর্গাকে শিবের কোলে বসে থাকতেও দেখা যায়। এগুলি ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রকমের স্বতন্ত্র মূর্তিও চোখে পড়ে। তবে দুর্গার রূপকল্পনা বা কাঠামোবিন্যাসে যতই বৈচিত্র থাকুক, বাংলায় দুর্গোৎসবে প্রায় সর্বত্রই দেবী দুর্গা সপরিবারে পূজিতা হন। এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রমেয়ানন্দের উক্তিটি স্মরণীয়ঃ

...ধনদাত্রী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, শৌর্য-বীর্যের প্রতীক কার্তিক, সিদ্ধিদাতা গণেশ ও তাঁদের বাহন-সকলের মূর্তিসহ মহামহিমাময়ী দুর্গামূর্তির পরিকল্পনা ও পূজা বাংলার নিজস্ব।

দুর্গা

হিন্দু শাস্ত্রে 'দুর্গা' নামটির ব্যাখ্যা নিম্নোক্তরূপে প্রদত্ত হয়েছে :

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত।।
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিত।।

- 'দ' অক্ষর দৈত্য নাশক, উ-কার বিঘ্ন নাশক, 'রেফ' রোগনাশক, 'গ' অক্ষর পাপ নাশক ও অ-কার ভয়-শত্রু নাশক। অর্থাৎ, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে, "দুর্গংনাশয়তিযানিত্যংসাদুর্গাবাপ্রকীর্তিতা" -অর্থাৎ, দুর্গ নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই নিত্যদুর্গা নামে অভিহিতা। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে এই দেবীই 'নিঃশেষ দেবগণ শক্তি সমূহ মূর্ত্যাঃ' বা সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি।

সিংহ

দুর্গার বাহন সিংহ। শ্রীশ্রীচণ্ডী-তে সিংহকে "মহাসিংহ", "বাহনকেশরী", "ধূতসট" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। দুর্গাপূজার সময় সিংহকেও বিশেষভাবে পূজা করা হয়। দেবীপুরাণ-এ উল্লিখিত সিংহের ধ্যানে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রমুখ দেবদেবীরা অবস্থান করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর একটি ধ্যান মন্ত্রে সিংহকে বিষ্ণুর একটি রূপ বলা হয়েছে। কালীবিলাস তন্ত্র-এ দুর্গার বাহনকে বলা হয়েছে বিষ্ণুরূপী সিংহ।কালিকাপুরাণ অনুসারে, দুর্গার বাহন হওয়ার জন্য শিব শবদেহ, ব্রহ্মা রক্তপদ্ম ও বিষ্ণু সিংহের মূর্তি ধারণ করেছিলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে, হিমালয় দুর্গাকে সিংহ দেন। শিবপুরাণ অনুসারে, শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করার জন্য ব্রহ্মা দুর্গাকে সিংহ দেন। পদ্মপুরাণ-এ আছে, দুর্গার ক্রোধ থেকে সিংহের জন্ম হয়। দেবীপুরাণ অনুযায়ী, বিষ্ণু দুর্গার বাহন সিংহকে নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সিংহে সকল দেবতার অধিষ্ঠান হয়েছিল।সিংহ রজোগুণের এক প্রচণ্ড শক্তির উচ্ছ্বাসের প্রতীক।

স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন, সত্ত্বগুণের অনুগত হলে সেই শক্তি লোকস্থিতির সহায়ক হয়ে ওঠে। ... (সিংহ) আসুরিকতা ও পাশবিকতার উচ্ছেদ সাধনপূর্বক দেবীর লোকস্থিতিমূলক পূণ্য কর্মের সহায়কারী।

এছাড়াও সিংহ মানুষের পশুত্ববিজয়েরও প্রতীক। স্বামী প্রমেয়ানন্দ লিখেছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে পশুশক্তি। পুরুষকার ও সাধন-ভজনের দ্বারা মানুষ যখন যথার্থ মনুষ্যত্বে উপনীত হয় তখন তার পশুভাব কেটে গিয়ে দেবভাব জাগ্রত হয়। আর তখনই সে প্রকৃত শরণাগত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে, সার্থক জীবনের অধিকারী হয়। দেবীর চরণতলে সিংহ সেই ভাবেরই প্রতীক।

মহিষাসুর

মহিষাসুর অসুর, অর্থাৎ দেবদ্রোহী। তাই দেবীপ্রতিমায় দেবীর পদতলে দলিত এই অসুর 'সু' এবং 'কু'-এর মধ্যকার চিরকালীন দ্বন্দে অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয়ের প্রতীক। স্বামী প্রমেয়ানন্দের ভাষায়, সাধকের পক্ষে অসুর অবিদ্যা। বিদ্যারূপিণী মা অবিদ্যা বিনাশ করে মহামুক্তির বিধান করেন। সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, ভয়-ভীতি, আপদ-বিপদ- এ-সকলই আসুরিক শক্তির কার্য। পরমকরুণাময়ী মা নিরন্তর অসুর বিনাশ করে সন্তানের কল্যাণ বিধান করছেন।

তবে অসুর হলেও দুর্গোৎসবে মহিষাসুরেরও পূজার চল আছে। কালিকা পুরাণ অনুসারে, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে নিজের মৃত্যুদৃশ্য স্বপ্নে দেখে ভীত মহিষাসুর ভদ্রকালীকে তুষ্ট করেছিলেন। ভদ্রকালী তাঁকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি না দিলেও তাঁর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে বর দান করতে ইচ্ছুক হন। মহিষাসুর দেবতাদের যজ্ঞভাগ বর চাইলে দেবী সেই বর দিতে অস্বীকৃত হন; কিন্তু মহিষাসুরকে এই বর দেন যে যেখানেই দেবী পূজিতা হবেন, সেখানেই তাঁর চরণতলে মহিষাসুরেরও স্থান হবে।

গণেশ

গণেশ কার্যসিদ্ধির দেবতা। হিন্দু পুরাণের নিয়ম অনুসারে, অন্যান্য দেবতার আগে গণেশের পূজা করতে হয়। গণেশের পূজা আগে না করে অন্য কোনো দেবতার পূজা করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। স্বামী প্রমেয়ানন্দ লিখেছেন,

গণশক্তি যেখানে ঐক্যবদ্ধ সেখানে কর্মের সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়। দেবাসুর-যুদ্ধে দেবতারা যতবারই ঐক্যবদ্ধ হয়ে অসুরদের সঙ্গে লড়াই করেছেন ততবারই তাঁরা জয়ী হয়েছেন। গণেশের আর এক নাম বিঘ্নেশ, অর্থাৎ বিঘ্ননাশকারী। বিঘ্নেশ প্রসন্ন থাকলে সিদ্ধি নিশ্চিত।

মুষিক

গণেশের বাহন মুষিক বা ইঁদুর। ইঁদুর মায়া ও অষ্টপাশ ছেদনের প্রতীক। ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেবের ভাষায়, অথর্বশীর্ষের সায়নভাষ্যে উক্ত হইয়াছে মুষ্ণাতি অপহরতি কর্মফলানি ইতি মূষিকঃ। জীবের কর্মফলসমূহ অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে বলিয়া ইহার নাম মুষিক। প্রবল প্রতিবন্ধকস্বরূপ কর্মফল বিদ্যমান থাকিতে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই, কর্মফল হরণের উপর সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত।

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী শ্রী, সমৃদ্ধি, বিকাশ ও অভ্যুদয়ের প্রতীক। শুধু ধনৈশ্বর্যই নয়, লক্ষ্মী চরিত্র ধনেরও প্রতীক। স্বামী নির্মলানন্দের ভাষায়, ধন, জ্ঞান ও শীল- তিনেরই মহনীয় বিকাশ দেবী লক্ষ্মীর চরিত্র মাহাত্ম্যে। সর্বাত্মক বিকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেই তিনি কমলা। কমল বা পদ্মের ন্যায়ই তিনি সুন্দরী; তদীয় নেত্রদ্বয় পদ্মের ন্যায় আয়ত। তাঁর শুভ করে প্রস্ফুটিত পদ্মকুসুম; পদ্মবনেই তাঁর বসতি।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী অন্যদিকে সমুদ্রমন্থনে সমুদ্ভূতা দেবী লক্ষ্মীর মূর্তিতত্ত্বের অপর এক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, যাঁহারা বিচক্ষণ তাঁহারা ভূমি-প্রকৃতি কর্ষণ করিয়া শস্যধন আহরণ করেন, বন-প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া ধন আহরণ করেন। খনি প্রকৃতি খনন করিয়া স্বর্ণধন সংগ্রহ করেন। এই সকলই সাগর মন্থন। ... এই সকল সাগর-মন্থনে ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

লক্ষ্মীর বাহন পেচক বা প্যাঁচা। রূপে ও গুণে অতুলনীয় এই দেবীর এমন কিম্ভূত বাহন কেন, সে নিয়ে বেশ কয়েকটি মত প্রচলিত। প্রথমেই স্মরণে রাখা কর্তব্য, হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও পেচককে লক্ষ্মীর বাহনের মর্যাদা দান করা হয়নি। এই বিশ্বাস একান্তই বাঙালি লোক-বিশ্বাস। প্যাঁচা দিবান্ধ। মনে করা হয়, যাঁরা দিবান্ধ অর্থাৎ তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ, তাঁরাই পেচকধর্মী। মানুষ যতকাল পেচকধর্মী থাকে ততদিনই ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করে সে। মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর মতে, পেচক মুক্তিকামী সাধককে বলে, সকলে যখন ঘুমায় তুমি আমার মতো জাগিয়া থাকো। আর সকলে যখন জাগ্রত তখন তুমি আমার মতো ঘুমাইতে শিখ, তবেই সাধনে সিদ্ধি। কৈবল্যধন লাভ। পরমার্থ ধনাভিলাষী সাধক পেঁচার মতো রাত্রি জাগিয়া সাধন করে। লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে থাকে। লক্ষ্মীমার বাহন রূপে আসন লইয়া পেচকের যে ভাষণ তাহা বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রকার সাধকের উপাদেয় সম্পদ।

সরস্বতী

সরস্বতী বাণীরূপিণী বাগদেবী; তিনি জ্ঞানশক্তির প্রতীক। দেবীর হাতে পুস্তক ও বীণা। পুস্তক বেদ শব্দ ব্রহ্ম। বীণা সুরছন্দের প্রতীক নাদ ব্রহ্ম। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের পূর্তি, তাই সর্বশুক্লা। শ্বেতবর্ণটি প্রকাশাত্মক। সরস্বতী শুদ্ধ জ্ঞানময়ী প্রকাশস্বরূপা। জ্ঞানের সাধক হতে হলে সাধককে হতে হবে দেহে মনে প্রাণে শুভ্র-শুচি।

হংস

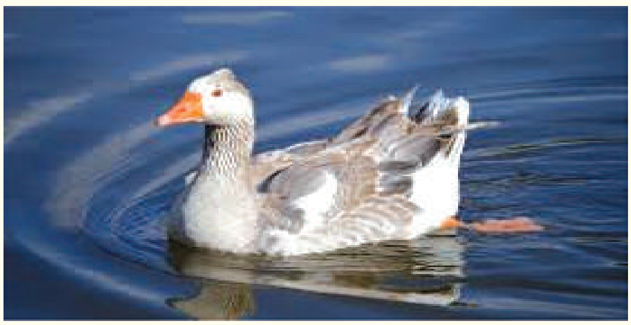

সরস্বতীর বাহন হংস। হংস হিন্দুদের নিকট একটি পবিত্র প্রতীক। সরস্বতী-ব্রহ্মবিদ্যা। যে সাধক দিবারাত্র অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তিনিই হংসধর্মী। মানুষ সুস্থ শরীরে দিবারাত্রের মধ্যে একুশ হাজার ছয়শত 'হংস' এই অজপা মন্ত্র জপরূপে শ্বাস-প্রশ্বাস করিয়া থাকে। মানুষ যতদিন এই স্বাভাবিক জপ উপলব্ধি করতে না পারে, ততদিন 'হংসধর্মী' হতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যারও সন্ধান পায় না।

কার্তিক

দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বা কার্তিক সৌন্দর্য ও শৌর্যবীর্যের প্রতীক। যুদ্ধে শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই সাধক-জীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে কার্তিকেয়কে প্রসন্ন করতে পারলে শৌর্য-বীর্য আমাদের করতলগত হয়।

কার্তিকেয়ের বাহন ময়ূর। সৌন্দর্য ও শৌর্য -কার্তিকেয়ের এই দুই বৈশিষ্ট্যই তাঁর বাহন ময়ূরের মধ্যে বিদ্যমান।

মহালয়া

মহালয়া বা পিতৃপক্ষের দিন থেকে মূলত দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তবে এ দিনটির তাৎপর্য মূলত ভিন্ন। এ তিথিকে পিতৃপক্ষও বলা হয়ে থাকে। এ দিনে পিতৃপক্ষের শেষ এবং দেবী পক্ষের শুরু হয়। এই মহালয়া তিথিতে যারা পিতৃ-মাতৃহীন তারা তাদের পূর্বপুরুষের স্মরণ করে, পূর্ব পুরুষের আত্মার শান্তি কামনা করে অঞ্জলি প্রদান করেন। সনাতন ধর্ম অনুসারে এই দিনে প্রয়াত আত্মাদের মত্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়, প্রয়াত আত্মার যে সমাবেশ হয় তাহাকে মহালয়া বলা হয়। মহালয় থেকে মহালয়া। পিতৃপক্ষেরও শেষদিন এটি। মহালয়াতে যারা গঙ্গায় অঞ্জলি প্রদান করেন পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তির জন্য, তাহারা শুধু পূর্বদের নয়, পৃথিবীর সমগ্র কিছুর জন্য প্রার্থনা ও অঞ্জলি প্রদান করেন। যাদের পুত্র নেই, যাদের কেউ নেই আজ স্মরণ করার তাদের জন্যও অঞ্জলি প্রদান করতে হয়।

এ সম্পর্কে মহাভারতে একটি কাহিনী বর্ণীত আছে যে: প্রসিদ্ধ দাতাকর্ণের মৃত্যু হলে তাঁর আত্মা স্বর্গে গমন করলে, তাঁকে স্বর্ণও রত্ন খাদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়। কর্ণ ইন্দ্রকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইন্দ্র বলেন, কর্ণ সারাজীবন স্বর্ণই দান করেছেন, তিনি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কোনোদিন খাদ্য প্রদান করেননি। তাই স্বর্গে তাঁকে স্বর্ণই খাদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। কর্ণ বলেন, তিনি যেহেতু তাঁর পিতৃগণের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তাই তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে পিতৃগণকে স্বর্ণপ্রদান করেননি। এই কারণে কর্ণকে ষোলো দিনের জন্য মর্ত্যে গিয়ে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে অন্ন ও জল প্রদান করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই পক্ষই পিতৃপক্ষ নামে পরিচিত হয়। এই কাহিনির কোনো কোনো পাঠান্তরে, ইন্দ্রের বদলে যমকে দেখা যায়।

নব পত্রিকা

নব পত্রিকা বাংলার দুর্গা পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। নব পত্রিকা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নটি গাছের পাতা। তবে বাস্তবে নব পত্রিকাটি পাতা নয়, নটি উদ্ভিদ। এগুলি হল -

১. কদলীবারম্ভা (কলা), ২.অপরাজিতা, ৩.হরিদ্রা (হলুদ), ৪.জয়ন্তী, ৫. বিল্ব (বেল), ৬. দাড়িম্ব (দাড়িম), ৭. অশোক, ৮. মানকচু, ৯. ধান

একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি সমূলসপত্র উদ্ভিদ একত্র করে একজোড়া বেলসহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর তাতে সিঁদুর দিয়ে সপরিবার দেবীপ্রতিমার ডানদিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নব পত্রিকার নাম কলা বউ।

প্রতীকরূপে কল্পিত হয়। এই নয় দেবী হলেন রম্ভাধিষ্ঠাত্রীব্রহ্মাণী, কচ্বাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী-শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা ও ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এই নয়দেবী একত্রে "নবপত্রিকা বাসিনী নবদুর্গা" নামে নবপত্রিকা বাসিন্যৈনবদুর্গায়ৈনমঃ মন্ত্রে পূজিতা হন।

মহা সপ্তমীর দিন সকালে নিকটস্থ নদী বা কোনো জলাশয়ে (নদী বা জলাশয়ে না থাকলে কোনো মন্দিরে) নিয়ে যাওয়া হয়। পুরোহিত নিজেই কাঁধে করে নবপত্রিকা নিয়ে যান। তাঁর পিছন পিছন ঢাকীরা ঢাক বাজাতে বাজাতে এবং মহিলারা শঙ্খ ও উলুধ্বনি করতে করতে যান। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী স্নান করানোর পর নবপত্রিকাকে নতুন শাড়ি পরানো হয়। তারপর পূজামণ্ডপে নিয়ে এসে নবপত্রিকাকে দেবীর ডানদিকে একটি কাষ্ঠ সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। পূজামণ্ডপে নবপত্রিকা প্রবেশের মাধ্যমে দুর্গাপূজার মূল অনুষ্ঠানটির প্রথাগত সূচনা হয়। নবপত্রিকা প্রবেশের পর দর্পণে দেবীকে মহাস্নান করানো হয়। এরপর বাকি দিনগুলিতে নবপত্রিকা প্রতিমাস্থ দেবদেবীদের সঙ্গেই পূজিত হতে থাকে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল, নবপত্রিকা প্রবেশের পূর্বে পত্রিকার সম্মুখে দেবী চামুণ্ডার আবাহন ও পূজা করা হয়। অপর কোনো দেবীকে পৃথকভাবে পূজা করা হয় না।

মহাস্নান

দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল মহাস্নান। মহাসপ্তমীর দিন নবপত্রিকা স্নানের পর মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়। মহাষ্টমী ও মহানবমীর দিন ও পূজার মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গা প্রতিমার সামনে একটি দর্পণ বা আয়না রেখে সেই দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিমার প্রতিবিম্বে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে স্নান করানো হয়। মহাস্নানের সময় শুদ্ধজল, নদীরজল, শঙ্খজল, গঙ্গাজল, উষ্ণজল, সুগন্ধিজল, পঞ্চগব্য, কুশ ঘাসের দ্বারা ছেটানো জল, ফুলের দ্বারা ছেটানো জল, ফলের জল, মধু, দুধ, নারকেলের জল, আখের রস, তিল তেল, বিষ্ণু তেল, শিশিরের জল, রাজদ্বারের মাটি, চৌমাথার মাটি, বৃষশৃঙ্গ মৃত্তিকা, গজদন্ত মৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, নদীর দুই

তীরের মাটি, গঙ্গা মাটি, সব তীর্থের মাটি, সাগরের জল, ঔষধি মেশানো জল, বৃষ্টিজল, সরস্বতী নদীরজল, পদ্মের রেণু মেশানো জল, ঝরনার জল ইত্যাদি দিয়ে দুর্গাকে স্নান করানো হয়। মহাস্নানের প্রতীকী তাৎপর্য সম্পর্কে স্বামী ত্যাগি বরানন্দ লিখেছেন,

এই সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সমাজের কৃষি সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, জলজ সম্পদ, প্রাণীজ সম্পদ, ভূমিসম্পদ প্রভৃতি রক্ষা করার জন্য সাধারণ মানসে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। নৈতিকতা স্থাপনে সর্বভূতে দেবীরই অধিষ্ঠান স্বরূপ এর ভাবটিও ফুটে ওঠে এই মহাস্নানে। এমনকী চাষা-ভূষা, মুচি-মেথর থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ, মালি, কুম্ভকার, তন্তুবায়, নরসুন্দর, ঋষি, দাস প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ বিশ্বসংহতি ও বিশ্বের কাছে এক অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের সমন্বয় বার্তাপ্রেরণ করে। এক কথায় সার্বিক সমাজকল্যাণের চিন্তা ফুটে ওঠে এই মহাস্নানে।

কুমারীপূজা

কুমারী পূজা তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনধিক ষোলো বছরের অরজঃস্বলা কুমারী মেয়ের পূজা। বিশেষত দুর্গা পূজার অঙ্গরূপে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ও অন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে এবং কামাখ্যা দিশক্তি ক্ষেত্রেও কুমারী পূজার প্রচলন আছে। শাস্ত্রমতে কুমারী পূজার উদ্ভব হয় কোলাসুরকে বধ করার পর থেকে। কোলাসুর এক সময় স্বর্গ-মর্ত্য অধিকার করলে বিপন্ন দেবগণ মহাকালীর শরণাপন হন। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে দেবী পুনর্জন্মে কুমারী রূপে কোলাসুরকে বধ করেন। তারপর থেকেই মর্ত্যে কুমারী পূজার প্রচলন হয়। যোগিনীতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, দেবীপুরাণ, স্তোত্র, কবচ, সহস্রনাম, তন্ত্রসার, প্রাণতোষিণী, পুরোহিত দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে কুমারী পূজার পদ্ধতি ও মাহাত্ম্য বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কুমারী পূজায় কোনো জাতি, ধর্ম বা বর্ণভেদ নেই। দেবীজ্ঞানে যেকোনো কুমারীই পূজনীয়, এমনকি বেশ্যাকুলজাতকুমারীও। এক থেকে ষোলো বছর বয়সী কুমারী মেয়ের পূজা করা চলে। বয়সের ক্রমানুসারে পূজাকালে এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন এক বছরের কন্যা সন্ধ্যা, দুই বছরের সরস্বতী, তিন বছরের ত্রিধা মূর্তি, চার বছরের কালিকা, পাঁচ বছরের সুভগা, ছয় বছরের উমা, সাত বছরের মালিনী, আট বছরের কুব্জিকা, নয় বছরের কালসন্দর্ভা, দশ বছরের অপরাজিতা, এগারো বছরের রুদ্রাণী, বারো বছরের ভৈরবী, তেরো বছরের মহালক্ষ্মী, চৌদ্দ বছরের পীঠনায়িকা, পনেরো বছরের ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোলো বছরের অন্নদা বা অম্বিকা।

কুমারী মেয়েকে মনে করা হয় সর্altবিদ্যা স্বরূপিণী। কুমারী পূজা ব্যতীত দেবতার পূজা, হোম ইত্যাদি কোনো কিছুই সফল হয় না। ভক্তদের বিশ্বাস, এর দ্বারা কোটি গুণ ফল লাভ হয়, সকল বিপদ দূরীভূত হয়; কুমারী ভোজনে ত্রিলোক ভোজনের ফল হয়। কুমারী পূজার দার্শনিক তত্ত্ব হলো নারীতে পরমার্থ দর্শন ও পরমার্থ লাভ। বিশ্বব্রহ্মান্ডে যে ত্রিশক্তির বলে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্রিয়া সাধিত হচ্ছে, সে ত্রিবিধ শক্তিই বীজাকারে কুমারীতে নিহিত। কুমারী প্রকৃতি বা নারী জাতির প্রতীক ও বীজাবস্থা। তাই কুমারী বা নারীতে দেবী ভাব আরোপ করে তার সাধনা করা হয়। এ এক মহত্তম সাধন পদ্ধতি। এ সাধনায় সাধকের নিকট বিশ্বজননী কুমারী নারী মূর্তির রূপধারণ করে; তাই তার নিকট নারী ভোগ্যা নয়, পূজ্যা। এ ভাবনায় ভাবিত হয়েই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজের স্ত্রীকে ষোড়শী জ্ঞানে পূজা করেছিলেন। কুমারী পূজার মাধ্যমে এ সত্যই তুলে ধরা হয়।

বর্তমানে কুমারী পূজার বহুল প্রচলন নেই, তবে পুণ্যকর্ম হিসেবে কুমারীকে দান ভোজনে আপ্যায়িত করার প্রথা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশে কুমারী পূজার প্রচলন যে বহু আগে থেকেই ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কুমারী পূজা প্রয়োগ নামক গ্রন্থের পুথি থেকে (বাংলা একাডেমী সংগ্রহ- ১৫৯, লিপিকাল ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ)। বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, সিলেট, হবিগঞ্জ ও দিনাজপুর জেলা শহরে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজার প্রচলন আছে। প্রতিবছর দুর্গাদেবীর মহাষ্টমী পূজাশেষে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মতান্তরে নবমী পূজার দিনও এ পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে। ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের কুমারী পূজা খুবই আকর্ষণীয়।

সন্ধি পূজা

দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অধ্যায় হল সন্ধি পূজা। দুর্গা পূজার অষ্টমীর দিন হয় এই বিশেষ পূজা, এই পূজার সময়কাল ৪৮ মিনিট। অষ্টমীতিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমীতিথির প্রথম ২৪ মিনিট মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এই পূজা। যেহেতু অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগস্থলে এই পূজা হয় তাই এই পূজার নাম সন্ধিপূজা অর্থ্যাৎ সন্ধি-কালিন পূজা। এই পূজা দুর্গা পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ, এই সময় দেবী দুর্গাকে চামুন্ডারূপে পূজা করা হয়ে থাকে। এই পূজা সম্পন্ন হয় তান্ত্রিক মতে। এই পূজায় দেবীকে ষোলটি উপাচার নিবেদন করা হয়।

অপরাজিতা পূজা

অপরাজিতা পূজা দুর্গা পূজার একটি অঙ্গ। দুর্গার অপর নাম অপরাজিতা। তবে এই দেবীর মূর্তি অন্যরকম। ইনি চতুর্ভূজা; হাতে শঙ্খ, চক্র, বর ও অভয় মুদ্রা; গায়ের রং নীল; ত্রিনয়না ও মাথায় চন্দ্রকলা। বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জনের পর পূজামণ্ডপের ঈশানকোণে অষ্টদল পদ্ম এঁকে অপরাজিতার লতা রেখে এই দেবীর পূজা করা হয়। হংস নারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে, ইনি "... বৈষ্ণবীশক্তি বিষ্ণু মায়া লক্ষ্মী ও শিবশক্তি শিবানীর মিশ্রণে কল্পিতা।"

পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন যেমনটা আপনার চাই
আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিকতায়
এক্সিম ব্যাংকের
আকর্ষণীয় আমানত হিসাবসমূহ
মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকুফ আমানত
'ইহলৌকিক শান্তি-পারলৌকিক মুক্তি'
মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প
'আপনার হজ্জ হোক স্বাচ্ছন্দ্যময়'
এক্সিম রুহামা
'তিন বছরে দ্বিগুণ'*
এক্সিম যিয়াদাহ
'পাঁচ বছরে তিনগুণ'*
শর্ত প্রযোজ্য
এক্সিম শেফা
'প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস'
• মুদারাবা শেফা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
মুদারাবা মাসিক আয় আমানত প্রকল্প
'প্রতি মাসের মুনাফা যখন উপার্জনের সাথী'
মুদারাবা সুপার সেভিংস আমানত প্রকল্প
'দ্বিগুণ লাভে সমৃদ্ধ আগামীর পথে'
মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
'সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের স্বপ্ন'
মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'
• মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
• মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী প্রকল্প
মুদারাবা দেনমোহর/বিবাহ আমানত প্রকল্প
'আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও'
সুরা নিসা, আয়াত ২৫
আল ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত
'আমানত থাকুক সুরক্ষিত'
মুদারাবা মেয়াদী আমানত
'মেয়াদ শেষ তো মুনাফা শুরু'
এক্সিম স্বপ্ন
'এগিয়ে যান স্বপ্নপূরণের পথে'
• মুদারাবা হাউজিং / অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প
এক্সিম সিনিয়র
'আমার সঞ্চয়, আমার অবলম্বন'
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প
মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
'সঞ্চয়ের শুরু এখানেই'
মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
'মাসিক সঞ্চয়ে বার্ষিক মুনাফা'
এক্সিম কৃষি
'সঞ্চয়ের বীজে বাড়ুক সমৃদ্ধির ফসল'
• মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
**এক্সিম ব্যাংকের সকল হিসাব শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় মুনাফার হার কম/বেশি হতে পারে
EXIM BANK
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক
mindtree/eximbank/jan-2018
www.eximbankbd.com
সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246

হিন্দু দেব-দেবী

হিন্দু দেবতাদের উদাহরণ: ব্রহ্মা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, হরিহর ও অর্ধনারীশ্বর.

হিন্দু উপাস্যগণ বলতে হিন্দুধর্মের দেব-দেবীদেরকে বোঝানো যায়। বৈচিত্রর্পূণ এই ধর্মে উপাস্য বোঝাতে দেব, দেবী, ঈশ্বর, ভগবান, ভগবতী শব্দগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

হিন্দুদের দেব-দেবীগণ বৈদিক যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) ও মধ্যযুগে (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) নেপাল ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। হিন্দু দেবতা বলতে যোগশাস্ত্রের ইষ্টদেবতা, তেত্রিশ বৈদিক দেবতা বা শতাধিক পৌরাণিক দেবতাদের কথা বোঝানো যায়। এদের মধ্যে মুখ্য দেবতারা হলেন বিষ্ণু, শিব, শ্রী বা লক্ষী, পার্বতী বা দুর্গা, ব্রহ্মা এবং সরস্বতী। প্রত্যেক দেবতার আলাদা আলাদা জটিল জটিল চরিত্রাবলী বিদ্যমান হলেও তাঁদেরকে অনেকসময়ই ব্রাহ্মণ নামে এক নিরাকার পরম সত্তার অংশবিশেষ বলে ধরা হয়। প্রাচীন কাল থেকেই এই একত্বের ধারনা হিন্দুধর্মের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য, যা ধর্মশাস্ত্র এবং হরিহর (শিব ও বিষ্ণু), অর্ধনারীশ্বর (অর্ধেক শিব অর্ধেক পার্বতী) -এর মতো মূর্তিগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়।

মুখ্য দেবতার উপাসকরা হিন্দুধর্মের ভিন্ন শাখাগুলির জন্ম দিয়েছেন যেমন শৈবমত, বৈষ্ণবমত ও শাক্তমত। কিন্তু শাখাগুলির মধ্যে বহু মিলও আবার রয়েছে।

হিন্দু দেবতাদেরকে বিভিন্ন প্রতীকের দ্বারা চেনানো যেতে পারে, যেমন ছবি বা প্রতিমা। কিছু হিন্দুদর্শন যেমন চার্বাকরা আবার নাস্তিক্যবাদী মনোভাব পোষণ করেছেন এবং দেবতা বা ঈশ্বরের ধারণাকে অস্বীকার করেছেন। আর্য সমাজ বা ব্রাহ্ম সমাজের মতো ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মমতগুলি একাধিক দেবতার ধারণাকে বাতিল করে অব্রাহামীয় ধর্মগুলির মতই নিরাকার একেশ্বর-বিশ্বাসের পথে হেঁটেছেন। জৈনধর্ম বা বহির্ভারতীয় থাইল্যান্ড বা জাপানিজ বৌদ্ধবিশ্বাসে হিন্দু দেবতাদের আপন করে নেওয়া হয়েছে। এখনও এঁদেরকে সেইসব ধর্মীয় মন্দিরে বা শিল্পে দেখানো হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাস্ত্রে মানব শরীরকে এক মন্দির বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে ভগবান মানব মন্দিরেই বসবাস করেন। একই রকম ভাবে ব্রাহ্মণ বা পরমতম সত্তাকে আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, এই আত্মা শাশ্বত ও প্রত্যেক প্রাণী শরীরে বাস করেন। হিন্দুধর্মের উপাস্যগণ বৈচিত্র্যময় কেননা হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ বহুঈশ্বরবাদী, একেশ্বরবাদী নাস্তিক্যবাদী বা মানবতাবাদী হতে পারেন।

দেব-দেবীসমূহ

হিন্দুধর্মে দেবতা (পুংলিঙ্গ) ও দেবী (স্ত্রীলিঙ্গ) বলতে উপাস্য বোঝানো হয়।এই শব্দগুলির বুৎপত্তিগত অর্থ হল পবিত্র স্বর্গীয় বা অসাধারণ যেকোনো কিছু। ডগলাস হারপারের মতে দেব শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল "উজ্জ্বল যিনি" যেটি এসেছে দিব্য বা উজ্জ্বল শব্দ থেকে।

আদি বৈদিক ধারণায় সমস্ত অমানবীয়রাই অসুর। বৈদিক যুগের শেষের দিকে ভালো অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বদের দেবাসুর নামে অভিহিত করা হয়। বেদোত্তর যুগের শাস্ত্রে, যেমন পুরাণে ও ইতিহ-াসে দেবতারা সাধু ও অসুররা দুর্বৃত্ত। কিছু মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যে দেবতাদের সুর বলেও বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের মতই শক্তিশালী কিন্তু দুষ্ট অসুরদের কথা বলা হয়েছে। এই অসুররা দেবতাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

বৈদিক যুগের দেবতাদের বৈশিষ্ট্য

Vedic era deities evolved over time. Rudra (left) is represented in Vedic literature, is shown as Shiva-Rudra 2nd-century sculpture (middle), and as Shiva (meaning kind) in 13th-century art work (right). The iconography evolved, retaining some symbolic elements such as trident, axe or antelope.

বৈদিক সাহিত্যে দেব-দেবীরা প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক। কয়েকজন যেমন আদিত্যগণ, মিত্র নৈতিক গুণাবলীর সঙ্গে সম্পর্কীত। একেকজন একেকটি করে বিশেষ জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় শক্তি (সিদ্ধি)-র অধিকারী।

ঋগ্‌বেদে সবচেয়ে বেশি উল্লেখিত দেবতারা হলেন ইন্দ্র, অগ্নি, এবং সোম। অগ্নিদেবকে সমগ্র মানবজাতির মিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সোমাগ্নি যজ্ঞকালে উপাসিত দেবতাদ্বয়।অন্যান্য দেবতারা হলেন সাবিত্রী, বিষ্ণু, রুদ্র (পরবর্তীকালে শিবের সাথে সমার্থক) এবং প্রজাপতি (পরবর্তীতে ব্রহ্মা)।

বৈদিক দেবীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ঊষা, পৃথিবী, অদিতি, সরস্বতী, বাক, রাত্রি, অরণ্যানী ইত্যাদি ঋগ্‌বেদে বর্ণিত। শ্রী বা লক্ষীও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আছেন। বৈদিক যুগে সমস্ত দেব-দেবীরা পৃথক। কিন্তু পরবর্তী শাস্ত্রে (অঃ ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ২০০ খ্রীষ্টাব্দ), বিশেষ করে প্রথম দিকের মধ্যযুগীয় শাস্ত্রে তাঁরা এক নিরাকার পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ।

মধ্যযুগের দেবতাদের বৈশিষ্ট্য

হিন্দুশাস্ত্রের পুরাণ ও ইতিহাসে দেবতারা নায়ক এবং অসুরেরা খলনায়ক হিসাবে বর্ণিত। শ্রীমদ্ভাগবতগীতার মতে জীবজগতের সকল প্রাণীর মধ্যেই সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি ও আসুরিক প্রবৃত্তি বিদ্যমান।গী-তার ষোড়শ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ও সম্পূর্ণ

তামসিক এই দুই চরিত্রই বিরল। অধিকাংশ মানুষই আসলে বহু গুণাদোষের সন্নিবেশ। জিনি ফাউলারের মতে কামনা বাসনা লোভ আবেগকে গীতায় সাধারণ জীবনের অঙ্গ বলেই ধরা হয়েছে। কিন্তু যখন তারা কাম ক্রোধ হিংসা মাৎসর্য ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিতে বদলে যায় তখন সাধারণ মানবিক প্রবৃত্তিগুলির আসুরিকতায় উত্তরণ ঘটে।

বহু দেবতার একত্ব সম্পর্কে ধারণা

যজুর্বেদে তেত্রিশ কোটি জন দেবতার কথা বলা রয়েছে। তবে হিন্দুধর্মে কোনও নির্দিষ্টসংখ্যক দেবতার ধারণা নেই, বরং একই দেবতার একাধিক রূপ প্রচলিত। তবে সাধারণভাবে তেত্রিশ কোটি দেবতার একটা ধারণা বেশ জনপ্রিয়। ফাওলস্টোন ও এ্যাবট দেখিয়েছেন যে, এঁদের মধ্যে অধিকাংশ দেবী। তেত্রিশ কোটি দেবতার কোনও তালিকা অনুপস্থিত তবে সকল দেবতাকেই এক নিরাকার পরম ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ হিসাবে দেখা হয়।

ব্রহ্মের ধারণা আব্রাহামীয় গড এর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক নয়। ব্রড বলেন যে, আব্রাহামীয় ধর্মে গড "স্রষ্টা ও মানব অস্তিত্বের থেকে পৃথক"। কিন্তু হিন্দুমতে ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, মানুষ ও অন্যান্য জীবজগৎ আসলে একই সূত্রে গ্রথিত। ঈশ্বর আত্মারূপে সকলের মধ্যেই অবস্থান করেন। এই আত্মা শাশ্বত ও পরম সত্তা।

উদাহরণ :

হিন্দুধর্মের মুখ্য দেবতাদের নিয়ে পুরাণ অগমের মতো বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে। বিষ্ণু এবং তাঁর অবতারেরা বৈষ্ণব-সাহিত্যের মূল বিষয়। ঠিক তেমনই শৈব- সাহিত্যে মহাদেব এবং শাক্তদের ক্ষেত্রে দেবী মুখ্য। স্মার্তদের মতো কেউ কেউ পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন অংশ হিসাবে মুখ্য দেবতাদের উপাসনা করেছেন।

লরেন্স বলেছেন যে এই ধর্মশাখাগুলি শুধুমাত্র তাদের দেবতাকেই একমাত্র পরম সত্য বলে প্রচার করেনি। জুলিয়াস লিপনার দেখিয়েছেন যে, এই বহুবাদিতা, যেখানে অন্য শাখার মুখ্য দেবতাকেও যথেষ্ট সম্মান জানানো হয়, হিন্দুধর্মের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ত্রিমূর্তি ও ত্রিদেবী

ইৎধযসধ, ঠরংযহঁ ধহফ ঝযরাধ রিঃয ঃযবরৎ পড়হংড়ৎঃং.

ত্রিনাথের ধারণা হিন্দু সাহিত্যে বেশ কিছুটা পরের দিকেই এসেছে। আনুমানিক প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দ শতকে এর আত্মপ্রকাশ। ত্রিনাথের ধারণা এই যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতা সৃষ্টির তিন কর্মে নিয়োজিত থাকেন। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু তা পালন করেন ও মহেশ্বর সৃষ্টির বিনাশ সাধন করেন। তবে এই তিন জন হিন্দু সাহিত্যের একমাত্র ত্রিনাথ নন। ত্রিদেবী হিসাবে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গারও উল্লেখ আছে দেবী-মাহাত্ম্য গ্রন্থে। শাক্তরা কেউ কেউ আবার এও বিশ্বাস করে থাকেন যে, দেবীই হলেন পরম ব্রহ্ম এবং তাঁরই শক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-কে পরিচালিত করে। প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখিত অন্য ত্রিনাথরা হলেন সূর্য (স্রষ্টা), বায়ু (পালক) ও অগ্নি (প্রলয়কারী); প্রাণ (স্রষ্টা), খাদ্য (পালক) ও কাল (প্রলয়কারী)। জেন গোণ্ডা দেখান যে বিভিন্ন সময়ে তিন দেবতাদেরকে ত্রিস্তর না বানিয়েই একত্রিত করা হয়েছে, আবার কখনও তাদেরকে এক সচ্চিদান্দ পরম ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হিন্দু দেবতাদের অবতারের ধারণাটি বহু প্রাচীন। দেবতারা যখন মানবজন্ম ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন তাদের অবতার বলা হয়। অবতারের অর্থ দেবতাদের মানবরূপে পৃথিবীতে প্রকট হওয়া।

অবতারের ধারণাটি বৈষ্ণবধর্মে সবচেয়ে পরিপুষ্ট। পুরাণে বিষ্ণুর বহু অবতারের কথা বলা আছে। সমুদ্রমন্থনের সময় তিনি মোহিনী রূপ ধারণ করে দেবাসুরের বিবাদ মেটান। বিষ্ণুর দশাবতাররা হলেন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। ভগবতগীতায় বলা আছে যে, যখনই ভারতভূমিতে অধর্মের অভুত্থান ঘটবে, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অধর্মাচারীর বিনাশের উদ্দেশ্যে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং দেহধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

শাক্তধারাতেও দেবীর বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হবার কথা বলা আছে। দেবী মহামায়ার বিভিন্ন রূপ হল দুর্গাকালী ও জগদ্ধাত্রী। এদেঁরকে পূর্ব ভারতে বেশি করে পূজা করা হয়। তন্ত্রধর্মে এঁদের বিশেষ স্থান রয়েছে।শৈবসাহিত্যে শিবের একবিংশ অবতারের কথা বলা থাকলেও শৈবধারা অবতারদের চেয়ে স্বয়ং শিবকেই বেশি প্রাধান্য দেয়।

বিষ্ণু

বিষ্ণু হিন্দু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবতা। আদি শংকর প্রমুখ স্মার্ত পণ্ডিতদের মতে, বিষ্ণুঈশ্বরের পাঁচটি প্রধান রূপের অন্যতম। আবার তৈত্তিরীয় শাখা ও ভগবদ গীতা আদি শ্রুতিশাস্ত্রে বিষ্ণুকে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বিষ্ণু সহস্রনামে বিষ্ণুকে পরমাত্মা ও পরমেশ্বর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে তাঁকে সর্ব জীব ও সর্ববস্তুতে পরিব্যাপ্ত সত্ত্বা; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তথা অনাদি অনন্ত সময়ের প্রভু; সকল অস্তিত্বের স্রষ্টা ও ধ্বংসকারী; বিশ্বচরাচরের ধারক, পোষক ও শাসক এবং বিশ্বের সকল বস্তুর উৎসপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরাণ অনুসারে, বিষ্ণুর গাত্রবর্ণ ঘন মেঘের ন্যায় নীল (ঘনশ্যাম); তিনি চতুর্ভূজ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী। ভগবদ গীতা গ্রন্থে বিষ্ণুর বিশ্বরূপেরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

পুরাণে বিষ্ণুর দশাবতারেরও বর্ণনা রয়েছে। বিষ্ণুর এই দশ প্রধান অবতারের মধ্যে নয় জনের জন্ম অতীতে হয়েছে এবং এক জনের জন্ম ভবিষ্যতে কলিযুগের শেষ লগ্নে হবে বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন। বিষ্ণু সহস্র নামে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উক্তিতে বিষ্ণুকে "সহস্র কোটি যুগ ধারিনে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ, বিষ্ণুর অবতারগণ সকল যুগেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। ভগবদ্গীতা অনুসারে, ধর্মের পালন এবং দুষ্টের দমন ও পাপীর ত্রাণের জন্য বিষ্ণু অবতার গ্রহণ করেন। হিন্দুদের প্রায় সকল শাখাসম্প্রদায়ে, বিষ্ণুকে বিষ্ণু বা রাম, কৃষ্ণ প্রমুখ অবতারের রূপে পূজা করা হয়।

হিন্দু ধর্মের ত্রিমূর্তি ধারণায় ব্রহ্মাকে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টির প্রতীক, বিষ্ণুকে স্থিতির প্রতীক ও শিবকে ধ্বংসের প্রতীক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভাগবত পুরাণ মতে, ত্রিমূর্তির এই তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর পূজাই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে ভগবান বিষ্ণুই সর্বোচ্চো ঈশ্বর। ভগবান বিষ্ণু থেকেই ব্রহ্মা এবং শিবের উৎপত্তি।

শিব

শিব (অর্থাৎ 'মঙ্গলময় পুরুষ লিঙ্গ') হলেন হিন্দুধর্মের মূল স্তম্ভ ত্রিশক্তির (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) প্রধান। তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের অন্যতম শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। এছাড়া শিব স্মার্ত সম্প্রদায়ে পূজিত ঈশ্বরের পাঁচটি প্রধান রূপের (গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও দুর্গা) একটি রূপ। তিনি ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা।

সর্বোচ্চ স্তরে শিবকে অসীম, সর্বোৎকর্ষ, অপরিবর্তনশীল ও নিরাকার মনে করা হয়। শিবের অনেকগুলি সদাশয় ও ভয়ঙ্কর মূর্তিও আছে। সদাশয় রূপে তিনি একজন সর্বজ্ঞ যোগী। তিনি কৈলাস পর্বতে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। আবার গৃহস্থ রূপে তিনি পার্বতীর স্বামী। তাঁর দুই পুত্র। এঁরা হলেন গণেশ ও কার্তিক। ভয়ঙ্কর রূপে তাঁকে প্রায়শই দৈত্যবিনাশী বলে বর্ণনা করা হয়। শিবকে যোগ, ধ্যান ও শিল্পকলার দেবতাও মনে করা হয়।

শিবমূর্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল তাঁর তৃতীয় নয়ন, গলায় বাসুকী নাগ, জটায় অর্ধচন্দ্র, জটার উপর থেকে প্রবাহিত গঙ্গা, অস্ত্র ত্রিশূল ও বাদ্য ডমরু। শিবকে সাধারণত 'শিবলিঙ্গ' নামক বিমূর্ত প্রতীকে পূজা করা হয়। সমগ্র হিন্দু সমাজে শিবপূজা প্রচলিত আছে। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কিছু অংশে শিবপূজ-ার ব্যাপক প্রচলন লক্ষিত হয়।

সংস্কৃত শিব শব্দটি একটি বিশেষণ, যার অর্থ "শুভ, দয়ালু ও মহৎ"। ব্যক্তিনাম হিসেবে এই শব্দটির অর্থ "মঙ্গলময়"। রূঢ় রুদ্র শব্দটির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কোমল নাম হিসেবে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বিশেষণ হিসেবে শিব শব্দটি কেবলমাত্র রুদ্রেরই নয়, অন্যান্য বৈদিক দেবদেবীদের অভিধা রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সংস্কৃত শৈব শব্দটির অর্থ "শিব সংক্রান্ত"। এই শব্দটি হিন্দুধর্মের একটি অন্যতম প্রধান শাখাসম্প্রদায় ও সেই সম্প্রদায়ের মতাবলম্বীদের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শৈবধর্মের কয়েকটি প্রথা ও ধর্মবিশ্বাসের বিশেষণ রূপেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শৈবধর্মে শিব শব্দটির একাধিক অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন: "পবিত্র ব্যক্তি", "প্রকৃতির তিন গুণের (সত্ত্ব, রজ ও তম) অতীত যিনি", অথবা "যাঁর নাম উচ্চারণ মাত্রেই মানুষ পাপমুক্ত হয়"। স্বামী চিন্ময়ানন্দ তাঁর বিষ্ণু সহস্রনাম অনুবাদে স্তবটির ব্যাখ্যা আরও প্রসারিত করে বলেছেন: শিব শব্দের অর্থ যিনি চিরপবিত্র বা যিনি রজ বা তমের দোষ কর্তৃক স্পর্শিত হন না।

শিবের নাম সম্বলিত শিব সহস্রনাম স্তোত্রের অন্তত পাঠান্তর পাওয়া যায়। মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্ব অনুশাসনপর্ব-এর অন্তর্গত পাঠটি এই ধারার মূলরচনা বলে বিবেচিত হয়। মহান্যাসে শিবের একটি দশ সহস্রনাম স্তোত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। শতরুদ্রীয় নামে পরিচিত শ্রীরুদ্রম্ চমকম্ স্তোত্রেও শিবকে নানা নামে বন্দনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধারণা একক মূর্তিতে একীভূত হয়ে শিবের আধুনিক রূপটি দান করেছে। তবে শিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে একক দেবতায় সম্মিলিত হয়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। অ্যাক্সেল মাইকেলস শৈবধর্মের এই সম্মিলিত জটিল প্রকৃতিটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন:

বিষ্ণুর মতো, শিবও একজন উচ্চস্থানীয় দেবতা। তাঁর নামানুসারে "শৈবধর্ম" নামক ধর্মীয় মত ও সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের মতোই এই শব্দটির দ্বারাও এমন এক ঐক্যমতকে বোঝায় যা ধর্মানুশীলন বা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মতবাদের মধ্যে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। তাছাড়া ধর্মানুশীলন ও মতবাদকে পৃথক রাখাই কর্তব্য।

এই ধরনের সম্মিলনের একটি উদাহরণের দেখা মেলে মহারাষ্ট্রে। সেখানে কৃষি ও পশুপালনের দেবতা ছিলেন খাণ্ডোবা নামে এক স্থানীয় দেবতা। মহারাষ্ট্রে খাণ্ডোবার প্রধান উপাসনাকেন্দ্র ছিল জেজুরি। খাণ্ডোবার রূপকল্পটি ঠিক শিবের মতো এবং তাঁকে পূজাও করা হয় লিঙ্গের আকারে। অবশ্য সূর্য ও কার্তিকেয়ের সঙ্গেও খাণ্ডোবার রূপগত মিল লক্ষ্য করা যায়।

পশুপতি সিলমোহর

মহেঞ্জোদাড়োয় খননকার্য চালানোর সময় একটি সিলমোহর আবিষ্কৃত হয়, যাতে খোদিত চিত্রটি "আদি-শিব"-এর ("ঢ়ৎড়ঃড়-ঝযরাধ") একটি সম্ভাব্য প্রতিকৃতিরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপবিষ্ট, সম্ভবত ইথিফেলিক, জন্তুজানোয়ার বেষ্টিত এই মূর্তিটিকে পশুপতি নামে অভিহিত করা হয়। স্যার জন মার্শাল এবং অন্যান্যরা এই ছবিতে হাঁটু মুড়ে বসা "যোগ ভঙ্গিমা" দেখে এটিকে শিবের আদিরূপ বলে দাবি করেন।

আধুনিক শিবের সঙ্গে বৈদিক দেবতা রুদ্রের নানা মিল লক্ষিত হয়। হিন্দুসমাজে রুদ্র ও শিবকে একই ব্যক্তি মনে করা হয়।

রুদ্র ছিলেন বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের দেবতা; তাঁকে একজন ভয়ানক, ধ্বংসকারী দেবতা হিসেবে কল্পনা করা হত।

হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হল ঋগ্বেদ। ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায় যে ১৭০০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই গ্রন্থের রচনা। ঋগ্বেদে রুদ্র নামে এক দেবতার উল্লেখ রয়েছে। রুদ্র নামটি আজও শিবের অপর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঋগ্বেদে (২। ৩৩) তাঁকে "মরুৎগণের পিতা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে; মরুৎগণ হলেন ঝঞ্ঝার দেবতাদের একটি গোষ্ঠী। এছাড়াও ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে প্রাপ্ত রুদ্রম্ স্তোত্রটিতে রুদ্রকে নানা ক্ষেত্রে শিব নামে বন্দনা করা হয়েছে; এই স্তোত্রটি হিন্দুদের নিকট একটি অতি পবিত্র স্তোত্র। তবে শিব শব্দটি ইন্দ্র, মিত্র ও অগ্নির বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহৃত হত।

রুদ্রকে "শর্ব" (ধনুর্ধর) নামেও অভিহিত করা হয়। রুদ্রের একটি প্রধান অস্ত্র হল ধনুর্বাণ। নামটি শিব সহস্রনাম স্তোত্রেও পাওয়া যায়। আর. কে. শর্মা মনে করেন, পরবর্তীকালের ভাষাগুলিতেও এই নামটি শিবের অপর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির বুৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ শর্বথেকে, যার অর্থ আঘাত করা বা হত্যা করা। আর. কে. শর্মার ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই শব্দটির অর্থ "যিনি অন্ধকারের শক্তিসমূহকে হত্যা করতে সক্ষম"। শিবের অপর দুই নাম ধন্বী ("ধনুর্ধারী") ও বাণহস্ত ("ধনুর্বিদ", আক্ষরিক হস্তে "বাণধারী") ধনুর্বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

অন্যান্য বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক

হিন্দু দেবমণ্ডলীর একজন প্রধান দেবতারূপে শিবের উত্থানের পশ্চাতে কার্যকরী ছিল অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বায়ু প্রমুখ বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক।

অগ্নি

রুদ্রের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বৈদিক সাহিত্যে অগ্নি ও রুদ্রের পারস্পরিক অঙ্গীভবন রুদ্রের রুদ্র-শিব রূপে বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। নিরুক্তিনামক প্রাচীন ব্যুৎপত্তি তত্ত্ববিষয়ক একটি গ্রন্থে এই অঙ্গীভবনের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থে লেখা আছে, "অগ্নিকে রুদ্র নামেও অভিহিত করা হয়"। দুই দেবতার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল।

শতরুদ্রীয় স্তবে "সসিপঞ্জর" ("সোনালি লাল রঙের শিখার মতো আভাযুক্ত") ও "তিবষীমতি" ("জ্বলন্ত শিখা") বিশেষণদুটি রুদ্র ও অগ্নির সমরূপত্ব নির্দেশ করছে। অগ্নিকে ষাঁড়ের রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে, এবং শিবের বাহনও হল নন্দী নামে একটি ষাঁড়। ষাঁড়ের মতো অগ্নিরও শিং কল্পনা করা হয়ে থাকে। মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যে অগ্নি ও ভৈরব শিব -উভয়েরই বিশেষত্ব হল অগ্নিশিখার ন্যায় মুক্ত কেশরাশি।

ঋগ্বেদে একাধিক স্থলে শিব শব্দটি ইন্দ্রের অভিধা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে (২।২০।৩, ৬।৪৫।১৭, এবং ৮।৯৩।৩[৬৮]

শিব এর নানা রূপ সম্মর্কিত নানা তথ্য বেশ শ্রুত এবং আকর্ষণীয়।

শিব ও পার্বতী। শিব এখানে ত্রিনয়ন, মস্তকে অর্ধচন্দ্রধারী, সর্প ও নর করোটির মালা পরিহিত, সর্বাঙ্গে বিভূতি-মণ্ডিত এবং ত্রিশূল ও ডমরুধারী। তাঁর জটাজুট থেকে গঙ্গা প্রবাহিত।

তৃতীয় নয়ন: শিবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তাঁর তৃতীয় নয়ন। এই নয়ন দ্বারা শিব কামকে ভস্ম করেছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে শিবের যে নামটি পাওয়া যায় তার প্রকৃত অর্থ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ধ্রুপদি সংস্কৃতে অম্বক শব্দের অর্থ চক্ষু;মহাভারতে শিবকে ত্রিনয়ন রূপে কল্পনা করা হয়েছে; তাই উক্ত নামটির আক্ষরিক অর্থ করা হয়ে থাকে "তৃতীয় নয়নধারী"। যদিও বৈদিক সংস্কৃতে অম্বা বা অম্বিকা শব্দের অর্থ মা; এই প্রাচীন অর্থের ভিত্তিতে নামটির আক্ষরিক অর্থ করা হয়, তিন জননীর সন্তান।

অর্ধচন্দ্র: শিবের মস্তকে একটি অর্ধচন্দ্র বিরাজ করে। এই কারণে শিবের অপর নাম চন্দ্রশেখর। রুদ্রের রুদ্র-শিব রূপে বিবর্তনের প্রথম যুগ থেকেই এই অর্ধচন্দ্র শিবের একটি বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত বৈদিক ও পরবর্তীকালের সাহিত্যে চন্দ্রদেবতা সোম ও রুদ্রের একীভবনের সূত্রেই শিবের এই বৈশিষ্ট্যটির উদ্ভব ঘটেছিল।

বিভূতি: শিব তাঁর সর্বাঙ্গে বিভূতি বা ভস্ম মাখেন। ভৈরব ইত্যাদি শিবের কয়েকটি রূপ প্রাচীন ভারতীয় শ্মশান বৈরাগ্য দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন কয়েকটি গোষ্ঠী এই মত অনুযায়ী ধর্মসাধনা করেন। থেরবাথ বৌদ্ধধর্মের পালি ধর্মগ্রন্থেও এই শ্মশান সাধনার উল্লেখ রয়েছে। এই কারণে শিবের অপর নাম শ্মশানবাসী ও বিভূতিভূষণ

জটাজুট: শিবের মস্তকের কেশরাশি জটাবদ্ধ। এই কারণে শিবের অপর নাম জটী বা কপর্দী ("কপর্দ বা কড়ির ন্যায় কেশযুক্ত")।

নীলকণ্ঠ: একবার দেবতা আর অসুরদের মধ্যে যুদ্ধে অমৃত পানের জন্যে দেবতারা সমুদ্রমন্থন করছিলেন। মন্থনকালের এক পর্যায়ে সমুদ্র থেকে হলাহল বিষ উত্থিত হলে তার বিষাক্ত নির্যাষে দেবতারা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন দেবতাদের রক্ষা করার জন্য ভগবান শিব সেই বিষাক্ত বিষ পান করেন। এর ফলে উনার কণ্ঠ নীল হয়ে যায়।

একারনেই ভগবান শিব নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হন।
পবিত্র গঙ্গা: হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, গঙ্গা নদীর উৎস শিবের জটা। এই কারণে শিবের অপর নাম গঙ্গাধর।
ব্যাঘ্রচর্ম: শিবের পরিধেয় বস্ত্র ব্যাঘ্রচর্ম বা বাঘছাল। এই কারণে শিবের অপর নাম কৃত্তিবাস। শিব ব্যাঘ্রচর্মের আসনের উপর উপবিষ্টও থাকেন। উল্লেখ্য, ব্যাঘ্রচর্মের আসন ছিল প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মর্ষিদের জন্য রক্ষিত একটি বিশেষ সম্মান।
সর্প: শিবের গলায় একটি সাপ সর্বদা শোভা পায়।
ত্রিশূল: শিবের অস্ত্র হল ত্রিশূল।
ডমরু: শিবের হাতে ডমরু নামে একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র শোভা পায়। নটরাজ নামে পরিচিত শিবে নৃত্যরত মূর্তির এটি একটি বিশিষ্ট দিক। ডমরুধারণের জন্য নির্দিষ্ট একটি মুদ্রা বা হস্তভঙ্গিমা ডমরুহস্ত নামে পরিচিত। ডমরু কাপালিক সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
নন্দী: নন্দী নামে একটি পৌরাণিক ষাঁড় শিবের বাহন। শিবকে পশুদের দেবতা মনে করা হয়। তাই তাঁর অপর নাম পশুপতি।
গণ: শিবের অনুচরদের গণ বলা হয়। এঁদের নিবাসও কৈলাস। এঁদের ভৌতিক প্রকৃতি অনুসারে ভূতগণ নামেও অভিহিত করা হয়। এঁরা সাধারণত দয়ালু। কেবল কোনো কারণে তাঁদের প্রভু ক্রুদ্ধ হলে এঁরা প্রভুর সঙ্গে ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠেন। শিব স্বীয় পুত্র গণেশকে তাঁদের নেতা মনোনীত করেন। এই কারণেই গণেশ গণপতি নামে অভিহিত হন।
কৈলাস: হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, শিবের অধিষ্ঠান হিমালয়ের কৈলাস পর্বতে। হিন্দুপুরাণ অনুসারে, লিঙ্গাকার কৈলাস পর্বত মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।
বারাণসী: বারাণসী শিবের প্রিয় নগরী। এই নগরী হিন্দুদের পবিত্রতম তীর্থগুলির অন্যতম। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এই নগরী কাশীধাম নামে পরিচিত।

বিভিন্ন গ্রন্থে শিবের ধ্বংসাত্মক ও মঙ্গলময় পরিচয় মিলে

যজুর্বেদে শিবের দুটি পরস্পরবিরোধী সত্ত্বার উল্লেখ রয়েছে। এখানে একদিকে তিনি যেমন ক্রূর ও ভয়ংকর (রুদ্র); অন্যদিকে তেমনই দয়ালু ও মঙ্গলময় (শিব)। এই কারণে চক্রবর্তী মনে করেন, "যে সকল মৌলিক উপাদান পরবর্তীকালে জটিল রুদ্র-শিব সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছিল, তার সবই এই গ্রন্থে নিহিত রয়েছে।" মহাভারতেও শিব একাধারে "দুর্জেয়তা, বিশালতা ও ভয়ংকরের প্রতীক" এবং সম্মান, আনন্দ ও মহত্ত্বের দ্বারা ভূষিত। শিবের নানা নামের মধ্যে তাঁর এই ভয়াল ও মঙ্গলময় সত্ত্বার বিরোধের উল্লেখ রয়েছে।
রুদ্র নামটি শিবের ভয়ংকর সত্ত্বার পরিচায়ক। মহাভারতের অনুশাসনপর্বের অন্তর্গত শিব সহস্রনাম স্তোত্রে শিবের হর নামটির উল্লেখ করা হয়েছে তিন বার। এটি শিবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম। অনুশাসন পর্বে তিন বারই এই নামের উল্লেখ করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অর্থে। আর. কে. শর্মা এই তিনটি উল্লেখে হর নামটির অর্থ করেছেন "যিনি বন্দী করেন", "যিনি এক করেন" এবং "যিনি ধ্বংস করেন"। শিবের অপর দুই ভয়ংকর রূপ হল "কাল" ও "মহাকাল"। এই দুই রূপে শিব সকল সৃষ্টি ধ্বংস করেন। ধ্বংসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিবের অপর একটি রূপ হল ভৈরব। "ভৈরব" শব্দটির অর্থও হল "ভয়ানক"।
অপরপক্ষে শিবের শংকর নামটির অর্থ "মঙ্গলকারক" বা "আনন্দদায়ক"। এই নামটি শিবের দয়ালু রূপের পরিচায়ক। বৈদান্তিক দার্শনিক আদি শংকর (৭৮৮-৮২০ খ্রি.) এই সন্ন্যাস জীবনের নাম হিসেবে নামটি গ্রহণ করে শংকরাচার্য নামে পরিচিতি লাভ করেন। একই ভাবে শম্ভু নামটির অর্থও "আনন্দদায়ক"। এই নামটিও শিবের দয়ালু রূপের পরিচায়ক।

যোগী ও গৃহী সত্ত্বা

সপরিবরে শিব; শিবের সঙ্গে পত্নী পার্বতী এবং পুত্র গণেশ ও কার্তিক।
শিবকে একাধারে যোগী ও গৃহী রূপে কল্পনা করা হয়। যোগী শিবের

মূর্তি ধ্যানরত। যোগশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে মহাযোগী নামে অভিহিত করা হয়। বৈদিক ধর্মে যজ্ঞের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলেও, মহাকাব্যিক যুগে তপস্যা, যোগ ও কৃচ্ছ্রসাধন অধিকতর গুরুত্ব পেতে শুরু করে। যোগীবেশে শিব কল্পনার আবির্ভাব তাই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে ঘটেছিল।

গৃহী রূপে তিনি পার্বতীর স্বামী এবং গণেশ ও কার্তিক নামে দুই পুত্রের জনক। পার্বতী বা উমা তাঁর স্ত্রী বলে তাঁকে উমাপতি, উমাকান্ত ও উমাধর নামেও অভিহিত করা হয়। শিবের স্ত্রী পার্বতীই বিশ্বজননী বা মহাশক্তি। গৃহী রূপে শিব আপন পত্নীকে ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন।

শিব ও পার্বতীর দুই পুত্র - কার্তিক ও গণেশ। দক্ষিণ ভারতে সুব্রহ্মণ্যন, ষন্মুখন, স্বামীনাথন ও মুরুগান নামে কার্তিকের পূজা বহুল প্রচলিত; উত্তর ভারতে তিনি স্কন্দ, কুমার ও কার্তিকেয় নামেই সর্বাধিক পরিচিত। শিবের স্ত্রীকে তাঁর শক্তির উৎস মনে করা হয়।

ব্রোঞ্জনির্মিত চোলযুগীয় নটরাজ শিবের মূর্তি

নটরাজ বেশে শিবের মূর্তি অত্যন্ত জনপ্রিয়। শিব সহস্রনামে শিবের নর্তক ও নিত্যনর্ত নামদুটি পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগ থেকেই নৃত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে শিবের যোগ বিদ্যমান। সারা ভারতে, বিশেষত তামিলনাড়ুতে, নটরাজের পাশাপাশি নৃত্যমূর্তি নামে শিবের নানান নৃত্যরত মূর্তি পাওয়া যায়। শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দুটি নৃত্যের নাম হল তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডব ধ্বংসাত্মক ও পুরুষালি নৃত্য; শিব কাল-মহাকাল বেশে বিশ্বধ্বংসের উদ্দেশ্যে এই নাচ নাচেন এবং মধুর ও সুচারু নৃত্যকলা; এই আবেগময় নৃত্যকে পার্বতীর নাচ রূপে কল্পনা করা হয়। লাস্যকে তাণ্ডবের নারীসুলভ বিকল্প মনে করা হয়। তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্য যথাক্রমে ধ্বংস ও সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

দক্ষিণামূর্তি শিবের একটি বিশিষ্ট রূপ। আক্ষরিকভাবে দক্ষিণামূর্তি কথাটির অর্থ দক্ষিণদিকে মুখ যাঁর। এই রূপে শিব যোগ, সঙ্গীত ও বিদ্যাচর্চার গুরু এবং শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা। প্রধানত তামিলনাড়ুতে শিবের এই মূর্তি প্রচলিত। দক্ষিণামূর্তি শিব মৃগসিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং জ্ঞানপিপাসু ঋষিগণ কর্তৃক পরিবৃত।

"মৃত্যুঞ্জয়" কথাটির আক্ষরিক অর্থ "যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন"। কথিত আছে, শিব মৃত্যুর দেবতা যমকে জয় করেছিলেন। একটি কিংবদন্তি অনুসারে, ঋষি মার্কণ্ডেয়ের ষোলো বছর বয়সে মৃত্যুযোগ ছিল। মার্কণ্ডেয় শিবের আরাধনা করেন। মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে, তিনি শিবের নিকট জীবন ভিক্ষা করেন। শিব যমকে পরাজিত করে মার্কণ্ডেয়কে জীবন দান করেন।

ত্রিপুরান্তক

একটি পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে, শিব ধনুর্ধর বেশে ত্রিপুর নামে অসুরদের তিনটি দুর্গ ধ্বংস করেন। এই কারণে শিবের অপর নাম ত্রিপুরান্তক।

শিবের এই নামটির একটি দার্শনিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন মানবদেহ তিন প্রকার - স্থুল শরীর বা বহিঃস্থ দেহ, সূক্ষ্ম শরীর বা মন এবং কারণ শরীর বা আত্মার চৈতন্যময় রূপ। এই তিন শরীরকে একত্রে ত্রিপুর বলা হয়। ত্রিপুরান্তক বেশে শিব মানব সত্ত্বার এই ত্রিমুখী অস্তিত্বের ধ্বংস ও বিলোপ ঘটিয়ে মানবকে পরমসত্ত্বার সঙ্গে লীন হতে সহায়তা করেন। এই বেশে তিনি মায়া ও অজ্ঞানকে ধ্বংস করে পরম চৈতন্যের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটান।

অষ্টমূর্তি

শিবের আটটি বিশেষ রূপকে একত্রে অষ্টমূর্তি বলে। এঁরা হলেন: ভব (অস্তিত্ব), শর্ভ (ধনুর্ধর), রুদ্র (যিনি দুঃখ ও যন্ত্রণা প্রদান করেন), পশুপতি (পশুপালক), উগ্র (ভয়ংকর), মহান বা মহাদেব (সর্বোচ্চ আত্মা), ভীম (মহাশক্তিধর) ও ঈশান (মহাবিশ্বের দিকপতি)।

শিবলিঙ্গ

নৃতত্ত্বারোপিত মূর্তি ব্যতিরেকেও শিবলিঙ্গ বা লিঙ্গ-এর আকারে শিবের পূজাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। শিবলিঙ্গ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময় এবং লিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রতীক; এই কারণে শিবলিঙ্গ শব্দটির অর্থ সর্বমঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার প্রতীক। শিব শব্দের অপর একটি অর্থ হল যাঁর মধ্যে প্রলয়ের পর বিশ্ব নিদ্রিত থাকে; এবং লিঙ্গ শব্দটির অর্থও একই- যেখানে বিশ্বধ্বংসের পর যেখানে সকল সৃষ্ট বস্তু বিলীন হয়ে যায়। যেহেতু হিন্দুধর্মের মতে, জগতের সৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংস একই ঈশ্বরের দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেই হেতু শিবলিঙ্গ স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতীক রূপে পরিগণিত হয়।

অথর্ববেদ সংহিতা গ্রন্থে যূপস্তম্ভ নামে একপ্রকার বলিদান স্তম্ভের স্তোত্রে প্রথম শিব-লিঙ্গ পূজার কথা জানা যায়। এই স্তোত্রের আদি ও অন্তহীন এক স্তম্ভ বা স্কম্ভ-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই স্কম্ভ-টি চিরন্তন ব্রহ্মের স্থলে স্থাপিত। যজ্ঞের আগুন, ধোঁয়া, ছাই, সোম লতা, এবং যজ্ঞকাষ্ঠবাহী ষাঁড়ের ধারণাটির থেকে শিবের উজ্জ্বল দেহ, তাঁর জটাজাল, নীলকণ্ঠ ও বাহন বৃষের একটি ধারণা পাওয়া যায়। তাই মনে করা হয়, উক্ত যূপস্তম্ভই কালক্রমে শিবলিঙ্গের রূপ ধারণ করেছে। লিঙ্গপুরাণ গ্রন্থে এই স্তোত্রটিই উপাখ্যানের আকারে বিবৃত হয়েছে। এই উপাখ্যানে কীর্তিত হয়েছে সেই মহাস্তম্ভ ও মহাদেব রূপে শিবের মাহাত্ম্য।

পঞ্চমন্ত্র

শিবের পবিত্র সংখ্যা হল পাঁচ। তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রগুলির একটি (নমঃ শিবায়) পাঁচটি অক্ষর দ্বারা গঠিত।

কথিত আছে, শিবের শরীর পাঁচটি মন্ত্র দ্বারা গঠিত। এগুলিকে বলা হয় পঞ্চব্রহ্মণ। দেবতা রূপে এই পাঁচটি মন্ত্রের নিজস্ব নাম ও মূর্তিতত্ত্ব বর্তমান:

* সদ্যোজাত
* বামদেব
* অঘোর
* তৎপুরুষ
* ঈশান

শাস্ত্রে এই পাঁচটি রূপ পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে এই পাঁচটি রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

অন্যদিকে পঞ্চব্রহ্মণ উপনিষদ মতে:

পার্থিব জগতের সকল বস্তুর পঞ্চমুখী চরিত্র বিদ্যমান। এর কারণ পঞ্চমুখী ব্রহ্মের চরিত্রবৈশিষ্ট্যরূপে শিবের চিরন্তন বৈচিত্র্য।

শিব লিঙ্গ পূজার তাৎপর্য কি? শিব পূজা দু'রকম ভাবেই হয়। মূর্তি এবং লিঙ্গ। পূর্বেই বলা হয়েছে লিঙ্গ শব্দে অনেক গুলো অর্থ আছে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক। সাকার রূপে এরূপ লিঙ্গ শরীর বা চিহ্ন আমরা সর্বত্রই ব্যবহার করি। একটি দেশের পরিচয় বহন করে একটি পতাকা। বিষ্ণুমন্ত্রের যারা অনুসারী তাদের পরিচয় তারা দেন দেহতে তিলক ফোঁটা অঙ্কিত করে। ঘটে আমরা দেবদেবীর পুত্তলী এঁকে দেবতার চিহ্ন বা প্রতীক বসাই। এরূপ দুটি প্রতীক বা লিঙ্গ বা চিহ্ন আমরা পূজায় ব্যবহার করি। একটি শিব লিঙ্গ আরেকটি নারায়ণ শিলা। শিব লিঙ্গের গঠন প্রণালী সহজ হওয়ায় মূর্তি তৈরী থেকে লিঙ্গ পূজায় আমরা আগ্রহী বেশি। মাটি দিয়ে অতি সহজে অল্প সময়ে এ প্রতীক তৈরী করা যায় এবং পূজান্তে বিসর্জনও দেয়া যায়। কিন্তু প্রতীকটির নাম লিঙ্গ দেয়াতে আমাদের মধ্যে এ নিয়ে নীল সাহিত্য গড়ে উঠেছে যা সত্যিই দু:খজনক। অথচ একই প্রতীক ব্যবহৃত হচ্ছে নারায়ণ পূজায়, তাঁকে নিয়ে এরূপ আচারণ আমরা করি না। বিশেষ করে শিব-এর সঙ্গে সৃষ্টির কার্যক্রম যুক্ত থাকাতে আমরা লিঙ্গ শব্দটিকে একেবারে পার্থিব কাজের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি। এ বিভ্রান্তি থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে এবং আমাদের শিবত্বে উন্নীত হতে হবে।

বৈদিক যুগে বিষ্ণু ও রুদ্ররূপী শিব ছিলেন অপেক্ষাকৃত অপ্রধান দেবতা। তবে ব্রাহ্মণ (১০০০-৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) রচনার সময় থেকেই

তাঁদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পৌরাণিক যুগে দুই দেবতাকে কেন্দ্র করেই পৃথক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এই সম্প্রদায়গুলি ভক্ত টানবার লক্ষ্যে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলত এই দুই প্রধান দেবতার পারস্পরিক সম্পর্কটি বর্ণনা করার জন্য রচিত হয় একাধিক ভিন্নধর্মী কাহিনি।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ দেবতাকে সর্বোচ্চ দেবতা রূপে উপস্থাপিত করে। এইভাবে বিষ্ণুকেন্দ্রিক পৌরাণিক সাহিত্যে বিষ্ণু শিবে "পরিণত হন"। বিষ্ণুপুরাণ (খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) গ্রন্থের উপাখ্যান অনুসারে, বিষ্ণু জাগরিত হয়ে বিশ্ব সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা এবং তা ধ্বংসের জন্য শিবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ভাগবত পুরাণ অনুসারে, শিব বিষ্ণুরই একটি রূপ মাত্র। অন্যদিকে শিবকেন্দ্রিক পৌরাণিক সাহিত্যে দেখা যায়, শিব একাই এবং স্বাধীনভাবেই বিশ্ব সৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংস করছেন। শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি শৈব পুরাণে আছে, জ্যোতির্লিঙ্গরূপী শিবের দেহ থেকেই বিষ্ণু ও ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছিল। শৈব শতরুদ্রীয় স্তোত্রে শিবকে "বিষ্ণুরূপী"-ও বলা হয়েছে। শরভের উপাখ্যানে দুই দেবতার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মতবাদের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়। উক্ত কাহিনিতে শিব একাধারে মানুষ, পাখি ও পশুর রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু বধের জন্য নৃসিংহ রূপে অবতার গ্রহণের জন্য বিষ্ণুকে ভর্ৎসনা করার লক্ষ্যেই শিব উক্ত রূপে অবতীর্ণ হন। যদিও বৈষ্ণব ও বিজয়ীন্দ্র তীর্থ (১৫৩৯-৯৫) প্রমুখ দ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা তাঁদের সাত্ত্বিক পুরাণ ও শ্রুতি পাঠের ভিত্তিতে নৃসিংহ অবতার সম্পর্কে মতবিরোধ পোষণ করতেন।

বিভিন্ন সমন্বয়বাদী গোষ্ঠী অবশ্য দুই দেবতার পারস্পরিক মধুর ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের কথাই বলে থাকেন। এই সকল গোষ্ঠীর মতবাদে হরিহর নামে এক দেবতার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। ইনি বিষ্ণু (হরি) ও শিব (হর)-এর সম্মিলিত রূপ। এই রূপ হরিরুদ্র নামেও পরিচিত। মহাভারতে এই রূপের উল্লেখ রয়েছে। শিবের মহাবলেশ্বর নামটির উৎপত্তি আখ্যানটি হল এই জাতীয় সমন্বয়মূলক কাহিনির একটি উদাহরণ। এই আখ্যান অনুযায়ী, শিব রাবণকে বরস্বরূপ একটি শিবলিঙ্গ প্রদান করেছিলেন। শর্ত ছিল লিঙ্গটি রাবণকে সর্বদা বহন করতে হবে। একটি স্থানে এসে রাবণ মূত্রত্যাগ করার জন্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী বিষ্ণুভক্ত নারদকে লিঙ্গটি কিছুক্ষণের জন্য ধরতে বলেন। নারদ এটি মাটিতে রেখে অদৃশ্য হয়ে যান। রাবণ ফিরে এসে লিঙ্গটি স্থানান্তরে অসমর্থ হন এবং সেই থেকে লিঙ্গটি সেই স্থানেই থেকে যায়। কথিত আছে, এই স্থানটি হল অধুনা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দেওঘর। কর্ণাটকের গোকর্ণের কাহিনিটিও কতকটা একই প্রকার। এই আখ্যানে দেখা যায়, কৈলাস থেকে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন কালে রাবণ গণেশকে একটি শিবলিঙ্গ ধরতে দিয়ে স্নান করতে যান। কিন্তু গণেশ সেটি ভূমিতে স্থাপন করেন। এই কারণে লিঙ্গটির নাম হয় মহাবলেশ্বর।

অপর একটি কাহিনি অনুসারে, শিব বিষ্ণুর নারী অবতার মোহিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। উভয়ের মিলনের ফলে আয়াপ্পার জন্ম হয়। এই আয়াপ্পা শাস্তা বা আয়ানারের সমরূপীয়। একদল উদ্ধত ঋষিকে শিক্ষা দেবার সময়ও মোহিনী শিবের সেবা করেন।

শিবকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়ে থাকে। অন্য সকল দেবতার মত তারও ১০৮ নাম রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল - মহাদেব, শিব, নটরাজ, শম্ভু, পশুপতি, নীলকণ্ঠ, চিন্তামণি, মহেশ্বর, সতীপতি, ত্রিপুরারি, তীর্থরাজ, যোগীশ্বর ইত্যাদি।

হিন্দু মাত্রেই জানেন শিবের পুত্রের সংখ্যা দুই। কার্তিক বা ষড়ানন আর গণেশ বা গজানন। কিন্তু, 'শিবপুরাণ' জানাচ্ছে, শিবের মোট পুত্রসংখ্যা ৬। এই পুত্রেরা কেউই কিন্তু পার্বতীর সন্তান নন। শিবের বিভিন্ন লীলার সময়ে তাঁদের জন্ম হয়েছিল। কার্তিক-গণেশ ছাড়াও বাকি চার পুত্রের সন্ধান রইল এখানে।

* অয়প্প– অসুরদের হাত থেকে অমৃতকে বাঁচানোর জন্য বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করেন। সেই সময়ে শিব তাঁর সঙ্গে মিলিত হন এবং এই মিলনের ফলেই অয়প্পর জন্ম হয়। দক্ষিণ ভারেত অয়প্পকে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা বলেই মনে করা হয়। তাঁকে হরি ও হরের সম্মিলিত রূপ– বলে মনে করা হয়।

* অন্ধক– দানবরাজ হিরণ্যাক্ষ পুত্রহীন ছিলেন। তিনি পুত্রলাভের আশায় মহাদেবের তপস্যা করেন। শিব তাঁকে এক পুত্রসন্তান প্রদান করেন। জন্মান্ধ সেই পুত্রের নাম ছিল অন্ধক। পরে অন্ধক পার্বতীকে ধর্ষণ করতে চাইলে স্বয়ং শিবই তাঁকে হত্যা করেন।

* ভৌম– শিবের স্বেদবিন্দু ভূমিতে পড়েই ভৌমের জন্ম হয়েছিল। শিব তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। ভূমিদেবীই ভৌমকে পালন করেন। পরে শিব ভৌমের কথা জানতে পারেন এবং তাঁকে পুত্র হিসেবে স্বীকার করে নেন।

* খুজ– একবার গভীর ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় শিবের দেহ থেকে তীব্র জ্যোতি বিকীর্ণ হতে থাকে। সেই জ্যোতি ভূমিতে প্রবিষ্ট হলে খুজের জন্ম হয়। তাঁকে লৌহের দেবতা বলে মনে করা হয়।

লোকবিশ্বাস অনুসারে, হিন্দুধর্মের অন্যান্য দেবদেবীদের মতো শিবেরও একাধিক অবতার বিদ্যমান। তবে পুরাণ শাস্ত্রে শিবের অবতারের উল্লেখ থাকলেও, এই অবতারতত্ত্ব শৈবধর্মে স্বীকৃত নয়।

* আদি শংকর, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান অদ্বৈত বেদান্ত প্রবক্তা। কোনো কোনো শাস্ত্রে তাঁকে শিবের অবতার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

* হনুমান চালিশা স্তোত্রে হনুমানকে শিবের একাদশ অবতার বলা হয়েছে, তবে এই মত সর্বজনস্বীকৃত নয়।

প্রতি বছর হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব উদযাপিত হয়। এই উৎসব হিন্দুদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই দিন ভক্তের শিবের মস্তকে ফল, ফুল ও বিল্বপত্র অর্পণ করে।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন বাংলায় শিবকেন্দ্রিক একটি বিশেষ উৎসব পালিত হয়। এটি চড়ক উৎসব নামে পরিচিত। এটি পৌরাণিক উৎসব নয়, লোকউৎসব। গাজন এই উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

Fly Australia - Japan - Korea
Get Free Transit Hotel at klia2
Use Express Bridge to Terminal Hotel
FREE
FOOD
High Speed WIFI
Double ROOM
Private LOUNGE
klia2 Terminal
Tune Hotel klia2
AirAsia
Air Asia | Lowest fares @ airasia.com Hotline: (Banani) 01984-555666 , 01984-666888 , 0195-5515451 (Motijheel) 0199-0222000

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত একটি মন্দির। ঢাকার নামকরণ হয়েছে "ঢাকার ঈশ্বরী" অর্থাৎ ঢাকা শহরের রক্ষাকর্ত্রী দেবী হতে। এই মন্দিরটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

ইতিহাস

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ধারণা করা হয় যে, সেন রাজবংশের রাজা বল্লাল সেন ১২শ শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সেই সময়কার নির্মাণ শৈলীর সাথে এর স্থাপত্যকলার মিল পাওয়া যায় না বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। বিভিন্ন সময়ে এই মন্দিরের গঠন ও স্থাপনার নানা ধরনের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় রাণী, রাজা বিজয় সেনের স্ত্রী স্নান করার জন্য লাঙ্গলবন্দ গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় তিনি একটি পুত্রকে জন্ম দেন, যিনি বল্লাল সেন বলে ইতিহাসবিদদের কাছে পরিচিত হন। সিংহাসনে উঠার পর, বল্লাল সেন তাঁর জন্মস্থানকে মহিমান্বিত করার জন্য এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। কিংবদন্তীগণ বলছেন যে, বল্লাল সেন একবার জঙ্গলে আচ্ছাদিত দেবতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বল্লাল সেন সেখানে দেবীকে আবিষ্কৃত করেন এবং একটি মন্দির নির্মাণ করান, মূর্তিটি ঢাকা ছিল বলে ঢাকেশ্বরী নামকরণ হয়। কিংবদন্তীগণ যা বর্ণনা করেন তা হিন্দু ধর্মীয়দেরকে ঢাকেশ্বরীকে ঢাকার প্রসিদ্ধ দেবী হিসেবে বিবেচনা করে, যা দেবী দুর্গা বা আদীপরামহাশক্তির একটি মূর্তি বা রূপ। দেবী ঢাকেশ্বরীর আসল ৮০০ বছর পুরোনো বিগ্রহটি কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে দুর্গাচারণ স্ট্রিট বর্তমানে বিরাজ করছে, মন্দিরের নাম শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মাতার মন্দির। এখন যে বিগ্রহটি ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আছে তা হলো ঢাকায় মূল মূর্তির প্রতিরূপ। দেশ ভাগের সময় কয়েক লক্ষ ভিটেমাটি হারা মানুষের সঙ্গের তিনিও ঢাকার থেকে কলকাতায় এলেন। দেশভাগ-পরবর্তী দাঙ্গার সময় সম্ভাব্য আক্রমণ এবং লুণ্ঠনের হাত থেকে দেবীকে রক্ষা করতে ঢাকার মূল বিগ্রহটিকে গোপনে এবং দ্রুততার সঙ্গে ১৯৪৮-এ কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন রাজেন্দ্রকিশোর তিওয়ারি (মতান্তরে প্রহ্লাদকিশোর তিওয়ারি) এবং হরিহর চক্রবর্তী। বিশেষ একটি বিমানে ঢাকেশ্বরী আসল বিগ্রহটি কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। কলকাতায় বিগ্রহটি আনার পর প্রথম দু'বছর হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিটে দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরির বাড়িতে দেবী পূজিতা হন। পরে ১৯৫০ নাগাদ ব্যাবসায়ী দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী কুমোরটুলি অঞ্চলে দেবীর মন্দির নির্মাণ করে দেন ও প্রতিষ্ঠা করে দেবীর নিত্য সেবার জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছিলেন এবং অদ্যাবধি এখানেই দেবী পূজিতা হয়ে চলেছেন। দেবী বিগ্রহের উচ্চতা দেড় ফুটের মতো, দেবীর দশ হাত, কাত্যানী মহিষাসুরমর্দিনী দূর্গা রূপেই তিনি অবস্থান করছেন। পাশে লক্ষী, সরস্বতী ও নিচে কার্তিক ও গণেশ। বাহন রূপে পশুরাজ সিংহ দন্ডায়মান যার ওপর দাঁড়িয়ে দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছেন। মানসিংহ নাকি এই বিগ্রহ ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করে আজমগড়ের এক তিওয়ারি পরিবারকে সেবায়াত নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে সেই পরিবারের বংশধরেরাই কলকাতায় এসে পুনরায় সেবায়েত নিযুক্ত হন, এখনো তারাই দেবীর নিত্য সেবা করেন। এই ঢাকেশ্বরী দেবীর পূজা পদ্ধতিও বাংলার চিরপুরাতন পদ্ধতির চেয়ে আলাদা। মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত শক্তি প্রসাদ ঘোষাল জানালেন, শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় দেবীর পূজা হয় উত্তর ভারতের নবরাত্রিক বিধি মেনে। দেশভাগের বেদনাময় পরিণামের কারণেই তাঁর এখানে আসা এবং মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। দেবীকে যেভাবে অলংকারহীন এবং প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় লুকিয়ে আনা হয়েছিল, তার ছবিও এই মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। তাই ঢাকার মত কলকাতার ঢাকেশ্বরী মন্দিরটিরও ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছু কম নয়। অথচ মন্দির গৃহটির আজ জরাজীর্ণ দশা। অপরিসর রাস্তা, ঝোপঝাড় ঘেরা। সংস্কারের অভাবে হতশ্রী এই মন্দিরেই দেবীর অনিন্দ্যসুন্দর আদি বিগ্রহটির নিত্যপূজা হয়। সেবাইত এবং পূজারি খেদের সঙ্গে কলকাতাবাসীর উদাসীনতা এবং সরকারি সাহায্যের অভাবের কথা জানালেন। মন্দিরের দৈনন্দিন কাজে আর্থিক অপ্রতুলতার কথাও বললেন বিষন্ন মনে। আজও আসেন পূর্ববঙ্গের বহু ভক্ত হয়তো ফেলে আসা ভিটেমাটির ছোয়া পেতে। দেবীর মন্দিরটি মাতা সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে থেকে কিছুটা এগিয়ে যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন সেই দেখিয়ে দেবে। বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত ঢাকেশ্বরী মন্দির জাতীয় মন্দিরের তকমা পেয়েছে। এ দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের নানাবিধ কাজকর্ম ওই মন্দিরকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক এবং অন্যান্য নানা ক্ষেত্রের গণ্যমান্য মানুষের ভিড় লেগেই থাকে শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে। বহু ঘাত প্রতিঘাত, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের ইতিহাস বুকে নিয়ে সেই মন্দির

আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রচারের আলোয় ঢাকা পড়ে গেছে কলকাতার ঢাকেশ্বরী মাতার মন্দির। শোভাবাজার ছাড়িয়ে কুমোরটুলির এক অপরিসর গলিতে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে নীরবে নিভৃতে বিরাজমান এই মন্দিরখানি। অথচ ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের আদি বিগ্রহ কিন্তু এখানেই প্রতিষ্ঠিত। কলকাতার এই ঢাকেশ্বরী মাতার মন্দিরটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বিচার করে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে মন্দির সংস্কারের কাজে দ্রুত হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। নয়তো অচিরেই দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে

ঢাকেশ্বরী মন্দির

অবস্থান ও স্থাপনাসমূহ

ঢাকেশ্বরী মন্দির ঢাকা শহরের পলাশী ব্যারাক এলাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সমূহের দক্ষিণে ঢাকেশ্বরী রোডে অবস্থিত। মূল মন্দির প্রাঙ্গনের বাইরে মহানগর পূজামণ্ডপ অবস্থিত। এখানে দুর্গা পূজার স্থায়ী বেদী রয়েছে। মূল মন্দির এলাকার ভবনগুলি উজ্জ্বল হলুদাভ ও লাল বর্ণের। মূল মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর পশ্চিম কোণে রয়েছে চারটি শিব মন্দির। মূল মন্দিরটি পূর্বাংশে অবস্থিত। এখানে দেবী দুর্গার একটি ধাতু-নির্মিত প্রতিমা রয়েছে।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ভিতরে শিব মন্দির

মন্দিরের বেহাত সম্পত্তি

ঢাকেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশের জাতীয় মন্দির হলেও বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক মন্দিরের মতই এটিরও স্থাবর সম্পত্তি বেহাত হয়েছে। মন্দিরের মোট ২০ বিঘা জমির মধ্যে ১৪ বিঘাই বেহাত হয়ে গিয়েছে। এই বেহাতের পেছনে রয়েছে দেশের সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন একটি গোষ্ঠী যাদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তাও রয়েছে। বিভিন্ন সময় এই বেহাত হওয়া জায়গা পুনরুদ্ধারের জন্য দাবী জানানো হলেও কোন সরকারই কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পরেই পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এবং একচেটিয়া সংখ্যালঘু হিন্দু নিষ্পেষণ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার জরুরি ভূমি গ্রহণ আইন পাশের মাধ্যমে এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে ১৯৬৯ সালে শত্রু সম্পত্তি আইন (বর্তমান নাম অর্পিত সম্পত্তি আইন) নামক কালা কানুন পাশ করে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জায়গা জমি দখলের রাস্তা প্রশস্ত হয়। এরপরে ১৯৭১ সালে এবং ১৯৯০ ও ১৯৯২ সালে বিভিন্ন সময়ে দফায় দফায় হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক নিষ্পেষণের কারণে মন্দিরের অনেক সেবায়েত এবং পুরোহিত দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। যার ফলশ্রুতিতে এক শ্রেণীর অসাধু সরকারি কর্মকর্তার যোগসাজশে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের জায়গা বেদখল হয়ে যায়।

নিউ এম. আর. টেইলার্স

প্রোঃ রনধীর বিশ্বাস

লেডিস এন্ড জেন্টস্
আউট কাটার এন্ড ফিটার্স

এখানে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ড্রেসের কাপড় বিক্রয় এবং অর্ডার নেওয়া হয়
সুলভ মূল্যে পোষাক তৈরি করা হয়।

৮৬ নং পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, ফোন: ০১৯৫৯৩৬০৮৭৬

আদিনাথ মন্দির

শান্তিলাল নন্দী

আদিনাথ মন্দিরের অট্টালিকার সদরের বহির্ভাগ, ২০১৩।

আদিনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার, ২০১৩।

আদিনাথ মন্দির বাংলাদেশের বিখ্যাত অন্যতম হিন্দু মন্দির। এটি বাংলাদেশের উপকূলীয় শহর কক্সবাজার থেকে ১২ কিমি দূরের দ্বীপ মহেশখালিতে অবস্থিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের নামানুসারে এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মন্দিরটি শিব মন্দির নামেও বহুল প্রচলিত।

শ্রী শ্রী আদিনাথ মন্দির ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

পূজো-অর্চনা

প্রতিদিনই নিয়ম মোতাবেক আদিনাথ, অষ্টাভূজা, ভৈরব ও রাধা গোবিন্দ এর মন্দিরে একই সময়ে পূজো-অর্চনা হয় থাকে। এছাড়া প্রতি বৎসর ফাল্গুনের শিব চতুর্দ্দশী তিথিতে পূজো-অর্চনা ও পক্ষকালব্যাপী মেলা হয়। এসময় পূণ্য সঞ্চয় ও মনস্কামনা পূরণার্থে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে আগত তীর্থ যাত্রীদের পদচারণায় মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে। মন্দিরে বিরল প্রজাতির একটি পারিজাত ফুলগাছ রয়েছে। ভক্তগণ প্রতিনিয়ত মনস্কামনা পূরণার্থে মানত করে গাছে সূতা বেঁধে রেখে যান এবং কামনা পূর্ণ হলে সূতা খুলে পূজা অর্পণ করেন। মূল মন্দিরের পেছনের দিকে দুটি পুকুর রয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে প্রায় ২৮০ ফুট উচ্চতায় পুকুর দুটির অবস্থান হলেও এর জল কখনই শুকায় না। জনশ্রুতি রয়েছে দুটি পুকুরের মধ্যে একটিতে স্নান করলে সকল রোগ দূর হয়।

শ্রীশ্রী আদিনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের নামানুসারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে কক্সবাজার জেলায় মহেশখালীর বঙ্গোপসাগরে ঘেষা মৈনাক পর্বতের সর্ব উঁচু চূড়ায় মনোরম পরিবেশে আদিনাথ শিব, তীর্থ মন্দিরটির অবস্থান। আদিনাথের অপর নাম মহেশ। এই মহেশের নাম অনুসারে মহেশখালী। আদিনাথের গোড়াপত্তন কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে ত্রেতাযুগে, এর একটি ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে এবং তাহা পাওয়া যায় হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ, রামায়ণ, পুরান ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনায়। তিনি সর্ব গুণময় হইয়াও গুণাতীত অব্যক্ত ভগবান। ব্যক্ত চরাচরে শিবরূপি উর্ধরূপি শিবলিঙ্গ। সকলি নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া জ্ঞানময়, কল্যাণময়, মঙ্গলময় সর্বকুল্যষ বিনায়ক, সত্য শ্বাশত সনাতন।

সাগর পাড়ের পাহাড় ঘেষা নির্জন মনোমুগ্ধকর স্থানে শ্রীশ্রী আদিনাথের গোড়াপত্তন। প্রকাশ মন্দির নির্মাণ। তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত লাভের ইতিহাস ব্যাপক। তবে সংক্ষিপ্ত আকারে এই সব ইতিহাস এখানে আলোচিত হয়েছে। শ্রী শ্রী আদিনাথ হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহৎ তীর্থস্থান। যে কোন সনাতনী ব্যক্তি শ্রীশ্রী আদিনাথ দর্শন না করে অন্য তীর্থ কখনও সফলকাম হয় না। যেহেতু স্বয়ং মহাদেব একমাত্র এই স্থানেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং তীর্থের মোক্ষ্য লাভের এবং মনকামনা পূরণের জন্য শ্রীশ্রী আদিনাথ দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ত্রেতা যুগে রাম রাবণের যুদ্ধের কথা। রাবণ লংকা যুদ্ধে রামের সঙ্গে জয় লাভের জন্য উদগ্রীব। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে অমরত্ব বর প্রার্থনা করেন। এই সময়ে মহাদেব কৈলাসে ধ্যানমগ্ন। রাবণের আরাধণায় দেবাদিদেব সন্তুষ্টি হয়ে রাবণকে বর দিলেন।

তবে সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিলেন। শর্ত হল শিবরূপি ঊর্ধমুখী শিবলিঙ্গকে কৈলাস থেকে বহন করে লংকায় নিয়ে যেতে হবে, পথিমধ্যে কোথাও রাখা চলবে না। যদি পথিমধ্যে কোথাও রাখা হয় তাহা হইলে মহাদেব সেই স্থানেই অবস্থান নিবেন। রাবণ শর্তে মেনে নিলেন এবং মহাদেবকে কাঁধে করে নিয়ে রওয়ানা হলেন। যাত্রা পথে এই মৈনাক শিখরে রাখতে বাধ্য হন। ঐ সময় এই স্থানে রামায়ণ ব্রাহ্মণ রূপে আবির্ভূত হলেন। রাবণ এই ব্রাহ্মণকে স্বাক্ষী স্বরূপ দাঁড় করে এই পর্বতের পিছনে প্রকৃতির কাজ সারতে গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ রূপে নারায়ণ কালক্ষেপন না করার জন্য সময় বেঁধে দিলেন। রাবণ প্রকৃতির কাজ কয়েক ঘণ্টায় শেষ করতে পারিলেন না, ঐ জায়গাটি এখনও বিদ্যমান, যাহার নাম মুদিচড়া রূপে পরিচিত বহন করিতেছে মন্দিরের এক কিলোমিটার পিছনে। প্রকৃতির কাজ সেরে রাবণ এসে সেই ব্রাহ্মণ দেখতে পেলেন না। অবশেষে শিলারূপি মহাদেবকে কাঁধে উঠাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই উঠাইতে পারলেন না। শেষে ক্রোধান্বিত হয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও উঠাইতে পারলেন না। উঠানো চেষ্টার চিহ্ন হিসেবে এই পাথরের উপর একটি চাপ পড়ে। যাহা এখনও বিদ্যমান। শেষে দেববাণী হতে বলল রাবণ তোমার অমরত্ব লাভ ব্যর্থ হল, তুমি খালি হাতে লংকায় চলে যাও। মহাদেব এই মৈনাক শিখরেই অবস্থান নিবেন। রাবণ যেই লংকায় পৌঁছলেন তখন রামের সহিত ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরাজয় বরণ করলেন। এই দিকে শ্রীশ্রী আদিনাথের মৈনাকে অবস্থান নেওয়া এবং আবিষ্কার সম্পর্কে এক সুন্দর জনশ্রুতি আছে। জনশ্রুতি হলেও এলাকাবাসীদের মতে ঘটনাটি সত্য। এই সত্য আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। তা হল হিন্দু সম্প্রদায়ের এই তীর্থ স্থানটি আবিষ্কৃত হয় ও বিশেষ মর্যাদা পায়। এই মহেশখালীর একজন সচ্ছল মুসলিমের হাতে। তাঁর নাম নূর মোহাম্মদ সিকদার। তাঁর একটি গাভী হঠাৎ দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এই ব্যাপারে তিনি রাখাল ছেলের উপর সন্ধিহান হন এবং প্রতিদিন রাখাল ছেলেকে গালমন্দ দিতে থাকেন। মনিবের গালমন্দে অতিষ্ঠ হয়ে রাখাল ছেলেটি রাত্রি বেলায় গোয়াল ঘরের গাভীটিকে পাহারা দেওয়া আরম্ভ করলেন। কারণ কেউ দুধ চুরি করে কিনা। গভীর রাত্রে সে দেখতে পায় গাভীটি গোয়াল ঘর থেকে বের হয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। এই দিকে রাখাল বালকও গাভিটির পিছনে অনুসরণ করতে থাকে। গাভীটি সোজা চলে এসে ঐ কাল পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়ায় এবং আপনা আপনি ঐ পাথরের উপর দুধ পড়তে থাকে। যেই দুধ পড়া শেষ, সঙ্গে সঙ্গে গাভীটি পুনরায় ঐ নূর মোহাম্মদ সিকদারের গোয়াল ঘরে চলে গেলেন। এই অবস্থা রাখাল বালকটি স্বচক্ষ্যে দেখে তার মালিককে পূর্ণ ঘটনা খুলে বলে। কিন্তু গৃহকর্তা তেমন গুরুত্ব না দিয়ে গাভীটিকে বড় মহেশখালী নামক স্থানে সরিয়ে নিয়ে রাখলেন। এই সময় তিনি রাত্রিতে স্বপ্নে দেখেন যে, গাভীটিকে দূরে লোহার শিকলে বেঁধে রাখলেও ঐ স্থানে দুধ দেওয়া বন্ধ হবে না বরং গাভীটির আসা-যাওয়া কষ্ট হবে। তিনি আরও স্বপ্নে আদেশ পান ঐ স্থানে মন্দির বেঁধে দেওয়ার স্থানীয় হিন্দু জমিদারকে বলার জন্য। ইতিমধ্যে সেই রাখাল ছেলেটি ঐ কাল পাথরে একখানা ছোরা দিয়ে শান দিতে থাকায় তখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে তাহাকে উদ্ধার করা হলেও আর বাঁচানো যায় নি।

আবার এই নূর মোহাম্মদ সিকদারই শিবের শক্তি অষ্টভূজাকে সুদূর নেপাল থেকে এনে এই মৈনাক শিখরে অবস্থান করানোর আদেশ পান এবং নাগা সন্ন্যাসীর মাধ্যমে ১৬১২ সালে নেপাল ষ্টেইটের মন্দির থেকে চুরি করে নিয়ে আসার সময় ধরা পড়ে যায় ও জেল বন্দি হয়ে পড়েন। যেদিন রায় ঘোষণা হবে তার পূর্ব রাত্রিতে এই নাগা সন্ন্যাসী যোগমায়া বলে মহাদেবের সান্নিধ্যে কৃপা লাভ করেন এবং মহাদেব অভয় বাণী দেন। বিচারক তোমাকে যে প্রশ্নই করুক না কেন তুমি নির্ভয়ে তোমার মুখ দিয়ে যাহা বের হবে তাহাই বলিবে। পরের দিন হলও তাই। মহামান্য বিচারক নেপাল রাজাকে প্রশ্ন করে মুর্তির রং জানতে চান। রাজা উত্তরে উনার মুর্তির রং কষ্টি পাথরের বর্ণনা দেন, আবার ঐ নাগা সন্নাসী উত্তরে বলেন, আমার মুর্তির রং সাদা। এখন মহামান্য বিচারক প্রত্যেকের সম্মুখে উম্মোচন করে দেখেন প্রকৃত সাদা রং-ই মুর্তির আসল রং। তখনই নাগা সন্ন্যাসীর পক্ষে রায় ঘোষণা করা হয় এবং নেপালের রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রকৃত ঘটনা জানতে উদগ্রীব। তখন নাগা সন্ন্যাসী বিস্তারিত খুলে বলেন। এতে ঐ রাজাই এই মুর্তিটিকে যথাযথ মর্যাদার সহিত এই মৈনাক পর্বতে শ্রীশ্রী আদিনাথের পার্শ্বেই স্থাপিত করে এবং মূল মন্দির নির্মাণ করে যান। এখনও হিমালয়ের শাখা, পূরাকালে প্রাগ ইতিহাসপুর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, আরকান, ব্রক্ষ্মদেশ, মালদ্বীপ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এক সমসূত্রে গাঁথা ছিল। বর্তমান সময়ের নিম্নবঙ্গ ছিল সাগর গর্ভে, আর্য্যরা এই অঞ্চলকে পূর্ব সাগর বলত। অর্থাৎ মগদের পরই ছিল সমুদ্র। এমনকি বিন্দ পর্বত ও দক্ষিণ সাগর তীরবর্তী বলে উল্লেখ আছে। এই মৈনাকের অবস্থান লবণ সমুদ্রে, পূরাণ আদিতে উল্লেখ আছে। চট্টগ্রাম দক্ষিণ পশ্চিম দিকস্থ মহেশখালী দ্বীপ। এই দ্বীপেই মৈনাক, মৈনাক শীর্ষেই আদিনাথ শিবের অবস্থান।

তৎকালীন নবাব আলীবর্দী খাঁন দেওয়ান ব্রজ কিশোর লাল কানুনগোর প্রতিনিধি দেওয়ান কালিচরণের নয় বৎসরের কিশোর শরৎ চন্দ্র কে সঙ্গে নিয়ে এই দ্বীপে আসেন এবং দ্বীপটি ক্রয় করে নেন। পরে শরৎচন্দ্র ঐ নাগা সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীতে তাঁহার জমিদারীর সকল সম্পত্তি ১৮৭৬ সালে শ্রীশ্রী আদিনাথ মন্দিরের নামে দেবত্তর সম্পত্তি হিসেবে উইল করিয়া যাঁন। আদিনাথ দ্বৈত ব্যবস্থাপনা পুরী এ্যাক্ট অনুযায়ী মোহন্ত শাসনে ছিল। পরে মোহন্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিলে ১৯১১ইং এর ব্যবস্থাপনা সীতাকুন্ড স্রাইন কমিটির অধীনে চলিয়া যায়। যাহা এখনও বর্তমান।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশের হাজার হাজার তীর্থযাত্রী পূণ্য অর্জনের জন্য প্রতি নিয়ত যাতায়াত করে পূণ্য সঞ্চয় করে থাকেন। প্রত্যেক বৎসর ফাল্গুনের শিব চতুর্দ্দশী তিথিতেও লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী এসে পূণ্য সঞ্চয় করে যান। এই শিব চর্তুদ্দশী মেলা পক্ষ কাল ব্যাপী স্থাপিত্ব হয়ে থাকে। উপমহাদেশের সকল স্থান থেকে সকল সম্প্রদায়ের ভীড়ে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে মিলন মেলা ও তীর্থ ক্ষেত্র।

আবার অনেকেই প্রতিনিয়ত এসে মানস করে যান মানস কামনাপূর্ণ হওয়া এবং দুঃখ যন্ত্রণা লাঘবের জন্য। আরও দেখা যায় মন্দিরের বিভিন্ন গাছে সুতলী বেঁধে মানত করেন, আবার সফলতা লাভ করে পুনরায় এসে সুতলীর বাঁধন খুলে পূজা পার্বণ দিতেও দেখা যায়।

মহেশখালীতে কোন দুর্গা প্রতিমা বানানো হয় না। কারণ স্বয়ং অষ্টভূজা দুর্গা জাগ্রত আছেন। বর্তমান আয়তন প্রায় ১৫৫ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ৩,৪৮,৫০০ জন।

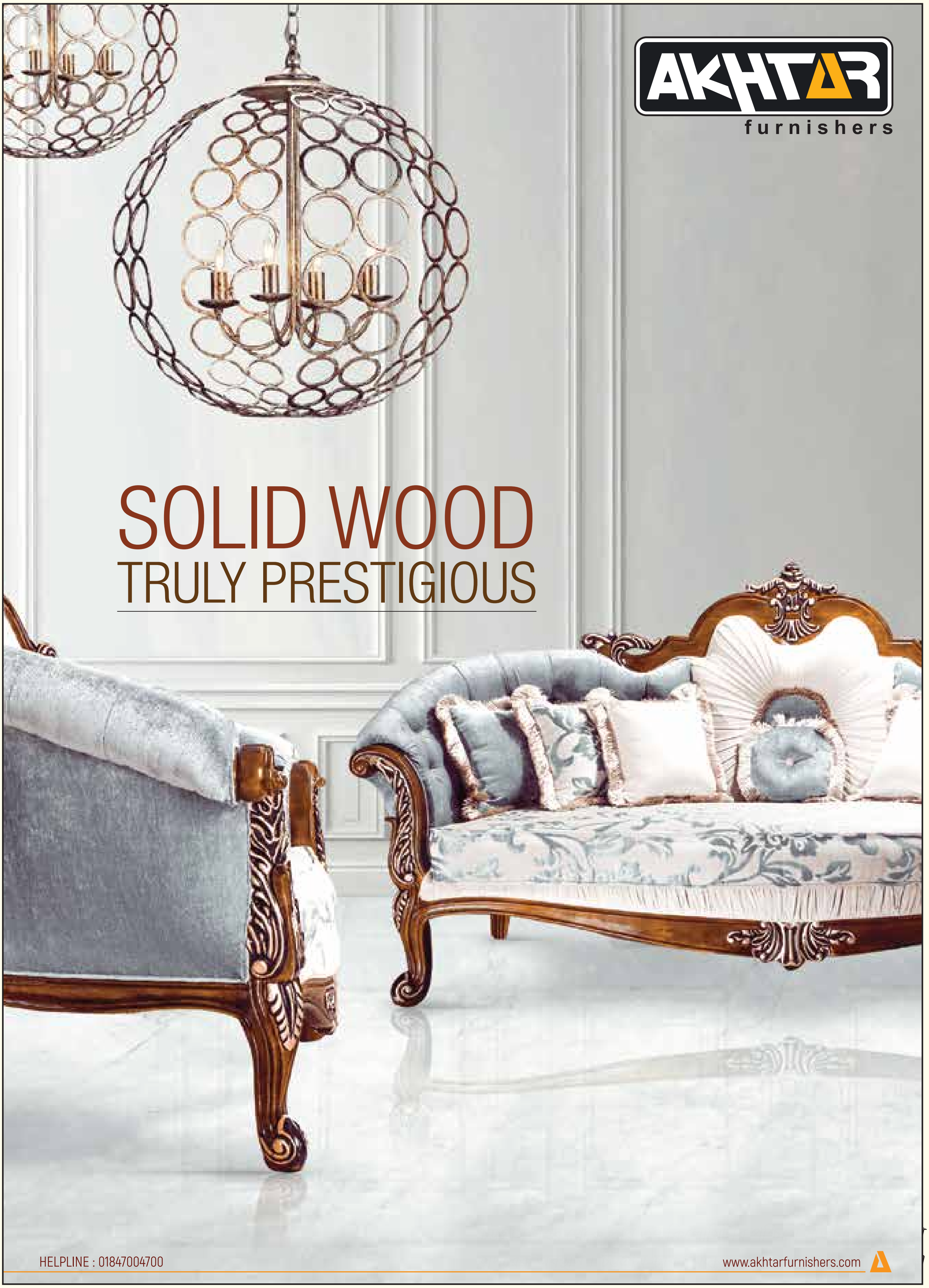
AKHTAR
furnishers
SOLID WOOD
TRULY PRESTIGIOUS
HELPLINE : 01847004700
www.akhtarfurnishers.com

সীতাকুন্ড মন্দির

শহরটি। সীতাকুণ্ডকে মন্দিরের জনপদ বলা হয়। একের পর এক মন্দির এ এলাকার মূল আকর্ষণ।

সীতাকুণ্ড বাজারের ভেতর থেকে সর্পিল আঁকাবাঁকা ছোট্ট একটি সড়ক চলে গেছে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের দিকে। এ পাহাড় বাজার থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে। এর সর্বোচ্চ চূড়াটির উচ্চতা প্রায় ৩৬৫ মিটার বা ১২০০ ফুট প্রায়। চূড়ায় ওঠার পথটি বেশ দুর্গম। বাজার ছেড়ে কিছুটা সামনে এগুলেই পথটি ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গেছে। এখানে চলতি পথে দেখা মিলবে শংকর মঠ, শ্মশান, গিরিশ ধর্মশালা, ননী গোপাল তীর্থ মন্দির, ভৈরব ধর্মশালা ইত্যাদি। আরও কিছুটা পথ ওঠার পরে দেখা যাবে ভবানী মন্দির। ভবানী মন্দির ছেড়ে আরেকটু পথ এগুলেই শয়ম্ভুনাথ মন্দির। এখান থেকে কিছুটা পথ হাঁটলেই রয়েছে ছোট্ট একটি পাহাড়ি ঝর্ণা। এখান থেকেই পাহাড়টির দুর্গমতার শুরু।

বাংলাদেশের সীতাকুন্ডের নিকটে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপরে অবস্থিত চন্দ্রনাথ মন্দির অন্যতম বিখ্যাত শক্তিপীঠ। সীতাকুণ্ড অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এ এলাকাকে হিন্দুদের বড় তীর্থস্থান বলাই ভালো। পুণ্যার্থীদের পাহাড়ে ওঠার জন্য এখান থেকে শান বাঁধানো সিঁড়ি তৈরি করা আছে। তবে পাহাড় কেটে বানানো সিঁড়িগুলোর একেকটি ধাপের উচ্চতা এতো বেশি যে, একটু উঠলেই হাঁপিয়ে যেতে হয়। বেশ কিছুটা পথ কষ্ট করে উঠলেই চোখে পড়বে প্রাচীন বট বৃক্ষের পাশে দুটি মন্দির। এর মধ্যে যেটি পুরানো মন্দির সেটির নাম বিরূপাক্ষ। এ জায়গাটির উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু'শো মিটার। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি সীমানা ছাড়িয়ে যায় বঙ্গোপসাগর অবধি। বিরূপাক্ষ মন্দির ছেড়ে পূর্ব দিকে সর্পিল পথ চলে গেছে পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় চন্দ্রনাথ মন্দিরে। এ মন্দিরই হলো শিব মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের সর্বশেষ গন্তব্য। এখানের সর্বোচ্চ পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত চন্দ্রনাথ মন্দির। আর অন্যান্য আরো রয়েছে বড়বাজার পূজা মন্ডপ, ক্রমধেশ্বরী কালী মন্দির, ভোলানন্দ গিরি সেবাশ্রম, কাছারী বাড়ী, শনি ঠাকুর বাড়ী, প্রেমতলা, শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রাহ্মচারী সেবাশ্রম, শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গিরিশ ধর্মশালা, দোল চত্বর, এন,জি,সাহা তীর্থযাত্রী নিবাস, তীর্থ গুরু মোহন্ত আস্তানা, বিবেকানন্দ স্মৃতি পঞ্চবটি, জগন্নাথ আশ্রম, শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, মহাশ্মশানভবানী মন্দির, স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির গয়াক্ষেত্, জগন্নাথ মন্দির, বিরুপাক্ষ মন্দির, পাতালপুরী, অন্নপূর্ণা মন্দির ইত্যাদি,এখানে হিন্দু পবিত্র গ্রন্থসমূহ অনুসারে সতী দেবীর দক্ষিণ হস্ত পতিত হয়েছিল। সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ মন্দির. তীর্থযাত্রীদের জন্য এক পবিত্র স্থান। এর পুরনো নাম ছিলো "সীতার কুন্ড মন্দির"।

সত্য যুগে দক্ষ যজ্ঞের পর সতী মাতা দেহ ত্যাগ করলে মহাদেব সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রলয় নৃত্য শুরু করলে বিষ্ণু দেব সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর মৃতদেহ ছেদন করেন। এতে সতী মাতার দেহখন্ডসমূহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয় এবং এ সকল স্থানসমূহ শক্তিপীঠ হিসেবে পরিচিতি পায়।

রাজমালা অনুসারে প্রায় ৮০০ বছর পূর্বে গৌরের বিখ্যাত আদিসুরের বংশধর রাজা বিশ্বম্ভর সমুদ্রপথে চন্দ্রনাথে পৌঁছার চেষ্টা করেন।

ত্রিপুরার শাসক ধন মানিক্য এ মন্দির থেকে শিবের মূর্তি তার রাজ্যে সরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বিভিন্ন তথ্য অনুসারে এখানের ইতিহাস সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য জানা যায়। প্রাচীন নব্যপ্রস্তর যুগে সীতাকুণ্ডে মানুষের বসবাস শুরু হয় বলে ধারনা করা হয়। এখান থেকে আবিষ্কৃত প্রস্তর যুগের আসামিয় জনগোষ্ঠীর হাতিয়ার গুলো তারই স্বাক্ষর বহন করে। ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকান রাজ্যের অধীনে ছিল। এর পরের শতাব্দীতে এই অঞ্চলের শাসনভার চলে যায় পাল সম্রাট ধর্মপাল দ্বারা এর হাতে (৭৭০-৮১০ খ্রীঃ)। সোনারগাঁও এর সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রীঃ) ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে এ অঞ্চল অধিগ্রহন করেন। পরবর্তীতে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সুর বংশের শের শাহ্ সুরির নিকট বাংলার সুলতানি বংশের শেষ সুলতান সুলতান গীয়াস উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ পরাজিত হলে এই এলাকা আরাকান রাজ্যের হাতে চলে যায় এবং আরাকানীদের বংশধররা এই অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। পরবর্তীতে পর্তুগীজরাও আরাকানীদের শাসনকাজে ভাগ বসায় এবং ১৫৩৮ খ্রী: থেকে ১৬৬৬ খ্রী: পর্যন্ত এই অঞ্চল পর্তুগীজ ও আরাকানী বংশধররা একসাথে শাসন করে। প্রায় ১২৮ বছরের রাজত্ব শেষে ১৯৬৬ খ্রী: মুঘল সেনাপতি বুজরুগ উন্মে খান আরাকানীদের এবং পর্তুগীজদের হটিয়ে এই অঞ্চল দখল করে নেন।

এই মন্দিরে প্রতিবছর শিবরাত্রি তথা শিবচর্তুদশী তিথিতে বিশেষ পূজা হয়; এই পূজাকে কেন্দ্র করে সীতাকুণ্ডে বিশাল মেলা হয়। সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথ পাহাড় এলাকা বসবাসকারী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রতি বছর বাংলা ফাল্গুন মাসে (ইংরেজী ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস) বড় ধরনের একটি মেলার আয়োজন করে থাকে। যেটি শিবর্তুদর্শী মেলা নামে পরিচিত। এই মেলায় বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য সাধু এবং নারী-পুরুষ যোগদান করেন।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় মেলাগুলোর একটি সীতাকুণ্ডের শিব মেলা। প্রতিবছর শিব চতুর্দ্দশী মেলা উপলক্ষ্যে শিবরাত্রিব্রত পালন ও শিবলিঙ্গে অর্ঘ্য নিবেদন করতে দেশ-বিদেশের লাখো হিন্দু পুণ্যার্থী জড়ো হন জায়গাটিতে। স্থানীয়দের মতে এসময়ে পুণ্যার্থী আর পর্যটকের সংখ্যা দশ লাখও ছাড়িয়ে যায়। তিন দিন ব্যাপি এবারের শিব মেলার শুরু ৯ মার্চ থেকে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উচ্চতা খুব বেশি না হলেও এর চূড়ায় ওঠার পথটি বেশ সরু এবং দুর্গম। শিব মেলার সময় ভক্তদের ভিড় থাকে বলে বেশ চাপাচাপি করে এ পথে উঠতে হয়। কেউ তাড়াহুড়া করে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করবেন না। তাতে যে কোন রকম বড় দুর্ঘটনা হতে পারে। তাছাড়া পাহাড়ে উঠতে, নামতে নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করুন। উল্টো পথে কখনো উঠতে কিংবা নামতে চেষ্টা করবেন না। ভিড় এড়াতে চাইলে ফিরতি পথে ইকো পার্কের ভেতরের পথটি ব্যবহার করতে পারেন। তাতে ইকো পার্কের অনেকটাই দেখা হয়ে যাবে।

যেভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের বাসে গেলে সীতাকুণ্ড নামা যায়। এছাড়া মেলার সময় বেশিরভাগ ট্রেনই সীতাকুণ্ড স্টেশনে থামে। চট্টগ্রাম শহরের অলঙ্কার মোড় থেকেও বাসে আসা যায়। জনপ্রতি ভাড়া ৩০-৪০ টাকা। সিএনজি চালিত অটো রিকশা নিয়েও যেতে পারেন চট্টগ্রাম শহর থেকে। ভাড়া পড়বে ৩০০-৪০০ টাকা।

থাকার জায়গা

সীতাকুণ্ডে থাকার জন্য ভালো মানের কোন হোটেল নেই। সাধারণ মানের যে কয়টি হোটেল আছে, তাতেও মেলার সময় কক্ষ পাওয়া দুরুহ। সামান্য কয়েকটি হোটেল পুণ্যার্থীদেরই প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই সীতাকুণ্ডে ভ্রমণে গেলে চট্টগ্রামে থাকাই সবচেয়ে ভালো। চট্টগ্রাম শহরে থাকার জন্য বিভিন্ন মানের প্রচুর হোটেল আছে।

শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর

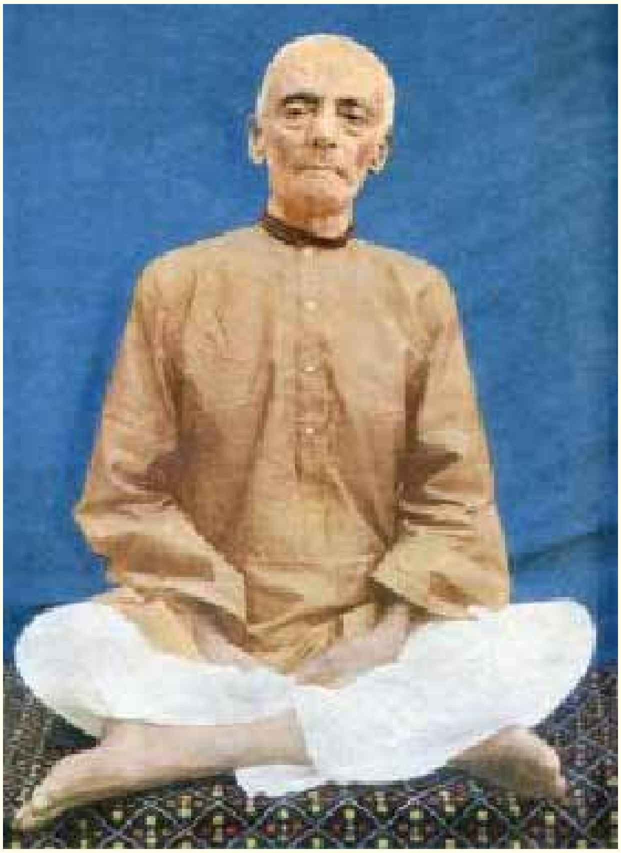

রাম ঠাকুর (জন্মনাম রাম চন্দ্র চক্রবর্তী, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০-১ মে, ১৯৪৯) ১৯ শতকের একজন হিন্দু ধর্মগুরু এবং সাধক।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজ জীবনে কুসংস্কার, ব্রিটিশ রাজশক্তির সৃষ্টি করা ভেদ নীতি ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে শুধু আধ্যাত্মিক চেতনায় মানুষকে বলীয়ান করাই নয়, সমাজ সংস্কারের এক সার্থক রূপকার ছিলেন রাম ঠাকুর।

১৮৬০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ডিঙ্গামানিক গ্রামে শ্রীরাধামাধব চক্রবর্তী ও শ্রীমতি কমলাদেবীর সন্তান হিসাবে শ্রীশ্রী রামঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন চার ভাই ও এক বোন; কালীকুমার, কাশীমণি দেবী, জগবন্ধু এবং যমজ ভাই রাম ও লক্ষ্মণ।

শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় বাংলা শেখার মাধ্যমে শ্রীশ্রী রামঠাকুরের শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। পিতা তন্ত্রসাধক ছিলেন বলে বালক বয়সেই রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ চর্চায় তিনি গভীর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তাঁর স্মৃতি শক্তি ছিল প্রখর। দুই যমজ ভাইয়ের একই সঙ্গে উপনয়ন হয়। ত্রিসন্ধ্যাবন্দনা থেকে সব করণীয় কাজ তিনি একাগ্রতার সঙ্গে পালন করতেন। শ্রীশ্রী রামঠাকুরের পিতার গুরুদেব ছিলেন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন। তিনি শ্রীশ্রী রামঠাকুরকে খুব স্নেহ করতেন। মাত্র আট বছর বয়সে রামঠাকুর তাঁর পিতাকে হারান। পিতার মৃত্যুর কয়েক দিন পর গুরুদেবের অসুস্থতার খবর শুনে তার মাতা শ্রীমতি কমলাদেবী দুই পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে যান। তাঁদের সামনেই গুরুদেব শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন মারা যান। কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রথমে পিতা, পরে গুরুদেবের মৃত্যুতে বালক রামঠাকুরের মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মানুষের জীবনমৃত্যু কেন্দ্রিক নানা প্রশ্ন তাঁর মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। কোনও এক অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে স্বপ্নে দেখা দিয়ে গুরুদেব তাঁকে সিদ্ধ মন্ত্র দেন। এর পর তাঁর জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। সিদ্ধ পুরুষের মতো তিনি মাঝে মাঝেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। মানসিক ভাবাবিষ্ট শ্রীশ্রী রামঠাকুর ১৮৭২ সালে সকলের অজ্ঞাতে অজানাকে জানার লক্ষ্যে গৃহত্যাগী হন। অনুসন্ধিৎসু বালক পায়ে হেঁটে বন জঙ্গল পাহাড় নদীর অজানা অচেনা পথ পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছালেন আসামের শ্রীশ্রী কামাক্ষ্যাদেবীর মন্দিরে। অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে তিনি কামাক্ষ্যা মন্দিরে পৌঁছে গুরুদেবের দেওয়া সিদ্ধ নাম এক মনে জপ করার সময় তিনি পরিষ্কার শুনতে পেলেন, গম্ভীর গলায় তাঁকে কে যেন ডাকছে। রাম, রাম ডাক শুনে তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না, যে গুরুদেবের সিদ্ধ নাম তিনি স্বপ্নে পেয়েছেন, এই ডাক হল তাঁরই। ডাকের অমোঘ টানে সাড়া দিয়ে বাইরে এসে শ্রীশ্রী রামঠাকুর দেখেন জটাধারী, দীর্ঘাঙ্গী এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে গুরু হিসাবে বরণ করে শ্রীশ্রী রামঠাকুর প্রণাম করলেন। গুরুও তাঁর যোগ্য শিষ্যকে আলিঙ্গন করলেন। এর পর শুরু হল গুরুর সঙ্গে অজানার সন্ধানে অন্তহীন পথে যাত্রা।

কিশোর শ্রীশ্রী রামঠাকুর গুরুর নির্দেশে পাহাড়, মরুপথ পেরিয়ে গভীর অরণ্যের নিরালায় তপস্যায় বসলেন। শোনা যায়, হিমালয় পর্বতমালায় কখনও কৌশিকাশ্রম, কখনও বশিষ্ঠাশ্রম সহ বহু অজানা স্থানে বছরের পর বছর তপস্যা করে এবং তপস্যারত মুনিদের সেবাপূজায় সময় কাটিয়ে তিনি অষ্টসিদ্ধি অর্জন করেন। এর পর গুরুর নির্দেশে লোকালয়ে ফিরে মানবসেবায় নিয়োজিত হন। গুরুর কৃপায় তাঁর কাছে অগম্য স্থান এবং অজ্ঞাত বস্তু বলে কিছু ছিল না। এর পর গুরু তাঁকে মাতৃসেবার জন্য বাড়ি ফিরতে আদেশ করেন। গুরুর নির্দেশ শিরোধার্য করে নিজের রোজগারে মাতৃসেবার জন্য তিনি নোয়াখালির এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে পাচকের কাজ নেন। শ্রীশ্রী রামঠাকুর নিষ্ঠার সঙ্গে রান্নার কাজ করতেন। সকলকে নিজের হাতের রান্না খাবার খাইয়ে আনন্দ পেলেও তিনি নিজে এ সব কিছুই খেতেন না। সামান্য দুধ এবং দুএক টুকরো ফলাহারেই তাঁর শরীর ছিল সুস্থ ও সবল। অচিরেই কর্মদাতা ইঞ্জিনিয়ার বুঝতে পারেন, তাঁর বাড়ির পাচক কোনও সামান্য মানুষ নন; এক মহাপুরুষ। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরূপ জানার পর তিনি তাঁকে আর পাচকের কাজ করতে দেননি। এরপর শ্রীশ্রী রামঠাকুর ফেণী শহরে এক ওভারসিয়ারের অধীনে সরকারি কাজ নেন। সেই সময় নানা জাতের বহু মহিলা কর্ম সূত্রে ফেণী শহরে থাকতেন। তাঁদের আপন জন বলে কেউ ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের হাতে রান্না করে এই সব মহিলাকে যত্ন সহকারে খাওয়াতেন। এদের কেউ অসুস্থ হলে মা বোনের মর্যাদায় সেবা করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সেবাপরায়ণতা দেখে তখনকার মহকুমা হাকিম কবি নবীনচন্দ্র সেন শ্রীশ্রী রামঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন, পরসেবায় ছিল তাঁর পরমানন্দ।

জেলখানার ইটখোলার ঘরে পাবলিক ওয়ার্কস প্রভুদের আনন্দ দিতে

কখনও কখনও বারাঙ্গনারা হাজির হত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদেরও রান্না করে খাওয়াতেন, মাতৃজ্ঞানে সেবাযত্ন করতেন। তৎকালীন কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজে যেখানে ছোঁয়াছুঁয়ির নামে শুচিবায়ুগ্রস্ত মনোভাব, বর্ণ বৈষম্যের মতো কুপ্রথার প্রভাব ছিল, তখন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের অকৃতদার যুবকের এ হেন আচরণকে সমাজ বিপ্লবের এক উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কবি নবীনচন্দ্র সেন"আমার জীবন"বইয়ের চতুর্থ ভাগে'প্রচারক না প্রবঞ্চক'অংশে শ্রীশ্রী রামঠাকুরের কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাণিকুলের প্রতি শ্রীশ্রী রামঠাকুরের ছিল যথেষ্ঠ মায়ামমতা। ফুলের সুগন্ধের মতো তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যৌগিক শক্তি, নানা বিভূতি প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীশ্রী রামঠাকুর তাঁর জীবনের অর্ধেক সময় লোকচক্ষুর আড়ালে গভীর যোগ সাধনায় মগ্ন ছিলেন। সাধনার মাধ্যমে যে মহাসত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তা বাকি ৪০ বছর (১৯০৮ থেকে ১৯৪৯) সকলের মঙ্গলে লোকালয়ে বিলিয়েছেন। তাঁর কাছে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শুচি, অশুচির কোনও ভেদ ছিল না। সব ঘটনাই তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে ভক্তদের বোঝাতেন।

প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন সমভাব নিরপেক্ষ শক্তির আধার। মন্দির, মসজিদ, গির্জায় নয়, শ্রীশ্রীঠাকুর অবস্থান করেছেন ভক্তের প্রয়োজনে, ভক্তের আলয়ে। লোকালয়ে থাকার প্রায় ৪৫ বছর তিনি মানব মুক্তির দিশা বিতরণ করেছেন। ভক্তদের তিনি বলতেন, আমি আপনাদের জন্য চাইখ্যা 'নাম' আনছি। বর্তমানে সদাব্যস্ত গার্হস্থ সমাজে এমন এক সহজ সরল অনাড়ম্বর 'নাম' করার নির্দেশ এবং সত্যের প্রতি অনুরাগ পৌঁছে দিতে পারে কৈবল্য মুক্তি। বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত মতে প্রয়োজনভিত্তিক নাম বিলি করে তিনি প্রকৃত অর্থেই ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে মানব সম্প্রদায়ের প্রচার করে গিয়েছেন। তিনি শুধু আধ্যাত্মিক গুরুই নন, তিনি জন্ম-জন্মান্তরের মা, বাবা ও বন্ধু।

বাণী

"শান্ত হইলেই শান্তি পাওয়া যায়।"-রাম ঠাকুর

রাম ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ডঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত'কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- সমুদ্রেরও একটা কূল আছে, কিন্তু তোমার ঠাকুরের কোনও কূলকিনারা নেই।

শ্রীশ্রী রামঠাকুরের নির্দেশে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ১৯৩০ সালে কৈবল্যধাম আশ্রম এবং ১৯৪২ সালে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির যাদবপুরে কৈবল্যধাম আশ্রম তৈরি হয়। এছাড়া, ১৯৪৩ সালে তাঁর জন্মভিটা ডিঙ্গামানিক গ্রামে সত্যনারায়ণ সেবা মন্দির তৈরি হয়। নাম প্রার্থীদের জন্য এক নির্দিষ্ট প্রথায় মোহান্ত পরম্পরা মারফত নাম বিতরণের তিনি ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

১৯৪৯ সালের ১ মে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে চৌমুহনীতে অগণিত ভক্তকে চোখের জলে ভাসিয়ে ৯০ বছর বয়সে শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর অমৃতলোকে যাত্রা করেন।

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কয়েকটি শাশ্বত বাণী

সংগ্রহে-আরতি রায়

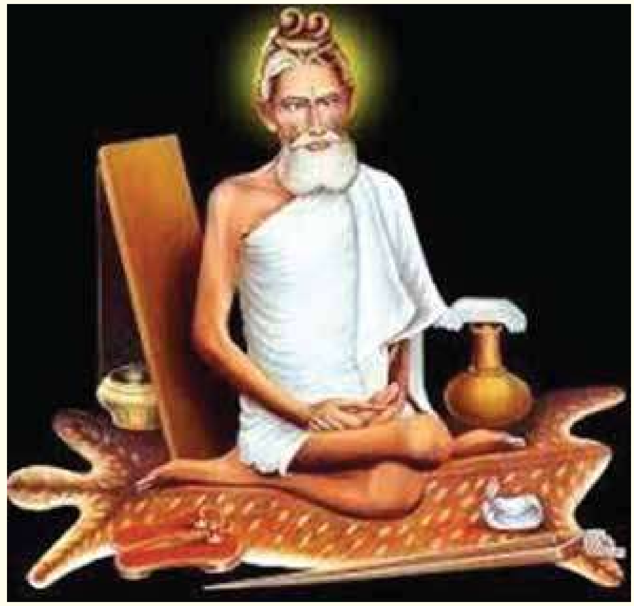

* সত্যের মত পবিত্র আর কিছু নেই। সত্য স্বর্গই গমণের একমাত্র সোপানস্বরূপ।

* ঈশ্বরই একমাত্র সদগুরু"। আমার চরণ ধরিস না-আচরণ ধর।

* গরজ করবি, কিন্তু আহাম্মক (নির্বোধ) হবি না। ক্রোধ করবি কিন্তু ক্রোধান্ধ হবি না।

* ওরে -সে জগতের কথা মুখে বলা যায় না, বলতে গেলেই কম পড়ে যায়।

* আমি বহু পাহাড় পর্বত ঘুরেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখলাম তিনজন। মক্কায় আবদুল গফুর, ভারতের তৈলঙ্গস্বামী এবং আমি নিজেকে।

* মনে রাখিস-বিষয় ভোগ বাসনাই তাপের বা দুঃখের কারণ। বাসনা নেই যার তাপ ও নেই তার।

* সন্ন্যাসীর জন্য সারা বিশ্বই গৃহস্বরূপ। যখন যেখানে থাকে সেটাই তাঁদের ঘর।

* শোন–কর্ম দ্বারা সুখলাভ হয়ে থাকে। তাই কর্মই তোদের কর্তব্য।

* প্রত্যক্ষেই হোক বা পরোক্ষেই হোক, বাক্য-মন-ইঙ্গিত দ্বারা কারও নিন্দা করা উচিত নয়।

* নিজেকে বড় না করে তাকে বড় কর, নিজে কর্তা না সেজে তাকে কর্তা জ্ঞান করার চেষ্টা কর, তাহলেই ত্যাগ আসবে।

* যা মনে আসে তাই করবি, -কিন্তু বিচার করবি।

* আমার দান ছড়ানো পড়ে আছে-তা কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো।

* তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও জ্ঞানোপদেশ দ্বারা যে ফল লাভ হয়, একমাত্র অভয়দান দ্বারা সেই ফল পাওয়া যায়।

* যাঁকে পাবার জন্য এতো যোগ সাধনা, এতো ভক্তি তিনি কি কেবল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মধ্যে না সাধু-মহাপুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? তিনি যে সকলের মধ্যেই আছেন।

আপনার পোল্ট্রির নিরাপদ
পানি নিশ্চিত করতে...
নতুন মোড়কে
অধিক কার্যকরী
SGS
Super Gut Solution
Improved New Formulation
With Greenish Colour
1 L
ISOCHLOR
Water Treatment Chemical
5 g x 100 tabs
SGS
Super Gut Solution
&
ISOCHLOR®
Water Treatment Chemical
AVON
animal health

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুর্গোৎসবের অনুভূতি

আজ সকালের বাতাসে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি শিউরে ওঠার মতো। কাল দুর্গোৎসব : আজ তার সুন্দর সূচনা। ঘরে ঘরে দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে আমার ধর্মসংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশুদিন শশুর বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম, রাস্তার দু ধারে প্রায় বড়ো বড়ো দালান-মাত্রেই প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। দেখে আমার মনে হল, দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকয়েকের জন্যে ছেলেমানুষ হয়ে উঠে একটা বড় গোছের খেলায় লেগে গেছে। ভেবে দেখতে গেলে, আনন্দের আয়োজন মাত্রই পুতুলখেলা, অর্থাৎ তাতে আনন্দ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই–বাইরে থেকে মনে হয়, সময় নষ্ট। কিন্তু সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে একটা ভাবের আন্দোলন এনে দেয় তা কি কখনো নিষ্ফল হতে পারে? সমাজের মধ্যে কত লোক আছে যারা নীরস বিষয়ী লোক; এই উৎসবে তাদেরও মন একটা সর্বব্যাপী ভাবের টানে বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে মিলে যায়। এমনি করে প্রতি বৎসর কিছু কালের জন্যে মনের এমন একটা অনুকূল আর্দ্র অবস্থা আসে যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে; আগমনী-বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের আদর্শ। তারা তুচ্ছ উপলক্ষকে নিয়ে নিজের মন দিয়ে ভরে তোলে, সামান্য কদাকার পুতুল নিয়ে তাকে নিজের ভাব দিয়ে সুন্দর ও প্রাণ দিয়ে সজীব করে তোলে। এই ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে সেই তো ভাবুক। তার কাছে চারি দিকের বস্তু কেবল বস্তু নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর–তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। দেশের সমস্ত লোক ভাবুক হতেই পারে না, কিন্তু এইরকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত অধিকাংশ লোকের মনকে অধিকার করে। তখন, যেটাকে দূরে থেকে সামান্য পুতুল বলে মনে হয়, কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে তার সে মূর্তি থাকে না।

(ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি, ছিন্নপত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১।)

শারদোৎসব ও রবীন্দ্রনাথ

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

সমাজের উপরতলায় যাদের অবস্থান, সব কিছুতেই তাদের অবাধ অধিকার, এমনকি পূজোর আনন্দেও একচ্ছত্র আধিপত্য। সে আনন্দ যজ্ঞে হে সবার নিমন্ত্রণ। এমনভাবেই চলছিল। হুগলির গুপ্তিপাড়া পথ দেখালো। জমিদার মশায়ের দম্ভের পূজো পরিত্যাগ করে সাধারণ মানুষ সামিল হয়েছে চাঁদা তুলে দুর্গাপূজোর আয়োজন, আনন্দ-বণ্টনে। দুর্গাপূজোর বারোয়ারি-রূপ পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে। কারও কারও মতে আরও পরে। দুর্গাপূজোকে ঘিরে বাবুসমাজ হতো আনন্দে মাতোয়ারা, থাকত নৃত্যগীতির অফুরান আয়োজন।

ঠাকুর পরিবারে দুর্গাপূজোর সূচনা প্রিন্স দ্বারকানাথের আমলে নয়, তারও ঢের আগে। ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসাবে সমাজে দ্বারকানাথের সম্ভ্রমের আসন ছিল। অর্থ বলে বলীয়ান দ্বারকানাথ অবশ্য জোড়াসাঁকোয় দুর্গাপূজো প্রবর্তনের সুযোগ পাননি। জোড়াসাঁকোয় দুর্গাপূজোর সূচনা হয়েছে নীলমণি ঠাকুরের আমলে, দ্বারকানাথ প্রবর্তক না-হলেও দিয়েছিলেন নতুনতর মাত্রা, হয়ে উঠছিল অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। এই জৌলুস প্রথমে ফিকে, পরে একেবারেই বিলীন হয়ে যায় দেবেন্দ্রনাথের কালে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ আনন্দ-মুখরিত পূজোর দিনগুলিতে সচেতন-ভাবেই জোড়াসাঁকোয় থাকতেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতেই ১৮৮৫ পর্যন্ত দুর্গাপূজো হয়েছে ঠাকুর পরিবারে। ব্রাহ্মধর্মালম্বী দেবেন্দ্রনাথের সমূহ পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম খণ্ডে তিনি জানিয়েছেন, 'গৃহদেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাটীতে সমবেত ব্রহ্মোপসনা বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপে দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হইল, প্রতিমার পীঠস্থানে উপাসনার বেদি নির্মিত হইল; ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র শ্বেতপ্রস্তরে উৎকীর্ণ করিয়া ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত হইল। পুজা পার্বণ লুপ্ত হইল...।'

জোড়াসাঁকোয় দুর্গাপূজো বন্ধ হলেও ছুঁয়ে যেতো পূজোর আনন্দ। অনেকের স্মৃতিচর্চাতেই ধরা রয়েছে পূজো-আনন্দের খণ্ডচিত্র। নতুন পোশাক আশাক হতো, মিলিত পার্বণী। বিজয়ার দিন শুভেচ্ছা-বিনিময় আর্শীবাদ-বিতরণ তো ছিলই, সব থেকে বড়ো আকর্ষণ ছিল বিজয়া সম্মিলনী। জোড়াসাঁকোয় বিজয়ার সান্ধ্যবাসর মুখরিত হতো সঙ্গীতে। প্রাণ ঢেলে গান গাইতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। বাড়িতে পূজো না-হলেও পূজো হতো কয়লাঘাটার রমানাথ ঠাকুরের বাড়িতে। মহর্ষির অজ্ঞাতেই সে-বাড়িতে পরিবারের সকলের কল্যাণ-কামনায় পূজো পাঠাতেন মহর্ষি-পত্নী সারদাসুন্দরী।

বাড়িতে পূজো নেই, শূন্য ঠাকুরদালান, তবু পূজোর আনন্দে আপ্লুত হতো বাড়ির ছোটরা। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই বন্ধ হয়েছিল জোড়াসাঁকোর দুর্গাপূজো। বাড়িতে পূজো না থাকলেও পূজোর আনন্দ রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করত। বালা-কৈশোরে পূজো আনন্দের ভাগীদার হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ–বাড়ির সকলেই।

দুর্গাপূজোকে ঘিরে বাঙালির যে উৎসব-আনন্দ, শুধু মনে নয়,

সে-আনন্দের প্রভাব পড়ে প্রকৃতিতেও, রবীন্দ্রনাথের মনেও উৎসবের আনন্দ বারবার অনুরণন তুলেছে। এই উৎসবের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিবিড় ছিল বলেই রচনাকর্মেও এ প্রসঙ্গ এসেছে। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শারদোৎসবের সঙ্গে কবির মানসিক নৈকট্য তৈরি হয়েছিল। তাঁর সৃষ্টিকর্মে যেমন উৎসবের ছায়া পড়েছে, তেমনই এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে নতুনতর সাহিত্য। শারদীয় সংখ্যার চাপে কলম ধরতে হয়েছে কবিকেও।

শারদোৎসবের আনন্দ-হিল্লোল থেকে কখনও দূরে থাকেননি, এড়িয়ে চলেননি রবীন্দ্রনাথ। 'ছিন্ন পত্রাবলী'-তে গ্রন্থিত, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরার উদ্দেশে লেখা ১৮৯৪-এর ৫ অক্টোবরের পত্রে কবি লিখেছেন, 'কাল সমস্ত বৃষ্টি-বাদলা শেষ হয়ে গেছে। আজ সকালে সুন্দর রোদ্দুর উঠেছে। আজ সকালের বাতাসের মধ্যে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি যেন শিউরে ওঠার মতো। কাল দুর্গাপূজা আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিল্লোল প্রকাশিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। ...দেখছিলুম রাস্তা দু'ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে–এবং আশে পাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে বড়ো গোছের পুতুল-খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে।'

ব্রাহ্ম-মন সে মুহূর্তে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করলেও উৎসবের ব্যাপ্তি-বিস্তৃতি ও সমন্বয়ী-রূপ পর-মুহূর্ত কবিকে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবিয়েছে। উল্লিখিত পত্রে ইন্দিরাকে লিখেছেন, 'সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।'

বাঙালি জীবনের সঙ্গে যে উৎসব ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে উৎসবের ছাপ সাহিত্য-শিল্পে-সংস্কৃতিতে তো পড়বেই। রবীন্দ্রসাহিত্যেও পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গল্পে নাটকে উপন্যাসে শারদোৎসবের স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে। সব সময় এই স্নিগ্ধতা অবশ্য বজয়া থাকেনি। বাস্তব তো বড়ো নির্মম। নির্মম বাস্তবের মুখোমুখিও দাঁড়াতে হয়েছে। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'ছুটির আয়োজন' কবিতায় রয়েছে শরতের মনোরম প্রকৃতির কথা। মাধুর্যময় প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠেছে শব্দ-তুলির আঁচড়ে। কবি লিখেছেন,

'কাছে এল পূজার ছুটি।
রোদ্‌দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ।
হাওয়া উঠেছে শিশিরে শির্‌শিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগে না কাজে।'

প্রকৃতির রং-রূপ যতই মোহময় হয়ে উঠুক না কেন, পূজোর আনন্দ সর্বত্রগামী হয়ে ওঠে না শেষ পর্যন্ত। দরিদ্রজনের মনোবেদনাও বিধু নামের বালকটির দুঃখ-যন্ত্রণা আমাদেরও ছুঁয়ে যায়। এত ঔজ্জ্বল্যের মাঝে কেন এই মালিন্য-প্রশ্ন জাগে মনে। 'মার মুখপানে' চেয়ে কাতর বালিকা যে প্রশ্ন তুলেছে, সে প্রশ্ন শুধু 'কাঙালিনী মেয়ে'টির নয়, আমাদেরও। প্রশ্ন করেছে, 'তুই যদি আমার জননী/মোর কেন মলিন বসন।'

রবীন্দ্রনাথের শিশু কাব্যগ্রন্থের বেশ ক'টি কবিতায়–'পূজার সাজ' 'ছোট সাজ' 'ছোটবড়' বা 'বিদায়' কবিতায় রয়েছে শারদোৎসবকে ঘিরে আনন্দ-বেদনার চিত্রমালা। আছে 'শিশু, ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থেও। প্রায় সূচনাপর্বের 'কড়ি ও কোমল' থেকে শেষ পর্বের 'পুনশ্চ'–কোথায় নেই দুর্গাপুজো ও শারোৎসবের প্রসঙ্গ। পূজোর আনন্দে, আলো-ঝলমলে দিনে আরও বেশি করে প্রতিভাত হয় মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা। সে সব ঘুরে-ফিরে এসেছে, রবীন্দ্র কবিতায়। রয়েছে পূজোর ছুটির প্রসঙ্গও। যেমন আছে 'সোনার তরী'তে, তেমনই আছে 'সহজপাঠ'-এ। 'সোনার তরী'তে কবি লিখেছেন, 'গিয়েছে আশ্বিন, পূজার ছুটির শেষে/ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূর দেশে, আবার সহজপাঠ'-এ 'ছুটির দিনে কেমন সুরে/ পূজোর সানাই বাজায় দুরে'। রবীন্দ্র-গানেও রয়েছে রঙে রূপে সেজে ওঠা উচ্ছ্বলিত প্রকৃতির কথা। আনন্দে জেড়ে উঠেছে হৃদয়, জেগেছে প্রকৃতি। বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে, 'শরতে আজ কোন্ অতিথি/এল প্রাণের দ্বারে। /আনন্দ-'গান গা রে হৃদয়/আনন্দে গান গা রে।/...শস্যক্ষেতের সোনার গানে/যোগ দে রে আজ সমান তানে,/ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর/অমল জলধারে।'

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে, গল্প-উপন্যাসেও রয়েছে, দুর্গাপূজো-শারোদোৎসবের কথা। প্রথম পর্বের গল্প 'দেনা পাওনা' খুবই পরিচিত, সর্বজনপঠিত। নিরূপমার পিতৃদেব রামসুন্দর 'পূজোর সময় মাকে ঘরে আনিবেই' প্রতিজ্ঞা করায় যে ঘোরতর সংকট তৈরি হয়, তা আমাদের সকলেই জানা। রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই আশ্বিন মাস, পূজোর ছুটি, শারদোৎসব-এসব এসেছে। 'খাতা', প্রায়শ্চিত্ত' 'স্বর্ণযুগ', 'রবিবার' প্রভৃতি গল্পের কথা প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়। শেষোক্ত গল্পটি শারদীয় সংখ্যার জন্যই লেখা হয়েছিল।

উপন্যাসেও রয়েছে দুর্গার উপস্থিতি, শারদোৎসবের অবতারণা। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলার কণ্ঠে 'দুর্গা' শব্দটি যে ব্যাপ্তি পেয়েছে, তা আমাদের সহজেই অভিভূত করে। বিমলা বলেছে, 'আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হবো; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দূর্গা বলব...বিমলার এই মনস্কামনা তো আমাদেরও মনে যে বাসনা গোপনে ছিল, তা রবীন্দ্র নায়িকার গলায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্র-নাটকের একটির নামই তো 'শারদোৎসব'। নাটকটি লেখা হয়েছিল শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের অভিনয়ের কথা ভেবে। শিক্ষকরাও অভিনয় করেছিলেন শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয় করেছিলেন। 'শারদোৎসব' অভিনীত হয়েছিল শারদোৎসবের প্রাক্কালে, পূজোর ছুটির আগে।

'সহজপাঠ'-এ আছে 'অন্ধের কণ্ঠের গান আগমনী'। আগমনী-গান ছাড়া শারদোৎসব অকল্পনীয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও রয়েছে আগমনী গানের কথা। 'শেষরক্ষা'-য় আছে দুর্গার কথা, এমনকি কার্তিক-গণেশের কথাও ত্রিপুরার রাজকাহিনির আশ্রয়ে লেখা 'বিসর্জন' নাটকে দুর্গা নয়, আছে কালীর কথা। কালী তো দুর্গারই রূপভেদ। গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যে রয়েছে কালী-প্রসঙ্গ। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে উমার কথা।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক ২০১৮ সালে শারদীয় দুর্গাপূজা আয়োজনে অস্থায়ী মন্দিরের উন্নয়ন কাজের কিছু চিত্র

শারদীয় দুর্গোৎসব ২০১৭ এর স্মরণিকা ``অপরাজিতা'' মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি কর্তৃক পুরস্কার লাভ

ধান, দূর্বা, শাখাঁ ও সিদুঁর ব্যবহারের যৌক্তিকতা

আর্য-সমাজে ধানই ছিল ধনের প্রতীক (বাংলাদেশ-ভারত এখনও কৃষিপ্রধান), আর দূর্বা হচ্ছে দীর্ঘায়ুর প্রতীক। দূর্বার কোন মৃত্যু নেই, রৌদ্রে পুড়িয়ে এবং বর্ষায় পচিয়ে গেলেও আবার গজিয়ে উঠে। উহার আর এক নাম 'অমর' সুতরাং ধানদূর্বা মস্তকে দেওয়ার অর্থ এই যে- ধনবান ও দীর্ঘায়ু লাভ করা; কিন্তু বলা বাহুল্য, আশীর্বাদক যদি এই অনুষ্ঠানের অর্থ না বোঝেন এবং তাহার অন্তরের শুভেচ্ছা যদি উহার সহিত সংযুক্ত না হয়, তবে ধান দূর্বা দানে কোন কাজ হবে না।

শাখাঁ সিদূঁর কেন পরে?

সনাতন ধর্মের কোন বিষয়ের পেছনেই কোন না কোন নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান । তেমনি শাঁখা সিঁদূরও আমাদের ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচীন সময়কাল থেকে হিন্দু মহিলারা স্বামীর জন্য সিদূঁর পরে থাকতেন। তবে বর্তমানে এ প্রথা অনেকটা আধুনিকতার স্বরূপ হয়ে দাঁড়িছে কারো কারো কাছে। শাঁখা সিদূঁর পরার কারণ এবং কেন এটা পরা উচিত- শাঁখা, সিদূঁর ও লোহা ব্যবহারের তিনটি কারণ হল- আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক। আধ্যাত্মিক কারণ- শাঁখার সাদা রং- সত্ত্ব, সিঁদুরের লাল রং-রজঃ এবং লোহার কাল রং- তম গুণের প্রতীক। সংসারী লোকেরা তিনটি গুণের অধীন হয়ে সংসার ধর্ম পালন করেন। সামাজিক কারণ - তিনটি জিনিস পরিধান করলে প্রথম দৃষ্টিতেই জানিয়ে দেয় ঐ রমণী একজন পুরুষের অভিবাবকত্বে আছেন। সে কারণেই অন্য পুরুষের লোভাতুর, লোলুপ দৃষ্টি প্রতিহত হয়। স্বামীর মঙ্গল চিহ্ন তো অবশ্যই। {যখন কোন মেলায় বা অনুষ্ঠানে যান, কোন সুন্দরী মেয়ে দেখলে প্রায়ই ছেলেরা পিছু নেয়, কিন্তু যখন দেখা যায় মেয়েটির কপালে সিদূঁর ও হাতে শাঁখা রয়েছে, তখন বুঝে নেয় সে বিবাহিতা, তাই ঘুরে লাভ নেই। এই ক্ষেত্রে মেয়েটি কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পান। এক্ষেত্রে শাঁখা সিদূঁর তার অস্তিত্ব বহন করে থাকে।} বৈজ্ঞানিক কারণ - রক্তে ৩টি উপাদান থাকে। বিভিন্ন কারণে মেয়েদের রক্তের এই ৩টি উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শাখাঁ সিদূঁর নিয়মিত পরিধানে রক্তের সে ঘাটতি পূরণ হয়। আর্যঋষিগণ সনাতন ধর্মের প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানেই বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে আচার বা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। বাহ্যিক সামাজিক গুনাবলী - কোন শাঁখা সিদূঁর পরিহিত মহিলা দেখলে সবাই বুঝে যে সে বিবাহিত, সেই ক্ষেত্রে তার সাথে সুশ্রী আচরণ করে থাকে সকলে। নারীদেরও শাঁখা সিদুঁরের প্রতি আলাদা একটা স্পৃহা থাকে, কেননা এটি তার জীবনের মিলবন্ধনে প্রতি মুহূর্তে জ্ঞাত করে। একটি বিষয় লক্ষ্য করবেন,

* সিদূঁর দেয়ার সময় মেয়েরা নিচের দিকে নং ঊর্ধ্বয়ণ করে। কেন? সিদূঁর ঊর্ধ্বয়াণের মাধ্যমে রমণীগণ নিয়ত তার স্বামীর আয়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা করে।

* শুভ বিজয়াতে বা বিভিন্ন পূজা পার্বণে মায়ের দেবী দুর্গাকে সিদূঁর ছোঁয়ান বা একে অন্যেকে সিদূঁর পড়ান। কেন? -কারণ দুর্গা দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন সিঁথীর সিদূঁর যেন অক্ষয় থাকে।

তাছাড়া অনুষ্ঠানে একে অন্যকে পরিয়ে দেন, সে বাসনাতেই সিঁদূর মেয়েদের ১৬ সিঙ্গারের মধ্যে এটা মানা হয়। বিবাহিত মহিলাদের এক প্রকার প্রতীক হিসেবে দেখা হয় সিদূঁরকে। হিন্দু ধর্মে বলা হয়, সিদুঁরের যে লাল রঙ থাকে সেটা স্বামীর দীর্ঘ জীবনের জন্য মহিলাদের এক মাত্রকামনার প্রতীক। লাল রঙ শক্তি ও ভালোবাসাকে বহন করে বলে মনে করা হয়ে থাকে। ধান, দূর্বা, শাঁখা ও সিদূঁর বিষয় এটাই আমাদের কিছু কথামাত্র, যেটা আপনাদের কিছু উপকারে আসবে বলে আমরা মনে করছি।

সংগৃহীত ঃ অসীম কুমার দাশ

'শিক্ষা' কে বলা হয় জাতির মেরুদন্ড এবং জাতীয় সকল উন্নয়নের চাবিকাঠি। মেরুদন্ডহীন মানুষের যে অবস্থা হয় শিক্ষাবিহীন জাতিরও সে একই অবস্থা হয়। তাই জাতীয় উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে মানসম্পন্ন

শিক্ষকদের ধর্ম, দায়িত্ব ও ভূমিকা

অধ্যাপক স্বপন কুমার বনিক

শিক্ষার মাধ্যমে জাতির মেরুদন্ড সুস্থ ও সতেজ রাখতে হবে। আর এ মহৎ কাজটি করতে যাঁরা সবচেয়ে বেশী অবদান রাখবেন, তাঁরা হলেন সম্মানীত শিক্ষক সমাজ। শিক্ষকগণ এমন এক মহান পেশায় নিয়োজিত যাঁদের আত্মনিবেদন ব্যতিত শিক্ষার কোন পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না। সকল ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের লোকেরাই শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত। তাঁদের কাজ হলো নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষাদান তথা জ্ঞান দান করে একটি শিক্ষিত এবং মর্যাদাসম্পন্ন জাতির গঠন করা– এটাই তাদেঁর ধর্ম। এই আদর্শ ধারণ করেই শিক্ষকগণ যদি তাঁদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সমন্ধে সচেতন হন, তবেই তাঁরা নিজ জীবনের গভীরতর অর্থ খুজে পাবেন এবং শিক্ষার মানও উন্নত হবে। তখনই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে প্রকৃত ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারবে এবং নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে দেশের সমস্যা সমূহের সঠিক সমাধান করে মানব কল্যাণে সঠিক অবদান রাখতে পারবে।

পরাধীনতার কালিমালিপ্ত পথ পেরিয়ে ১৯৭১ সালে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয়েছি, প্রতিষ্ঠা করেছি এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ নানাবিধ সমস্যার বাধা অতিক্রম করে আজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে একে আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে হলে শিক্ষকদের এগিয়ে আসা ছাড়া আর কোন পথ নেই। উপনিবেশিকতার বিষময় ছোঁয়া থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক আগেই মুক্ত হয়েছে। এখন দরকার নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষায় আজকের প্রচলিত পদ্ধতির ধারায় পরিবর্তন নিয়ে আসা। এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে দীক্ষিত হবার এখনই সময়। গড়ে উঠবে এক নতুন রাষ্ট্র, গড়ে উঠবে এক সুস্থ ও সংঘবদ্ধ জাতি, আর এ জন্য দরকার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। প্রকৃত শিক্ষক ব্যতিত শুধু শিক্ষাজীবিদের দ্বারা কোনদিনও জাতীয়ভিত্তিক শিক্ষাদান সম্ভব নয় এবং একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। আমাদের সমস্ত কর্মদক্ষতার পেছনে উদ্দেশ্য কি– এনিয়ে সকলকে ভাবতে হবে, অংশ নিতে হবে পারস্পরিক আলোচনায়। তাহলে বুঝতে পারবো অর্থই আমাদের সকল কর্মপ্রেরণার একমাত্র উৎস হতে পারেনা। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেতো প্রশ্নই উঠে না। অর্থ একটি উপাদান-সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ উপদান হল আমাদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন, যা মূল্যবোধ, মর্যাদা ও দেশপ্রেমের সাথে একান্ত ভাবে বিজড়িত। নিছক অর্থপ্রাপ্তিই যদি শিক্ষকদের সমস্ত কাজের উৎস হয়ে দাঁড়ায় তবে সামান্য বেতনভোগী হিসেবেই আমরা সমাজে পরিচিত হবো, শিক্ষক হিসেবে নয়। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের বলিষ্ঠতার ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কোন জাতির চেয়ে আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের যত মাথা ব্যথা আমাদের সম্প্রদায়, পরিবার ও সর্বোপরি নিজের ছোট্ট বৃত্তটুকু নিয়ে। যার ফলে রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সকলেই ছুটছেন নিজেদের জন্য, পরের জন্য নয়। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের ভূমিকার কথাটি বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করে নিজেরা সীমাবদ্ধ গন্ডী থেকে বেরিয়ে এসে হয়ে উঠবেন মূল্যবোধ ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শ এবং দেশপ্রেমের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন শিক্ষার্থীদেরকে। কারণ শিক্ষার্থীদেরকে স্বদেশ প্রেম এবং মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব শিক্ষকের স্কন্ধে ন্যস্ত।

শিক্ষক নিজে যে আত্মশক্তিকে আয়ত্ত করবেন, সে শক্তি তাঁর শিক্ষাদানের মাধ্যমেই প্রবাহিত হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। তাই শুধু পুঁথিগত শিক্ষাদানের মধ্যেই শিক্ষকদের কাজ শেষ হয়ে যায় না। তাঁর প্রধান কর্তব্য সুকুমার শিক্ষার্থীদেরকে জাগ্রত করা, অনুপ্রাণিত করা। যোগ্য শিক্ষক তিনিই হবেন যিনি পারেন শিক্ষার্থীর জীবন ও চরিত্রকে সর্বতোভাবে প্রভাবিত করতে। যিনি পারেন শিক্ষার্থীদের সতেজ প্রাণে সঠিক ধারণা ও মূল্যবোধের জন্ম দিতে, যাতে তারা যোগ্য নাগরিকের মতো জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের সাথে মিশে যেতে পারে। যোগ্য শিক্ষক হতে জ্ঞানের জন্য তীব্র অনুরাগ এবং রাষ্ট্র সেবার জন্য আকাঙ্খা অর্থাৎ শুধু সেবার মনোভাবই যথেষ্ট নয়, জ্ঞানের জন্য প্রগাঢ় ভালবাসার মনোভাবও অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষকের নিজের জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা নেই এবং নিজে শিখতে চাননা, তিনি তার শিক্ষার্থীদের কিভাবে জ্ঞানের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন? নতুন নতুন জ্ঞান আহরণে ও বিদ্যাসম্ভারে শিক্ষকদের মন সর্বদা সতেজ ও সজীব থাকবে।

আজকের শিশু ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনায়ক। পুরো ছাত্রজীবনটাই হল শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন ও জাতীয়তাবোধ উন্মেষের প্রকৃষ্ট সময়। তবে পরিবার থেকে শিশুরা যে শিক্ষা গ্রহণ করে সেটা পরবর্তীতে তাকে সারাজীবন প্রভাবিত করে থাকে। তাই অভিবাবক এবং শিক্ষকদের হতে হবে নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান দানের অন্যতম হোতা, যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে জেগে উঠে এক দীপ্ত চরিত্রবল, নির্মল জাতীয়তাবোধ, গণতন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থা আর সামাজিক দায়বদ্ধতার নিশ্চল বিশ্বাস। শিক্ষকদের প্রধান ভূমিকাই হল নবীন প্রজন্মের মনটি গড়ে তোলা। আগামী প্রজন্মের বাংলাদেশ কিরূপ হবে তা নির্ভর করছে পরিবার ও বিদ্যালয়ে অভিবাবক ও শিক্ষক কি ভূমিকা নিচ্ছেন তারই ওপর। বিদ্যালয়ে গন্ডীভুক্ত আজকের শিশুরাই আগামী দিনের দেশের সমস্ত ভাল-মন্দ ও যাবতীয় দায়-দায়িত্বের ধারক ও বাহক হয়ে উঠবে। তাই এ মুহুর্তেই তাদেরকে দিতে হবে জাতীয় আনুগত্য ও দায়বদ্ধতার শিক্ষা, যাতে তাদের মধ্যে গড়ে উঠে আত্মশৃংঙ্খলা, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও প্রকৃতির প্রতি সচেতনতা। আমাদের অতীতের যত অন্ধকার, যত দূর্বলতা সব কিছু ধুয়ে মুছে দিতে হবে এ প্রজন্মের মন থেকে। জাতির সঠিক ইতিহাস তাদের সামনে তুলে ধরার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকদের। শিক্ষার্থীদের সেই শিক্ষাই দিতে হবে যাতে অতীত ঐতিহ্যের কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ তা চিনতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। শিক্ষার মাধ্যমেই আজকের শিক্ষার্থীরা চিনে নেবে আলোকিত সত্যকে, সমৃদ্ধ করবে তাদের আপন স্বকীয়তা আর অবশেষে তা চালিত হবে পরবর্তী প্রজন্মের দিকে। এভাবে শিক্ষা দিতে পারলেই শিক্ষার্থী বিকশিত ও পূর্ণ ব্যক্তিত্বে উন্নীত হবে আর তখনই তারা মানব সম্পদে পরিণত হবে।

বৈশ্বিক উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নতির চরম শিখরের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি যুগের দাবি বিধায় এর থেকে শিক্ষার্থীকে দূরে রাখা যাবে না– এটাই আমাদের ভবিতব্য। তবে শিক্ষার্থীদেরকে এর সঠিক ব্যবহারের শিক্ষা দিবেন শিক্ষকগণই। একজন আদর্শ অধ্যাপক তাঁর আদর্শ এবং জ্ঞানের কথা শুধু নিজের নোট বই থেকে শিক্ষার্থীর নোট বইতে বা ল্যাপটপ থেকে ল্যাপটপে স্থানান্তর না করে অবশ্যই শিক্ষার্থীর চেতনায় প্রবেশ করাবেন। তবেই একটি শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতি গঠনে শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

পাট প্রকৃতির অপূর্ব দান
পরিবেশে রাখে বিরাট অবদান

- বিজেআরআই উদ্ভাবিত পাটের জাত ব্যবহার করুন, নিজের বীজ নিজে উৎপাদন করে অধিক ফলন ঘরে তুলুন।
- অকাল ফুলমুক্ত এবং উচ্চ ফলনশীল তোষা পাট ও-৭২, ওএম-১, ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭৯৫।
- দেশী পাট সিভিএল-১, বিজেআরআই দেশী পাট-৫, ৬ ও ৭ বপন করে অধিক ফলন ঘরে তুলুন।

- পাটের কম্বল, শীতের সম্বল। অধিক তাপধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। রং পাকা এবং রোদে রং ঝলসায় না। ব্যবহারে আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যসম্মত। দামে সস্তা ও পরিবেশ বান্ধব।

পলিথিন বর্জন করুন, পাটের ব্যাগ ব্যবহার করুন।
পাটের ব্যাগ ওজনে হালকা, দেখতে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য। পকেটে বহনযোগ্য। ব্যবহার শেষে ধৌত করা যায়। ১০-১৫ কেজি ওজন সহজে বহন করা যায়। ৩-৪ মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করুন, পরিবেশকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।

সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণের ধর্মদর্শন

সজীব কুমার বসু

ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে পৃথিবীব্যাপী তাঁর খ্যাতি। তাঁর প্রতিভার ধারা ও পাণ্ডিত্য এমন ছিল যে তিনি যে-কোন বিষয়ে অনায়াসে আলোচনা করতে পারতেন। তিনি শুধু একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, সাহিত্যিক, লেখক, সুবক্তা, এক দক্ষ কূটনীতিক এবং রাষ্ট্রনায়ক। তিনি একইসঙ্গে বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মৌলিক চিন্তা বক্তৃতার আকারে ও লেখনির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. রাধাকৃষ্ণণের দর্শনের মৌল নীতিগুলো হল: ১. বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ২. দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ৩. আধ্যাত্মিকতা ও ৪. মানবতাবোধ। অসাধারণ ছিল তাঁর সমন্বয়ী ক্ষমতা। তিনি মনে করতেন এই সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারত ও প্রতীচী উভয়েই উপকৃত হবে। ড. রাধাকৃষ্ণণকে দার্শনিক রাজা হিসেবে অভিহিত করা হয়। ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৭৫ সালে তিনি টেম্প্লেটন পুরষ্কারে ভূষিত হন।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণণের ধর্মচিন্তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণণের ধর্মচিন্তা বিষয়ে আলোচনার আগে ধর্ম কী সে-সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা দরকার। ধর্ম 'ধৃ' ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার সোজা অর্থ হল ধারণ করা। সাধারণ মানুষ ধর্মকে ধারণ করে বা ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইহজগত ও পরজগতে শান্তি ভোগ করার আশা পোষণ করে। পৃথিবীতে বহু ধর্ম রয়েছে। এসবের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইসলাম, ইহুদি, খ্রিস্টান ধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়। ঈশ্বর আর্য মুনি-ঋষিদের মাধ্যমে এ ধরাধামে যে আচার-আচরণ বা বিধি-নিষেধ দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ বা সুন্দরভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন তাই মূলত সনাতন ধর্ম। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ সর্বজীবের মুক্তি কামনা করেছেন। সর্বজীবের মুক্তির বাণী ভারতের চিরায়ত বাণী সর্বোপরিষদের বাণী। রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন একজন এই শাশ্বত জীবনের ভাষ্যকার। তিনি ছিলেন হিন্দুর জীবনবেদ ব্যাখ্যাকার। ড. রাধাকৃষ্ণণ তাঁর এঃযব ঐরহফঁ ঠরবি ড়ভ ষরভব গ্রন্থে বলেছেন– Hinduism is more a way of life than a form of thought. While it gives absolute liberty in the field of thought it enjoins a strict code of practice. Hinduism insists not on religious conformity button a spiritual and ethical outlook in life. ড. রাধাকৃষ্ণণ তাঁর Eastern Religion and Western Thought. বইয়ে সার্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই বইটিকে ধর্মের সন্ধিকাল হিসেবে ইঙ্গিত করা যেতে পারে। এখানে তিনি কিভাবে উপনিষদের অতীন্দ্রিয়বাদ পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করে চলেছে তার ব্যাখ্যা করেছেন। ড. রাধাকৃষ্ণণ ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ কথাও মানতে হবে যে আমাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারেননি। চতুর্দিকের ক্ষুদ্রতা, মূঢ়তা, ভয় আমাদের প্রিয় দেশের বিস্তর ক্ষতিসাধন করে চলেছে। আমাদের প্রকৃত পরিচয় আমরা কত জ্ঞান অর্জন করি তার দ্বারা হয় না, আমাদের পারস্পরিক ও সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রকৃত পরিচয় বোঝা যায়।' ড. রাধাকৃষ্ণণের মতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও দর্শনের পরিবর্তন না আনতে পারলে প্রাচীন বিষয়গুলো ক্রমশ অচল হয়ে পড়বে। তিনি এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের ওপর যে ধরনের কাজ করেছেন তা প্রাশ্চাত্য দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এ সম্পর্কে Encyclopedia of World Biograpy থেকে উদ্বৃতি দেওয়া যেতে পারে:

His translation and interpretation of Bhagavadgita (Sons of the Lord) strives to move traditional Hindu institutions (for instance, the caste system) in the direction of the democratic values. He proved himself capable of performing this potentially awkward synthetic task by stressing the more profound aspects of Hindu Philosophy which inherently transcend the provisional historical and social forms associated with normative Hinduism (Page-77).

সর্বপরি রাধাকৃষ্ণকে ভারতবাসী রাষ্ট্রপতি হিসেবে যতটা মনে রেখেছে, তার থেকেও অনেক দিন মনে রাখবে তাঁর দর্শন ও ধর্মের ওপর লেখা বিভিন্ন প্রামাণ্য পুস্তকের জন্য। তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই পরবর্তী প্রজন্ম বুঝতে পারবে যে তিনি কিভাবে জীবনের অর্থকে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা যেতে পারে যে, রাধাকৃষ্ণের ধর্মীয় চিন্তা বা মূল্যবোধ ভারতীয় দর্শনে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করেছে। তিনি প্রাচীন বিদ্যা এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত মূল্যের মধ্যে নতুন করে এক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। যুগের সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে পরিবর্তন না আনতে পারলে প্রাচীন বিষয়গুলো ক্রমশ অচল হয়ে পড়বে, এ কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখা বহু বইয়ের মধ্যে The Hindu View of life বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বহু দেশি-বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তাঁর বিভিন্ন বই থেকে তাঁর ধর্মচিন্তার নানা বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। Kalki or the Future of Civilisation বইটিতে রাধাকৃষ্ণ বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কিভাবে ব্যবহার করছে। তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের শাশ্বত সত্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের ওপর জোর দিতে হবে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। রাধাকৃষ্ণণের বিখ্যাত বইগুলির মূল্যবান দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর বিশেষ অবদান। সমকালীন সময়ে রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা, যুদ্ধরোধ করা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়ন সাধন করা এ সবেরই ভিত্তি সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। জাতিসংঘ প্রদত্ত তাঁর মানব প্রেমের বাণী, বিশ্বশান্তির বাণী এবং 'On World' বা একটি বিশ্বরাষ্ট্রের আন্তরিক আবেদন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আজ সমগ্র বিশ্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধর্মের নামে মৌলবাদের অপতৎপরতা, নিপীড়ন, নির্যাতন। ধর্মীয় মানবতার বাণী আজ ভূলুণ্ঠিত। এই প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের ধর্মচিন্তার অমিয় বাণীর প্রসার আজ বড় বেশি প্রয়োজন যার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতামূলক মনোভাব। রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন তথা ধর্মচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা তাই আজ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) দেশের ২৭০টি উপজেলায় সমমনা কৃষক গ্রুপের (CIG) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করছে:

- চাহিদাভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- সমন্বিত, তথ্যভিত্তিক ও বিকেন্দ্রীভূত সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বাজার সংযোগে সহায়তা এবং পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

- Formation & Mobilization of Common Interest Groups (CIGs) and their Federations
- Need Based Bottom up Micro Extension Planning at CIG/Union/Upazilla
- Scaling up of Latest Agricultural Technologies
- Development & Functioning of Farmers' Information and Advice Center (FIAC) at Union Parishad Complex

রুম নং-৬১৮, ৬ষ্ঠ তলা, প্রথম বিল্ডিং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫৫৬১৩, ই-মেইল: natpdaetwo@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.natp2dae.gov.bd

আমাদের পূজা: আমার নিজের পূজা

অসীম কুমার দাশ

তেজগাঁও সমাজ উন্নয়ন পরিষদ-এর উদ্যোগে ২০১৭ সাল থেকে তেজকুনিপাড়ায় সরস্বতী ও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও দূর্গাপূজা আয়োজনের লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমাকেও বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমার দীর্ঘদিন থেকে লেখালেখির অভ্যাস থাকলেও গত কয়েকমাস যাবত ব্যক্তিগত ব্যস্ততায় লেখালেখি প্রায় বন্ধ। এমতাবস্থায় তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের নিয়মিত প্রকাশনা "অপরাজিতা" আবারও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে মনটা কেমন করে উঠলো। বিশেষত: গতবারের পূজার অনেক স্মৃতি ও সুভ্যেনির এর কথা মনে ভাসতে শুরু করলো। গত সংখ্যায় আমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছিল। সুভ্যেনিরটি প্রকাশ হওয়া না হওয়া নিয়েও দোলাচল ছিল সময় স্বল্পতার জন্য। খুবই কম সময়ের মধ্যে একটি সুভ্যেনির প্রকাশ ও সেই সুভ্যেনির এর মহানগর পূজা কমিটি কর্তৃক পুরস্কার লাভ; প্রথমবার বলেই একটি বিরল ঘটনা। যা আমাদের কেউ আশা করেনি। সেই সুভ্যেনির প্রকাশের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বিশেষ করে এর সম্পাদক অধ্যাপক স্বপন কুমার বনিকসহ সম্পাদনা পর্ষদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। গতবারের পূজার স্মৃতি নিয়েই আমার আজকের এ লেখার প্রয়াস।

১৯৯০ সাল থেকে আমি ঢাকায় বসবাস করছি আর ২০০৯ সাল থেকে আমি তেজকুনিপাড়ায় বসবাস করি। ছোটবেলায় পূজার যে ক্রেজ বা উদ্দীপনা ছিল বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে তা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। আর ঢাকায় আমার দুর্গাপূজা মানেই বিভিন্ন মন্দির-এ যাওয়া, মানুষের ভীড় ঠেলে কখনো কাছে যাওয়া যায় আর না হলে অনেক দুর থেকে হাত জোড় করে প্রনাম করেই বিদায় নেয়া বা ভালো অনুষ্ঠান চললে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে দেখা। এটাই যখন রুটিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তখনই শৈশব কৈশরের সেই স্মৃতিমাখা পূজা আবারো শুরু হলো তেজগাঁও সমাজ উন্নয়ন পরিষদের ব্যানারে।

তেজকুনি পাড়ায় আমার রক্ত সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় স্বজন নেই, ফলে ঘরোয়া যে কোন ধর্মীয় বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে দুরের আত্মীয় স্বজন দু'একজন যারা আসে তাদের নিয়েই সারতে হতো। তেজগাঁও সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কল্যাণে তেজকুনি পাড়ায় এখন আমার দু'শোর অধিক পরিবারের সাথে আত্মীয়তা। ফলে কোন পারিবারিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাকে রেখে কাকে নিমন্ত্রন করবো সেটাই এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবার আন্তরিকতাপূর্ণ আচার আচরণ ও ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার মনে হয় সবাই আমার আত্মার আত্মীয় রক্তের সম্পর্কের চেয়েও অধিক প্রিয়।

২০১৭ সালের জুলাই বা আগস্ট মাসে আমার সাথে আমার বাসার নীচেই সম্ভবত নন্দী দা (সাধারণ সম্পাদক), কেশব সেন, তপনদা ও শ্যামল মিত্রের সাথে প্রথম দেখা। তপনদার বাসা আমার পাশের বাসা সত্ত্বেও উনাকে আমি চিনতাম না, নন্দী দা ও কেশবদার বাড়ী আবার আমার জেলায়; ফলে অল্প সময়ের আলাপ চারিতায় আমাদের মধ্যে একটা সখ্যতা গড়ে উঠলো। নন্দী দা আমাকে তেজগাঁও সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সদস্য হওয়ার ফর্ম দিলেন, কো-অপারেটিভ এর ফর্ম দিলেন আমিও সানন্দে সদস্য হিসেবে যুক্ত হলাম।

এর পরই পূজার আয়োজনের জন্য একটি সভা আহবান করা হলো আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সভাপতি জনাব প্রদীপ কুমার সাহার বাসায়। আমি প্রথমবারের মতো সভায় অংশহগ্রহন করে সবার সাথে পরিচিত হলাম। সবাই আন্তরিকতাপূর্ণ হৃদ্যতায় আমাকে তাদের আরো কাছে টেনে নিলেন। আমি সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠলাম।

শুরু হলো শারদীয় দুর্গা পূজার আয়োজন। প্রথমবার পূজা বলে পূজার স্থান নিয়ে মতভেদ থাকলেও নেতৃত্বের দৃঢ়তা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে আমরা তেজগাঁও মডেল স্কুল-এ তেজগাঁও সমাজ উন্নয়ন পরিষদের ব্যানারে প্রথম শারদীয় দূর্গা পূজা শুরু করলাম।

পূজার প্রথম দিন থেকে সকলের আন্তরিকতা, আতিথেয়তা আমাকে ও আমার পরিবারকে সর্বক্ষন মন্ডপমুখী করে তুললো। রক্তদান কর্মসূচীতে নিজের রক্ত দান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় আমার ছোট কন্যার অংশগ্রহণ ও পুরস্কার লাভ, আরতি প্রতিযোগিতায় আমার দুই কন্যার অংশগ্রহন ও বড় কন্যার পুরস্কার লাভ, সিঁদুর খেলায় আমার স্ত্রীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন, সব মিলিয়ে আমার পরিবারের সদস্যরা পূজা মন্ডপে সক্রিয় হয়ে উঠে। এসব অনুষ্ঠানে সক্রিয় থাকার কারনে সংগঠনের অনেকের সাথে ঘনিষ্টতা আরো বেড়ে যায় বিশেষ করে দীপক দা, হলিক্রস স্কুলের শিক্ষক সঞ্জীবদার সাথে। স্বভাববশত: অন্যন্যা বারের মতো আমার মেয়েরা বিভিন্ন মন্দির দর্শনে যেতে চাইলেও পূজা মন্ডপ সংশ্লিষ্ঠতার কারনে আমাকে অনেকটা বাধ্য হয়েই ওদের নিয়ে যেতে হয়েছে বটে কিন্ত মন সবসময় পড়ে ছিলো এই পূজা মন্ডপে।

নিজের পূজা, মন্ডপে গেলেই সকলেই পরিচিত, মন্ডপে ঢুকলেই কাজের ফুট ফরমায়েশ দেয়া বা নেয়া তাতে মনে হতো এটা তো আমার নিজের পূজা। এ এক ভিন্ন অনুভূতি। ঐ পূজার অনেকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হলেও এতো নাম যুক্ত থাকায় কারো নাম আর প্রকাশ করছি না। একটা বিশেষ স্মৃতি দিয়ে আজকের লেখাটা শেষ করবো বলে ভাবছি।

পূজায় প্রতিরাতে আমরা গ্রুপ করে করে মন্ডপ পাহারার কাজে মন্ডপে রাত্রি যাপন করতাম। মহা অষ্ঠমীর রাতে এই দায়িত্ব বর্তায় আমাদের গ্রুপের উপর তপনদা, শ্যামলদা, কেশবদা, অপূর্বদা, রতনদা ও আমি (আরো দুই একজন ছিলো যাদের নাম মনে নেই) এই গ্রুপে ছিলাম। আমাদের সাথেই রয়েই গেলেন সাধারণ সম্পাদক নন্দী দা। রাত ১১ টার পর থেকেই সম্ভবত বৃষ্টি শুরু হলো, বৃষ্টির তোড়ে মন্ডপের নীচে পানি জমে গেলো অনেক। আমরা বাধ্য হয়ে চেয়ার নিয়ে মন্ডপের পাশের মঞ্চে গিয়ে বসলাম। রাত আর পার হয়না। একসময় তাস খেলা শুরু হলো এরই মাঝে বিদ্যুত চলে গেলো, শুরু হলো মশার উপদ্রব। মন্ডপের মোম জ্বালিয়ে তাস খেলা চলতে থাকলো বিরতিহীনভাবে। সেই রাতে সবার জোকস বলা তাস খেলা সব মিলিয়ে পূজার আনন্দটাই বাড়িয়ে দিলো। এই তো আমার পূজা আমাদের পূজা, নিজের পূজা।

বিজয়া দশমীর সিঁদুর খেলা, কোলকুলি, সিঁদুর মাখামাখি, আমি সিদুর থেকে দুরে থাকার জন্য একটু দুরে দুরে ছিলাম, কিন্ত আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সভাপতি প্রদীপ দা কোলাকুলির নাম করে উনার গাল থেকে আমার গালে সিঁদুর দিয়ে আমাকে রাঙায়িত করলেন এর পর এক এক করে অপূর্ব দা, গোপাল দা, শ্যামল দা (আমার বাপের বয়সী বন্ধু এখন সে), তপন দা (থুক্কু তপন মামা) যেভাবে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠলেন তা ভুলবার নয়।

সবশেষে সকল সদস্যদের জন্য অলিভ রেস্তেরায় বিজয়া ভোজ। আহা

এটাই তো একমাত্র সংগঠন যেখানে আমরা সনাতন ধর্মালম্বীরা নিজের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব নতুন করে খুজে পাই ফিরে পাই। আগে মাঝে মাঝেই ভাবতাম পূজার সময় চট্টগ্রাম (আমার নিজ জেলা) যাওয়া ভালো কারণ বেশী আনন্দ, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সব ওখানে, ফলে নিরেট আনন্দ করা যায়। এখন আমার সব বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় এখানে হয়েছে সব আনন্দ এখানে কোথাও আর যেতে মন চায়না! আর কেনই বা যাবো? আমার পূজা, আমাদের পূজা, নিজের পূজাটা তো করতে হবে, এমনভাবে এমন আন্তরিকতার সাথে এটা যেন যুগ যুগ টিকে থাকে।

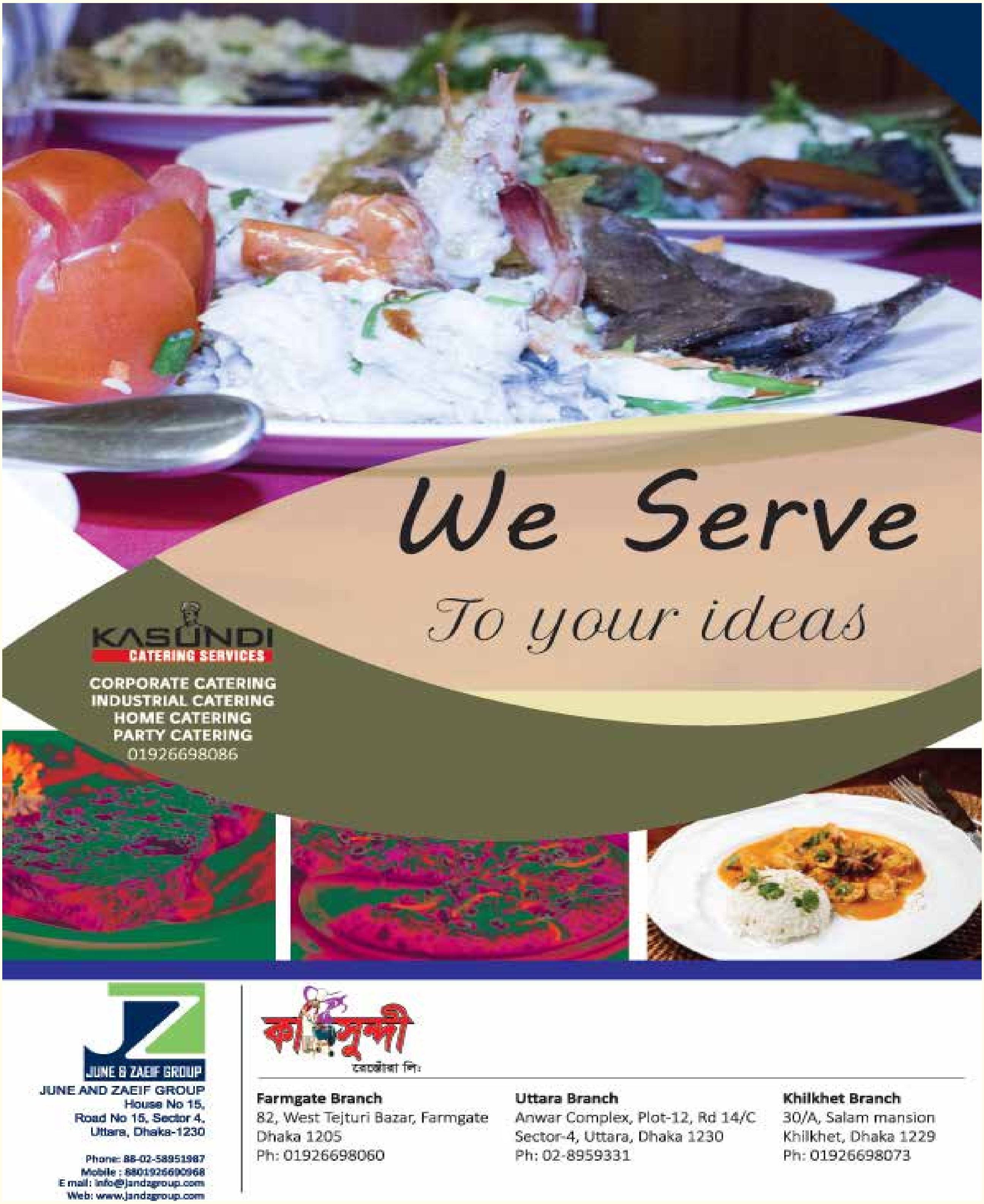

পূরীর জগন্নাথ মন্দিরের অজানা কাহিনী

বিমল কুমার সাহা

শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায়। একদিন তিনি এক গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। দূর থেকে এক শবর শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গাচরণকে পাখী ভেবে ভুল করে বান মেরে দিলেন। শবরের নাম 'জরা'। সেই বিষমাখা বানের আঘাতেই অবশেষে ইহলোক ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের ইহলোক ত্যাগের খবর পেয়ে সখা অর্জুন ছুটে এলেন দ্বারকায়। শ্রী কৃষ্ণের দেহ সৎকার করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, দেহটা ক্রমান্বয়ে ভষ্মে বিলিন হলেও 'নাভিদেশ' কিছুতেই ভষ্ম হচ্ছেনা। অর্জুন এনিয়ে যখন উদ্বিগ্ন, তখনই দৈববাণী হলো, "ইনিই সেই পরমব্রহ্ম। একে সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও অর্জুন। সমুদ্রেই এর অনন্ত শয়ন।" দৈববাণী অনুযায়ী অর্জুন "নাভিদেশ" সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিলেন। সমুদ্রে ঢেউ এর মাথায় চড়ে এগিয়ে চলতে থাকলো সেই 'পরমব্রহ্ম নাভি'। বিমূঢ়, শবর জরা বান মারার পর থেকে সকল ঘটনাপ্রবাহে সাক্ষী ছিলেন। এবার তিনি সমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায় দোল্যমান নাভিদেশ লক্ষ্যকরে সমুদ্রের তীর ধরে ছুটে চলতে লাগলেন। এভাবে তিনি 'দ্বারকা' থেকে 'পূরী' পর্যন্ত ছুটে চললেন। এবার দৈববাণী হলো,"আমাকে এবার তুলে নে, এখন থেকে আমি 'নীলমাধব' রূপে তোর বংশধরদের হাতেই পূজা নেব।"

দ্বাপরযুগ পেরিয়ে এলো কলিযুগ। কলিঙ্গঁ সাম্রাজ্যের রাজা তখন 'ইন্দ্রদ্যুম্ন।' তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণু পূজার উদ্দেশ্যে তখনকার শ্রীক্ষেত্রে তিনি বিশাল এক মন্দির গড়ে তোলেন। এটাই আজ "জগন্নাথধাম" হিসেবে আমাদের নিকট পরিচিত। মন্দিরতো গড়া হলো। কিন্তু মন্দিরে বিগ্রহ কোথায়? একদিন রাজ সভায় রাজা আকস্মিকভাবেই জানতে পারেন-বিষ্ণুরূপী নিলমাধবের কথা এবং তাৎক্ষনিকভাবে রাজা ধার্মিক ব্রাক্ষণদের নীলমাধবের খোজে শবররাজ্যে চর্তুদিকে পাঠালেন।

অনেক খোঁজাখুজি করেও নীলমাধবের কোন খোঁজ না পেয়ে ব্রাক্ষনদের দল যখন স্ব-রাজ্যে ফিরে গেলেন, তখন বিদ্যাপতি নামে একজন ব্রাক্ষণ ফিরলেন না। তিনি ঘন জংগলে পথ হারালেন। তাকে উদ্ধার করেন শবররাজ বিশ্ববসুর সুন্দরী মেয়ে ললিতা। বিদ্যাপতি ললিতার প্রেমে পড়ে যান। ললিতাও বিদ্যাপতিকে ভালবেসে ফেলেন। বিয়ে হলো দু'জনের। বিদ্যাপতি শবররাজের বাড়ীতেই থাকতে লাগলেন। বিদ্যাপতি লক্ষ্য করলেন, প্রতিদিন সকালে শবররাজ বাড়ী থেকে বের হয়ে যান। ফেরৎ আসেন দু/তিন ঘন্টা পর। এরপর তিনি প্রাত্যাহিক কাজ কর্ম করেন। বিদ্যাপতির মনে প্রশ্ন জাগে, প্রতিদিন দু/তিন ঘন্টার জন্য কোথায় যায় শবররাজ ? স্ত্রীকে ক্রমাগতভাবে একই প্রশ্ন করে তিনি নীলমাধবের কথা জানতে পারেন। এরপর থেকে তিনি একবার স্ত্রীর কাছে, আরেকবার বিশ্ববসুর কাছে 'নীল মাধব" দর্শনের বায়না করতে থাকেন। অবশেষে একদিন বিশ্ববসু শর্ত সাপেক্ষে বিদ্যাপতিকে তার সাথে নিতে রাজী হলেন। ঐদিন বিশ্ববসু যখন পূজায় মগ্ন, তখন দৈববাণী হলো, "এতদিন আমি নিভৃতে পূজো নিয়েছি, এরপর থেকে আমি মহা উপাচারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দিরে পূজিত হতে চাই। বিদ্যাপতি নীলমাধব দর্শন করেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে খবর পাঠালেন। এদিকে শবররাজ এসব জেনে বিদ্যাপতির উপর ক্রোদ্ধান্বিত হয়ে তাকে জেলে পুরলেন।

নীলমাধবের খবর পেয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন লোকবল নিয়ে রাওনা দিলেন সেই শবররাজ্যে। কিন্তু জঙ্গলে খুজে পাওয়া গেলনা সেই নীলমাধবের মন্দির। আটক হলেন শবরবাজ। মুক্ত হলেন বিদ্যাপতি। এমন সময় দৈব্যবানী হলো, "সমুদ্র জলে ভেসে আসবে কাঠ। তা থেকেই বানাতে হবে মূর্তি। সেই মূর্তিই পূজিত হল মন্দিরে।

দৈব্যবাণী অনুযায়ী সমুদ্রতীরে দেখা মিলল এক কাঠের। কিন্তু হাজার হাজার লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়ার সমন্বয়েও তোলা যাচ্ছিলনা। সেই কাঠ। দৈববাণী হলো, কাঠ তুলবেন শবররাজ ও বিদ্যাপতি। ভগবানের নিকট ব্রাক্ষণ- নীচুজাতের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কাঠ আনা হলো। কিন্তু বিগ্রহ গড়বে কে? কতজন এলো। কেউ কাঠে কোন আচড়ই বসাতে পারলোনা। এনিয়ে রাজা যখন মহা উদ্বিগ্ন তখন এক বৃদ্ধ এলেন। জানালেন, তিনিই গড়বেন মূর্তি। শর্ত একটাই তিনি মন্দিরের দরজা না খোলা পর্যন্ত কেউ মন্দিরে ঢুকবেনা। শুরু হলো মূর্তি গড়ার কাজ। দিন রাত বন্ধ ঘরে ঠুক ঠাক শব্দ। ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণী রোজই মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে কানপেতে মূর্তি গড়ার শব্দ শুনে পুলকিত হন। রাজাকে জানান। কাজ শুরুর চৌদ্দদিন পর রাণী লক্ষ্য করলেন, কাঠ কাটার কোন শব্দ ভিতর থেকে আর শোনা যাচ্ছেনা। উৎকণ্ঠিত রানী রাজাকে জানালেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে রাজার নির্দেশে ভাংগা হলো মন্দিরের দ্বরজা। ভিতরে সেই বৃদ্ধ কারিগর নেই। মন্দিরের ভিতরে আছে তিনটি অসমাপ্ত মূর্তি। তাদের হাত পা কিছুই গড়া হয়নি। কোন গর্হিত অপরাধ হয়ে গেছে, এই ভেবে রাজা যখন দুঃখে ভেংগে পড়লেন, তখন রাজাকে স্বপ্নে বলা হলো, এমনটা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। তিনি এভাবেই 'জগন্নাথ রূপে' পূজিত হতে চান। সেই থেকেই জগন্নাথ দেবের মন্দিরের ওই বিগ্রহ ওভাবেই যুগ যুগ ধরে পূজিত হয়ে আসছে। আর ওই মন্দিরই 'পূরীধাম' হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে।

জগন্নাথ দেবের প্রধান উৎসব হলো, রথযাত্রা। আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বিতীয় তিথিতে জগন্নাথ দেব বোন শুভদ্রা, ও দাদা বলরামকে নিয়ে রথে চড়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নীর বাড়ী যান, সাতদিন পর সেখান থেকে আবার মন্দিরে ফেরৎ আসেন। রথের দিন পর-পর তিনটি রথ যাত্রা করে। প্রথমে বলরামের রথ, পরে শুভদ্রার, এবং সবশেষে মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের রথ। রথেচড়ে জগন্নাথদেবের এই গমন ও প্রত্যাগমন 'সোজা' ও উল্টোরথ হিসেবে পরিচিত। চৈতন্য ভক্ত বৈষ্ণবগণ পুরীধামের অনুকরনে বাংলাদেশেও রথযাত্রা প্রচলন করেন-যা আজও চলমান।

দুর্গা, দিদি ও আমি

মিলেনিয়াম রায় পূজা

দুর্গা পূজার দিন চলে এসেছে। দিদিকে আজ কথাটা বলতে হবে। দিদি চুপচাপ বসে আছেন। আমি দিদির সামনে গিয়ে বললাম, দিদি, গত পূজাতে নতুন জামা কিনে দাওনি। এবারও কি কিনে দেবেনা? দিদি কিছু বলেন না। চুপ করে থাকেন। ওদিদি, কথা বলছনা কেন, উত্তর দাও? নতুন জামা কিনে দেবে কিনা। তবু দিদি আর কথা বলেনা। দিদি আমার দুর্গা দেবীর মতো চুপ করে আছেন। দিদি তালুকদার বাড়ির সুমা, দক্ষিণপাড়ার পার্বতী, মধ্য পাড়ার নয়না আর পাশের বাড়ির চন্দ্রা নতুন জামা কিনেছে। আমাকে কবে কিনে দেবে দিদি, বল? দিন তো আর নেই দিদি। একদিন পর ষষ্ঠী শুরু হবে। ও দিদি, আমি শুধু আমারটার কথা ভাবছি, তোমার ওতো পূজা উপলক্ষে নতুন জামা কাপড় প্রয়োজন তাইনা দিদি? তোমার কাছে দাবি করতে পারছি, কিন্তু তুমি কার কাছে দাবি করবে দিদি? আমাদের তো বাবা-মা নেই, কার কাছে করব দাবি? দিদি মামার বাড়ির কেউ আমার আর তোমার খোঁজখবর রাখে না। কোথায় থাকি, কি খাই, কীভাবে চলি আমরা, কেউ খবর রাখে না। আচ্ছা দিদি, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো তিথি উপলক্ষে মামারবাড়ির থেকে একটা সুতারবস্তু পেলাম না। আসলে কি ভাগ্য খারাপ? হয় তো সত্যি সত্যি ভাগ্য খারাপ আমাদের। সেজন্যই তো আজ আমাদের এই অবস্থা। দিদি কথাগুলো শোনার পর আমার হাত ধরে বসলেন। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। দিদির আদর পেয়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষে জামা কেনার কথা ভুলে গেলাম। দিদি, তোমাকে অনেক কথা বলে ফেলেছি তাই না? তুমি রাগ করোনি তো? কেন যে আমাদের মতো মানুষের জীবনে এতো উৎসব আসে? উৎসব আর তিথি আসলেই আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। দিদি আবার আমার গালে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন । দিদির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম দিদির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে। দিদির চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম, দিদি তুমি কাঁদছো কেন? কেঁদো না। আমারও যে কান্না পাচ্ছে। দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমিও দিদিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। কি রে উমা, শিমু, দুই বোন মিলে কান্না করছিস কেন? তাকিয়ে দেখি, পাশের বাড়ির সুবল কাকা। কিছু বললাম না। কি বলব কাকাকে, বলে কোনো লাভ নেই। কাকা আবারও বললেন, উমা, কি হয়েছে বল? হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে মিথ্যা বললাম, কাকা দিদির অসুখ একটু বেড়েছে। দিদিকে নিয়ে চিন্তায় আছি। সুবল কাকা বললেন, তোর দিদি তো জন্মগত ভাবেই বোবা আবার চোখেও কম দেখে। সে তো কখনোই ভালো হবে না। এখন দুর্গাদেবীর মতো একটি মূর্তি তোর দিদি। ঘরে বসে বসে পূজা দিস। কাকার উপর বিরক্ত হয়ে রেগে বললাম, চুপ করেন কাকা। আর বেশী কথা বলবেন না। চলে যান। দিদি আমার মুখ চেপে ধরলেন। আর কথা বলতে পারলাম না। সুবল কাকা তবুও কি যেন বলতে বলতে চলে গেলেন। দিদি আমি বড়ো হয়ে তোমার চিকিৎসা করাব। তুমি অবশ্যই ভালো হবে। কয়েক বছর পর আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা করব। দিদি আমার মাথা নাড়াল। দিদির হাত ধরে মন্দিরে নিয়ে এলাম। মা দুর্গার কাছে দুহাত তুলে দিদির জন্য প্রার্থনা শুরু করলাম আমি।

বিভিন্ন ধর্ম মতে মা দুর্গা

অদিতি পাল (ত্রয়ী)

আমাদের সকলের অতি নিকটের মা দুর্গাকে আমরা আদ্যশক্তি মহামায়া ও মহাবিশ্বের ঐশ্বরিক মাতা রূপেই চিনি। ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি তিনি হিন্দু ধর্মের আদি পরাশক্তি, রক্ষাকত্রী ও ভগবান শিবের সহ ধর্মীনী হিসেবে। তবে এর বাইরেও তিনি পরিচিতি পেয়েছেন সারা বিশ্বের ভিন্ন বিশ্বাসের ও ধর্মমতের মানুষের কাছে।

প্রথমেই বলা যায়, বুদ্ধ ধর্মের কথা। বৌদ্ধ শাস্ত্র হাজিমে নাকাসূরা মতে, বৌদ্ধদের বেশ কিছু রীতি ও আচার নেয়া হয়েছে হিন্দু ধর্ম থেকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হিন্দু ধর্মের শমন দেবতা যমকে তারা গ্রহণ করেছে বগ্র ভৈরব হিসাবে। বৌদ্ধ, তান্ত্রিক শাস্ত্রে দেবী দুর্গার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে।

জাপানি বৌদ্ধরা দেবী দুর্গাকে চেনে বুত্সু-মো হিসাবে। কখনো তাকে কাতি-শ্রী ও বলা হয়। তিব্বতে দেবী পালভেন লাহমো নামক শক্তির দেবীকে পূজা করা হয়, যিনি মা দুর্গার অনুরূপ।

জৈন ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় শাক্য মাতার, যিনি আমাদের মা দুর্গারই প্রতিচ্ছবি। জৈন ধর্মবিদরা বলেন, মা দুর্গা ও শাক্য মাতার পরস্পর সম্পর্কিত এবং এটি বহু প্রাচীন।

ভারতের ইলোরা গুহায় বেশ কিছু জৈন মন্দির খুঁজে পাওয়া গেছে, যেখানে সিংহের উপর উপবিষ্ট মা দুর্গার মূর্তি প্রতিস্থাপিত। তবে, এখানে দেবী কে মহিষ মর্দিনী রূপে কল্পনা করা হয়নি। জৈনদের কাছে তিনি শান্তির দেবী।

শিখ ধর্মের অন্যতম পবিত্র "দশম গ্রন্থে" দেবী দুর্গার উল্লেখ রয়েছে। শিখদের অন্যতম গুরু গোবিন্দ সিং দেবী দুর্গাকে তাঁর নিজ চেতনায় রূপদান করেছেন। তিনি দেবী দূর্গাকে নিরাকার রূপে কল্পনা করেছেন। দেবী দুর্গার এই নিরাকার অবস্থার নাম চান্দি। এই চান্দির মৃত্যু নেই, জন্ম নেই তিনি অদৃশ্য সকল পাপ দমন করেন। তবে কোন চিহ্ন নেই, তিনি প্রকৃতি স্বরূপ। একেশ্বরবাদী শিখরা এর সাথে অনেকটা দ্বিমতও পোষণ করে। তাদের গুরুমত দর্শন অনুযায়ী দুর্গা হচ্ছে আমাদের মন যেখানে কোন পাপ বিরাজ করেনা এবং সেই শক্তিমান যা আমাদের বিবেককে জাগ্রত করে। সকল পাপের বিরুদ্ধে লড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

যখন কেউ সকল জ্ঞান ও চেতনার অধিকারী হয় সম্পূর্ণ রূপে গুরুমুখ তথা উন্নত বিবেকের অধিকারী হয়, তখন তিনি দুর্গারূপে পরিচিত হন।

এছাড়াও এ মহাবিশ্বের শক্তিতে বিশ্বাসী সকল মানুষই তাদের মতো করে অজান্তেই মা দুর্গার অস্তিত্বে তাঁর ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রতি তাদের যে মঙ্গল কামনার প্রার্থনা তা যেন বিশ্ব শক্তির প্রতীক দেবী দুর্গার প্রতিই নিবেদিত হয়। তাই জগৎ জননী মা দুর্গার প্রতি সকলের কল্যাণ কামনা করি এবং জানাই শতকোটি প্রণাম।

প্রথাভঙ্গ

অনন্যা রায় তমা

কাউয়াদি গ্রামের বাসিন্দা অনিল মুখার্জী। তার একছেলে সুনীল ও এক মেয়ে উমা। অনিল মুখার্জীর লেখা পড়ার প্রতি খুবই আগ্রহ কিন্তু অনিলের বাবা মার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সে পড়াশুনা করতে পারেনি। অনিলের অবস্থাও যে খুব ভালো তা নয়। তারপর ও সে অনেক কষ্টে ছেলেকে শহরে পাঠায় লেখাপড়া করার জন্য। কিন্তু অর্থের অভাবে খুব বেশী দূর পড়াতে পারেনি। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বাবার দোকান দেখাশুনা করে। কিছুদিন শহরে থাকার কারণে সুনীলের মন-মানসিকতা একটু ভিন্ন। সে গ্রামের কুসংস্কার মানে না। সুনীল ছাড়াও গ্রামের যেসব ছেলে বাইরের পরিবেশে গিয়েছে, মিশেছে তারাও সুনীলের মতোই। এই গ্রামে মেয়েদের পড়ালেখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সুনীল তার ছোটো বোন উমাকে পড়ালেখা শেখাতে লাগলো। উমার পড়ালেখার প্রতি বেশ আগ্রহ। সুনীলের বয়স ২৫ বছর। গ্রামের লোকেরা ১৫ বছর বয়স থেকে তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য অনিল মুখার্জীকে চাপ দিতে থাকে। সুনীল তাদের গ্রামের মেয়ে অমিতাকে পছন্দ করে। তাকেই বিয়ে করতে চায়। কিন্তু গ্রামের লোকেরা ঘোর আপত্তি। কারণ মেয়েটি ছিল বিধবা। অনিল মুর্খাজীর এতে কোনো আপত্তি ছিল না। গ্রামের যেসব ছেলের পেটে একটু বিদ্যে আছে তারা বড়দের জানায় এখন বিধবা বিয়ে করা যায়, সরকার এ আইন তৈরি করেছে। এতে বাধা দিলে জেল হতে পারে। একথা শোনার পর গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বি গোছের লোক উকিলের সঙ্গে দেখা করে নিশ্চিত হয় এবং তারাও এ বিয়েতে বাধা দেয় না। কিন্তু অনিল মুখার্জীর পরিবারকে একঘরে করে রাখল। তাদের বেশী দিন একঘরে থাকতে হয়নি। যাদের ঘরে বিধবা মেয়ে আছে তারা এদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে। ঐসব পরিবার জানে বিধবা মেয়েদের কষ্ট। সুনীলের বিধবা বিবাহে উৎসাহিত হয়ে আরো দুটি ছেলে বিধবা বিবাহ করল। তখন থেকে মুরুব্বিরা বিধবা বিবাহ নিয়ে আর কোনো কথা বলেন না। মুরুব্বিরা অনিল ও সুনীলকে ডেকে হুশিয়ার করে দেন উমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য। এ গ্রামে ১০ বছরের মধ্যে বিয়ে দিতে হয় উমার বয়স ১২ বছর। উমা এখন বিয়ে করতে চায় না। একদিন রাতে উমাদের বাড়িতে ঢিল মারছে কিছু লোক। একান্ত নিরুপায় হয়ে অনিল মুখার্জী, ছেলের সন্ধান করতে থাকেন। বহু চেষ্টার পর কমলপুর গ্রামে একটি ছেলের সন্ধান পেয়ে সুনীল আর অনিল সেখানে যান। কমলপুরে নরেশ মুখার্জীর পাঁচ ছেলে আর তিন মেয়ে। নরেশ মুখার্জীর আর্থিক সচ্ছলতা তেমন ভালো ছিল না আগে। যৌতুক নিয়ে ছেলেকে বিয়ে দিয়ে নিজের অবস্থা ভালো করে ছিল। ছোট ছেলে নির্মলকে বিয়ে দিয়ে কিছু খরচ উসুল করতে চান। অনিল ও সুনীল নির্মলকে দেখতে এসেছেন। ছেলে দেখে তাদের পছন্দ হয়। ছেলের বয়স একটু বেশী হওয়ার কারণে সুনীল আপত্তি করে তাছাড়া ছেলের বাপ ৫০ হাজার টাকা যৌতুক চেয়েছে। সুনীল যৌতুকের পক্ষে ছিল না। সে নিজেও এক টাকা যৌতুক নেয়নি। তাছাড়াও এতো টাকা দেওয়াও তাদের পক্ষে কষ্টকর। গ্রামের লোক যে হারে তাদের অতিষ্ঠ করা শুরু করেছে তাতে উমাকে বেশী দিন ঘরে রাখা যাবে না। এর জন্য অনেক আপত্তি সত্ত্বেও সুনীল বিয়েতে রাজি হয়। উমা বিয়েতে রাজি ছিল না, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রাজি হয়। তাদের সামান্য চাষযোগ্য জমি ছিল সেটুকু বিক্রি করে তার যৌতুকের ৫০ হাজার টাকা দিচ্ছে। আর উমার গহনা ও শাড়ির জন্য উমার দাদা মহাজনের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়ে এসেছে। এর জন্য উমা বরপক্ষের উপর রেগে ছিল। বিয়ের পর উমা শ্বশুরবাড়ি যায়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার গহনা নিয়ে প্রশ্ন করে। উমা বেচারি সারাদিন সংসারে কষ্ট করে। উমার স্বামীর বয়স বেশী,তার মন- মানসিকতা অন্য রকম। উমার ছেলেমানসিকতা সে মোটেও পছন্দ করে না। ১২ বছরের বালিকার কাছ থেকে ২৫ বছরের নারীর আচরণ আশা করে নির্মল উমাকে কোনো কাজ করতে দিলে তা ভুল করলে উমাকে মারে। উমা মাঝে মাঝে গল্পের বই পড়ে। এগুলো তার দাদা তাকে কিনে দিয়ে ছিল। তার বই পড়া দেখে নির্মল খুব মারল। তারপর দিন উমার দাদা তাকে দেখতে এলো। বোনের হাতে মুখে আঘাতের চিহ্ন দেখে সে খুব কষ্ট পেল। উমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু উমা বাড়ি যেতে চাইলনা।

তার স্বামী অনেক যৌতুক নিয়ে আবার একটা বিয়ে করবে। তাকে নির্যাতন করে তাড়িয়ে দিয়ে আবার একটা বিয়ে করবে। এভাবে যৌতুকের লোভে তার স্বামী হয়তো অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট করবে। তাই উমা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য একটা বুদ্ধি আঁটল। সে কোনো কাজ আর ভালোভাবে করে না। ভাত রাঁধতে বললে হয় কাদা করে রাঁধে না হয় পুড়িয়ে ফেলে। তরকারিতে লবণ-ঝাল বেশী করে দেয়। এই নির্যাতনের কথা লোকের দ্বারা তার গ্রামেও পৌছে যায়। গ্রামের যারা তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল তারাও নির্যাতনের কথা শুনে কষ্ট পেল এবং উমার বাবাকে বলল উমাকে ছাড়িয়ে আনতে। উমাকে ছাড়িয়ে আনতে যে বাধা ছিল সেটি হলো পাড়ার লোক।পাড়ার লোকেরা পাছে কিছু বলে এই ভয়ে সুনীল বোনকে ছাড়িয়ে আনতে ভয় পেতো। এখন আর সে ভয় নেই। তারাও এখন উমাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার পক্ষে। কিন্তু উমা যৌতুকের টাকা না নিয়ে ফিরে আসবে না। উমাকে যে কাজ দেওয়া হয় তা ভুল করার কারণে তার শাশুড়ি তাকে কোনো কাজ করতে দেয় না। উমা তবু বিভিন্ন অকাজ করেই যায়। সে যখন ভালো ছিল তখন শুধু মার খেতে হতো। উমা তার শ্বশুরের জমির দলিল পুড়িয়ে দিল। স্বামীর ব্যবসার কাগজ ছিঁড়ে দিলো। শীতে লেপ কাঁথা ভিজিয়ে দিল। তার শ্বশুর আর কোনো পথ না দেখে তাকে এক লাখ টাকা ও তার বাবার দেওয়া গহনার দ্বিগুণ গহনা এবং আরও কিছু অতিরিক্ত টাকা দিয়ে তাকে চলে যেতে বলে। উমা টাকা ও গহনা নিয়ে তার বাবার বাড়ি চলে আসে। এই টাকা দিয়ে তার বাবার ঋণ পরিশোধ করে যে টাকা থাকে তা দিয়ে একটি স্কুল তৈরি করে। স্কুলে গরিব ছেলে-মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ালেখা এবং অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির ছেলে-মেয়েদের বেতন নেওয়া হতো। উমা ছোট হলেও সে ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াতো। এভাবে উমা সুখে দিন কাটাতে লাগল। এদিকে নরেশ নির্মলকে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। অনেক কন্যার পিতা যৌতুক দিতে চাইল। কিন্তু নরেশ যৌতুক ছাড়াই নির্মলকে বিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, বেশী বয়সী কোনো মেয়ে না পাওয়ায় এক বেশী বয়সী বিধবার সঙ্গে নির্মলের বিবাহ দেন। নরেশের পরিণতি দেখে গ্রামের অনেকের শিক্ষা হলো। কমলপুর গ্রামে এখন আর কেউ বিয়েতে যৌতুক ও কম বয়সী মেয়েকে ঘরের বউ করে আনে না।

কৃষিই সমৃদ্ধি

জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয়সহ গবেষণা ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার ও কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে সরকারের যাবতীয় কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা দেয়। কাউন্সিলের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরুপ:

- জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কৃষি গবেষণায় নীতি-নির্ধারণের জন্য গবেষণা অগ্রাধিকার ও ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ প্রণয়ন
- মাটি, জলবায়ু ও এলাকা উপযোগী ফসল নির্বাচন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের বিজ্ঞানীদের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ এর জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৫ প্রণয়ন
- জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্পের (NATP) মাধ্যমে ১০৮টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন
- কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (KGF) এর মাধ্যমে ১০১ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন
- দক্ষিণ কোরিয়ার আরডিএর অর্থায়নে এশিয়ান ফুড সিকিউরিটি শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে তাপ ও লবণাক্ত সহিষ্ণু গম ও ধানের জাত এবং শস্য সংগ্রহোত্তরসহ অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ
- ABSP II প্রকল্পের আওতায় ৪টি বিটি বেগুনের জাত উদ্ভাবন
- সার সুপারিশমালা গাইড ২০১২ প্রণয়ন
- সার উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণে গঠিত প্রমিতকরণ বিষয়ক জাতীয় কমিটির কারিগরী বিষয়ে সহায়তা প্রদান
- কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি উপজেলার ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ জরীপ এবং মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও
- তার ফলাফলসহ শস্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা নির্দেশিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণ তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ICT ও MIS Cell, Data Centre গঠন ও Geographical Information Systyem (GIS) ও Management Information Systyem (MIS) উন্নয়ন
- কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে সহযোগিতামূলক কর্মকান্ড জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সংস্থার সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নূতন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।
ফোন: +৮৮০-২-৯১৩৫৫৮৭, +৮৮০-২-৯১১০৮৪২;
ই-মেইল: ec-barc@barc.gov.bd, info@barc.gov.bd;
ওয়েবসাইট: www.barc.gov.bd

কল্যান্দী সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের দুর্গা পূজা

কেশব সেন

কল্যান্দী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার অর্ন্তগত দক্ষিণ মোহাম্মদপুর গ্রামে অবস্থিত। ঢাকা-নোয়াখালী রাস্তার পাশে কল্যান্দী হাই স্কুল নামক জায়গা থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই কল্যান্দী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির।

কল্যান্দী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির এর ইতিহাস সম্পর্কে অনেক ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। তবে এই গ্রামের মানুষদের ধারণা এই মন্দিরটি আজ থেকে প্রায় ২০০-৩০০ বৎসর পূর্বে তৎকালীন রাজা রামেন্দ্র রায় চৌধুরী তার নিজের এলাকাতে প্রায় ১ একর জায়গার উপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তার বংশধরেরা এবং এই দক্ষিণ মোহাম্মদপুর গ্রামের মানুষদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজকের এই মন্দির। রাজা রামেন্দ্র রায় চৌধুরি তার নিজের জায়গার উপর। তিনি দক্ষিণ দিকের কোন এক চর এলাকা থেকে আজকের এই ব্রাহ্মণদের আনেন এখানে পূজা দেওয়ার জন্য। পরবর্তীতে তাদের বংশধরেরা এই মন্দির বংশক্রমানুসারে পূজা করে আসছেন। প্রথম দিকে এই মন্দিরে ঘট পূজা করা হলেও আস্তে আস্তে প্রতিমা পূজা আরম্ভ হয়। প্রথমদিকে এখানে কোন স্থায়ী মন্দির না থাকলেও বর্তমানে এখানে বেশ সুন্দর এবং বড় একটি মন্দির রয়েছে। যা সত্যি নজর কাড়ার মতো। বর্তমানে এখানে দুই জন স্থায়ী ব্রাহ্মণ এবং একজন অস্থায়ী ব্রাহ্মণ আছেন। আর দুর্গা পূজার সময় আরো দুই জন ব্রাহ্মণ আসেন আর তারা তখন প্রধান পূজারি হিসাবে কাজ করেন। প্রতি বছর বেশ ধুমধামের সাথে এখানে দুর্গা পূজা করা হয়।

রাস্তা থেকে মূল মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখা যাবে কৃষ্ণ বলরাম এর মূর্তি সজ্জিত একটি সুন্দর গেইট। আর এই প্রবেশের আগে হাতের বামদিকে রয়েছে মা শীতলা দেবীর মন্দির। আর প্রবেশের ডানদিকে আছে শ্রাদ্ধ বাসর এবং তার পাশে শিব মন্দির। এর পরেই এর ডান পাশে রয়েছে শান বাধানো একটি পুকুর। আর তার পরেই রয়েছে সর্ব মন্দির পরিক্রমা এবং তার সাথেই রয়েছে রাধা গোবিন্দ এর মন্দির। এই রাধা গোবিন্দ মন্দিরের মধ্যে রাধা গোবিন্দের বিগ্রহ ছাড়াও গোপাল এর একটি বিগ্রহ আছে। আর এই মন্দিরের পাশে রয়েছে দুর্গা মায়ের মন্দির। আর এই দুর্গা মন্দির এর মধ্যে রয়েছে দেবী দুর্গার একটি বিগ্রহ।

এই মন্দিরে প্রতিদিন রাধা গোবিন্দ এর নিত্য নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। কল্যান্দী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির এর মূল পূজা হলো দুর্গা পূজা। দুর্গা পূজার ৫ দিন ধরে এখানে বেশ আড়ম্বরের সাথে দুর্গা পূজা পালন করা হয়। পূজার সময় বাংলাদেশ এর বহু দূর-দুরান্ত থেকে অনেক ভক্তের সমাগম হয়। তবে এই দুর্গা পূজার পাশাপাশি এখানে অন্যান্য আরো পূজা হয়। আর তাদের মধ্যে অন্যতম পূজা গুলো হলো কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, জন্মাষ্টমী, শিব রাত্রি, দোল পুর্নিমা, চৈত্র সংক্রান্তি সহ নানা ধরনের হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এছাড়া কার্তিক মাসের প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমদভাগবত গীতা পাঠ করা হয়। আর এমনি গত দুই বছর থেকে এই মন্দিরে দুর্গা দেবীর একটি বিগ্রহ আছে। আর তাই এখানে প্রতি বছর মাঘ মাসের আঠার তারিখে এখানে বাৎসরিক উৎসব পালন করা হয়। এছাড়া প্রতিদিনই দর্শানার্থী ও পূজারিদের ভিড় লেগেই থাকে। প্রাচীনতম মন্দির হিসেবে কল্যান্দী সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে রয়েছে প্রধান আকর্ষণ দুর্গা মায়ের বিগ্রহ। এছাড়াও, দেবী পার্বতী, শ্রীশ্রী কৈলাশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ, প্রভৃতি। এছাড়াও, শ্রীশ্রী দুর্গা নাটমন্দির, ইত্যাদি। এগুলোর তত্ত্বাবধান ও মন্দির পরিচালনায় একটি সুদক্ষ পরিচালনা কমিটি রয়েছে। এছাড়াও, পূজা-অর্চনা, নিত্যকর্মসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্য পুরোহিত ও তার পরিবার মন্দিরের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন। তাছাড়া মন্দিরের দুর্গা সংঘ নামে একটি শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে। যারা মন্দিরের এই দুর্গা পূজা ছাড়াও মন্দিরের সকল পূজা খুবই সুন্দর করে সম্পন্ন করে থাকে। মন্দিরের ভেতরে দুর্গা মায়ের বিগ্রহটি লোহার ফটকে সর্বদাই তালাবদ্ধ থাকে। এর সামনে রয়েছে দান বাক্স। যে-কেউই সাধ্যমত অর্থ প্রদান করতে পারেন যা মন্দির রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুসাঙ্গিক কাজে ব্যয় করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ণে ও ব্যবস্থাপনায় মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে।

বাসন্তি পূজা ও দুর্গা পূজা

বসন্ত কালে এই পূজা হয় বলে একে বাসন্তি পূজা বা বাসন্তি দুর্গোৎসব হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুলত এই বাসন্তি পূজাই সনাতন ধর্মের মূল দুর্গোৎসব হিসাবে চর্চা হয়ে আসছিলো। এটি সনাতন ধর্মের অনেক প্রাচীন উৎসব এবং এই দুর্গোৎসব বাংলা চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ দিন (ইংরেজির মার্চ/এপ্রিল) হতে শুরু হয়।

কথিত আছে, প্রাচীন কালে রাজা সুরথ সর্ব প্রথম এই পূজা করেছিলেন। একদা রাজা তার রাজ্য হারিয়ে বনে গেলেন, সেখানে তার সাথে সমাধি বৈশ্যর দেখা হয়। পরে তারা উভয়েই মেধা মুনির দেখা পান। মেধা মুনি রাজা সুরথকে পূজা করতে বলেন, রাজা সুরথ ও বৈশ্য উভয়ে মিলে বসন্তকালে চন্ডী পূজা করেন। বসন্তকালে পূজা করার কারনে একে বাসন্তী পূজা বলে অভিহিত করা হয়। এরপর থেকে সবাই বাসন্তী পূজা নিয়মিত পূজা হিসেবে পালন করা শুরু করলেন। বাসন্তী পূজা এরপর অনেকদিন সনাতন ধর্মের মূল পূজা হিসেবে পালিত হয়ে আসছিলো।

তবে, রামায়ন মতে, প্রভু শ্রী রাম, সীতাদেবীকে উদ্ধারের জন্য শরৎকালে দুর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন, যা অকালে করা হয়েছিল বলে অকাল বোধন বলে ও পরিচিত। এরপর সীতাদেবী উদ্ধার এবং লঙ্কার অসুর ধ্বংস হওয়ায়,অকাল বোধন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং এই অকালের দুর্গা পূজা রূপান্তরিত হয়ে যায় আমাদের মূল দুর্গা পূজায়। বলা বাহুল্য, শ্রী রাম ছিলেন ভগবানস্বরূপ মানুষ,ভগবান হয়ে ও তিনি এই দেবীর পূজা করলেন যাতে সবাই এটা অনুধাবন করে যে, এই দেবীর স্থান অনেক উপরে। মূলত এটা বোঝানোর জন্যই দুর্গা পূজা অনেক বড় পরিসরে পালন করা হয়ে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে,বাসন্তি পূজা বা বাসন্তি দুর্গোৎসব কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। তবুও বাংলার ঘরে ঘরে বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় এখনো বাসন্তি পূজা বা বাসন্তি দুর্গোৎসব প্রতি বছর আনন্দের সাথে পালিত হয়ে থাকে।

Our Exclusive Product
Foragi
Foragi Furniture & Interior Ltd.
touch your dream
Head Office: House: B-145, Road: 22, Mohakhali DOHS, Dhaka-1206.
Tel: +88 02 9881327 Fax: +88 02 9881327 web: www.foragifurniture.com
email: info@foragifurniture.com, foragifurniture@gmail.com
Factory: Mouchak, Siddhirgonj, Narayangonj.
Cell: +88 017 99993688
https://www.foragifurniture.com

সমবায়

শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন

কো-অপারেটিভ সোসাইটি এর শাব্দিক অর্থ একসঙ্গে কাজ করা। যখন কতিপয় লোক কোন বিশেষ বা সাধারণ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় একত্রে কাজ করেন তখন তা হয়ে উঠে সমবায় সমিতি, এটি হয়ে উঠে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সমবায় সমিতি এমন একটি উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃত যার মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের সম্প্রদায় এবং জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে।

কো অপারেটিভ সোসাইটি বা সমবায় সমিতির কিছু বৈশিষ্ট্য হলো- এর সদস্যপদ নির্দিষ্ট নয়। এর সদস্যগণ স্বেচ্ছায় সংগঠনে যোগদান করেন। সদস্যদের কোন বিশেষ স্বার্থে সংগঠন সৃষ্টি হলেও সামগ্রিক পরিসরে তা রাষ্ট্রের সেবার নিয়োজিত থাকে। সমবায় সমিতিতে বিভিন্ন কার্যক্রমের অর্থায়ন এর সকল সদস্য দ্বারা যোগান দেয়া হয়। নিবন্ধীকরনের পর এটি সহজেই সরকারের কাছ থেকে ঋণ ও নিরাপদ অনুদান বাড়াতে পারেন। সমবায় সমিতি গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত হয়। এর একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকে। যার সদস্যরা সকল সমিতির সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এর প্রধান উদ্দেশ্য থাকে সমাজের সেবা করা। কো অপারেটিভ সোসাইটি আইনের অধীনে নিবন্ধিত হয়ে একটি পৃথক সত্তায় রূপ নেয় যা নিজ নামে চুক্তি, সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় করতে পারে। কারও মৃত্যু বা অনুপস্থিতি সমিতির অস্তিত্বে কোন প্রভাব ফেলে না। এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করেই আমরা গড়ে তুলেছি আমাদের দি মেট্রোপলিটান হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, সংস্কৃতি ও সামাজিক কৃষ্টির উন্নয়ন, সদস্য, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সেবা করার মতো নানাবিধ উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা গড়ে তুলেছি আমাদের এই সংগঠন।

দি মেট্রোপলিটান হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর মূল লক্ষ্য হলো সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অত্র প্রতিষ্ঠানকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এর নানাবিধ উদ্দেশ্যর মধ্যে রয়েছে আর্ত, পীড়িত, নির্যাতিত ও সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সহযোগিতা করা, সদস্যদের সঞ্চয়মূখী করা, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, দরিদ্র ও দুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ক্লিনিক, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, হাউজিং প্রকল্প চালু করা, কর্মমূখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা ইত্যাদি।

প্রাথমিক পর্যায়ে দি মেট্রোপলিটান হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম ঢাকা মেট্রোপলিটান শহর ও উপশহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে ভবিষ্যতে সমিতির কার্যক্রম বাংলাদেশের যে কোন জেলা, উপজেলা, বিভাগীয় শহরের মধ্যে নিয়মানুযায়ী বৃদ্ধি করা হবে। আমাদের নানাবিধ কার্যক্রমে থাকবে মাসিক সঞ্চয় জমা, মাসিক সঞ্চয় ডিপোজিট, লোন প্রদান, হাউজিং প্রজেক্ট, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, পরিবহণ প্রকল্প ও বিশুদ্ধ জল বোতলজাত প্রকল্প, সমবায় বিপণী প্রকল্প, হোম সার্ভিস প্রকল্প প্রভৃতি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, সংস্কৃতি ও সামাজিক কৃষ্টির উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমরা দ্বিতীয়বারের মত উদযাপন করতে যাচ্ছি শারদীয় দুর্গোৎসব, ২০১৮।

বাঙ্গালি হিন্দু সমাজে শারদীয় দুর্গোৎসব প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এ বলা হয়েছে- "সৃষ্টির প্রথম যুগে পরমাত্মা, কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের আদি বৃন্দাবনের মহারাস মন্ডলে প্রথম দুর্গোৎসব করেন। এরপর মধু ও কৈটভ দুই আসুরের ভয়ে ব্রহ্মা দ্বিতীয় দুর্গোপূজা করেছিলেন। ত্রিপুরা নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শিব বিপদে পড়ে তৃতীয় দুর্গাপূজোর আয়োজন করেন। দুর্বাসা মুনির অভিশাপে লক্ষীকে হারিয়ে ইন্দ্র চতুর্থবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন। এরপর থেকেই পৃথিবীতে মুনিঋষি, সিদ্ধপুরুষ, দেবতা ও মানুষেরা নানা দেশে নানা সময়ে দুর্গাপূজা করে আসছে।"

দেবীপক্ষের সূচনা থেকে শুরু করে কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত বাঙ্গালির ঘরে ঘরে যে আনন্দ ছড়িয়ে থাকে সে, আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে সফল হোক আমাদের তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত দুর্গোৎসব। সকলের শুভ ও কল্যাণ হোক।

সভাপতি,
দি মেট্রোপলিটান হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

রোজকার মতোই আপনি অফিসে কাজ করছেন, হয়তো কাজের চাপ

হৃদরোগ এবং আমাদের করণীয়ঃ

পাপিয়া বাইন

একটু বেশী ; দুপুরের খাওয়াটাও আজ একটু ভারীই হয়েছে। হঠাৎ আপনার অস্থির লাগতে শুরু করলো। লক্ষ্য করলেন ঘেমে যাচ্ছেন, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বুকে চাপ লাগছে বা ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। এ অবস্থায় সহকর্মীরা আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে আপনি জানতে পারলেন, আপনি " হৃদরোগ" এ আক্রান্ত।

এরকম ঘটনা আমাদের কাছে নতুন নয়, আশেপাশে প্রতিনিয়তই ঘটছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে অন্তত ২০-২৫% মানুষ উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য হৃদরোগে আক্রান্ত।

হৃদরোগ বা হার্টের অসুখ বলতে সাধারনতঃ এঞ্জাইনা পেক্টোরিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান, ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজকে বুঝায়।

উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে চর্বি, অতিরিক্ত ওজন, ধূমপান, কম শারিরিক পরিশ্রম, ডায়বেটিস এ আক্রান্ত ব্যক্তিরা হৃদরোগ এ আক্রান্ত হবার ঝুকিতে থাকেন। এমনকি প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় কম শাক সবজি বা বেশী চর্বি জাতীয় খাবার, জাংক ফুড এবং শর্করা বেশী থাকলেও সেটা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে গণ্য হবে। হৃদরোগ এর লক্ষণগুলো আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি। এসব লক্ষণ দেখা দিলে দেরী না করে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালের "জরুরী বিভাগে" নিয়ে যাওয়া উচিত। বাংলাদেশের সকল জেলা হাসপাতাল, বিভাগীয় হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে এ চিকিৎসা দেয়া হয়। এ ছাড়াও জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউব, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য বিশেষায়িত হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। বাইপাস সার্জারী, পেসমেকার প্রতিস্থাপন বা ব্লকের চিকিৎসাও এসব প্রতিষ্ঠানে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে খরচ প্রতিষ্ঠান ভেদে তারতম্য হতে পারে।

যে কোন রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সচেতন থাকা। হৃদরোগ এর ক্ষেত্রে এ কথাটি আরও বেশী সত্য। শুধুমাত্র খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে অধিকাংশ সময় হৃদরোগ প্রতিরোধ করা যায়। যারা শারীরিক পরিশ্রম কম করেন তাদের খাদ্য তালিকায় ভাত ও চর্বি জাতীয় খাবার কমিয়ে শাক-সবজি ও ফলমূল বাড়ানো উচিত। প্রতিদিন না পারলেও সপ্তাহে অন্তত তিনদিন ত্রিশ মিনিট করে হালকা ব্যায়াম করা আবশ্যক। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে নিয়মিত পরিমাপ করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই ঔষধ বাদ দেয়া উচিত নয়।

দীর্ঘজীবন নয় বরং নীরোগ জীবনই আমাদের কাম্য। তাই নিজের প্রতি সচেতন হতে হবে এবং বিপদে ভরসা রাখতে হবে চিকিৎসকের প্রতি, তবেই উপভোগ করতে পারবেন হৃদরোগমুক্ত জীবন। সবাইকে শারদীয়া শুভেচ্ছা।

অর্থাৎ, "দ" অক্ষরটি দৈত্য বিনাশ করে, উ-কার বিঘ্ন নাশ করে, রেফ রোগ নাশ করে, "গ" অক্ষরটি পাপ নাশ করে এবং অ-কার শত্রু

দুর্গার নানা রূপ

রত্না বর্মন

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত।।
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিত।

নাশ করে। এর অর্থ, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা।" অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুম বলেছে, "দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা"। অর্থাৎ, যিনি দুর্গ নামে অসুরকে বধ করেছিলেন, তিনি সব সময় দুর্গা নামে পরিচিত। শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে যে দেবী "নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যাঃ" (সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি), তিনিই দুর্গা।

দুর্গাপূজা হল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর উপাসনার উৎসব। দুর্গাপূজা শরৎ (আশ্বিন) এবং বসন্ত (চৈত্র) ঋতুর শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কণ্ডেয়চণ্ডী অনুযায়ী, দুর্গাপূজার প্রথম প্রচলন হয়ে ছিল বসন্ত ঋতুতে রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি কর্তৃক। দেবী ভাগবত ও কালিকাপুরাণে উলেখ আছে, শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র দুর্গা পূজা করেছিলেন রাবণ বধের নিমিত্তে; এজন্য একে, 'অকালবোধন'ও বলা হয়ে থাকে।

দুর্গাপূজা ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রে পালিত হয়ে থাকে। তবে বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ও বাংলাদেশে দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁক জমকের সঙ্গে পালিত হয়। এমনকি ভারতের অসম,বিহার, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর এবং ওড়িশা রাজ্যেও দুর্গাপূজা মহাসমারোহে পালিত হয়েথাকে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রবাসী বাঙালি ও স্থানীয় জনসাধারণ নিজ নিজ প্রথা মাফিক শারদীয়া দুর্গাপূজা ও নবরাত্রি উৎসব পালন করে। শরৎকালে নবরাত্রির নয়দিনে প্রতিদিন দেবী দুর্গার নয় রূপের এক একজনকে পূজা করা হয়। দেবী দুর্গার নয়টি রূপকে বোঝানো হয় নবদুর্গা অভিহিত করে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে এগুলো দেবী পার্বতীর নয়টি ভিন্ন রূপ। এই নয়রূপ হল যথাক্রমে - শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী। প্রতি শরৎকালে নবরাত্রির নয়দিনে প্রতিদিন দেবী দুর্গার এই নয়রূপের এক একজনকে পূজা করা হয়।

১। শৈলপুত্রীঃ মা শৈলপুত্রীর বাহন বৃষ। এঁনার দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল আর বাম হস্তে কমল আছে। ইনি পূর্ব জন্মে দক্ষ নন্দিনী সতী দেবী ছিলেন। দক্ষের অমতে তিনি শিবকেই বিবাহ করেন। প্রতিশোধে দক্ষ এক শিবহীন যজ্ঞের অয়োজন করেন । বিনা নিমন্ত্রণে সতী দেবী পিত্রালয়ে গিয়ে অনেক অপমানিত হলেন ও দেহত্যাগ করলেন। এরপর ভগবান শিব দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করেন। এই দেবী পর জন্মে হিমালয় কন্যা পার্বতী রূপে জন্ম নেন। শৈলরাজ হিমালয়ের কন্যা হবার জন্য দেবীর এক নাম শৈলপুত্রী। এবং পরজন্মে তিনি দেবাদিদেব শিবকেই পতি রূপে বরন করলেন। নবরাত্রির প্রথম দিনে মা শৈলপুত্রীর আরাধনা করা হয়।

এই দেবী হৈমবতী রূপে দেবতা দের গর্ব চূর্ণ করেছিলেন ।

২। ব্রহ্মচারিণীঃ মা দুর্গার নবশক্তির দ্বিতীয়রূপ ব্রহ্মচারিণী। এখানে 'ব্রহ্ম'শব্দের অর্থ হল তপস্যা। ব্রহ্মচারিণী অর্থাৎ তপশ্চারিণী-- তপ আচরণকারী। কথিত আছে যে---'বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম'---বেদ, তত্ত্ব এবং তপ হল 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ। দেবী ব্রহ্মচারিণীর রূপ- জ্যোতিতে পূর্ণ, অতি মহিমা মণ্ডিত। তিনি ডান হাতে জপের মালা এবং বাঁ হাতে কমণ্ডলু ধারণ করে আছেন।

পূর্বজন্মে যখন হিমায়ের কন্যারূপে জন্মেছিলেন তখন তিনি নারদের পরামর্শে ভগবান শঙ্করকে পতিরূপে লাভ করার জন্য কঠিন তপস্যা করেন। সেই কঠিন তপস্যার জন্য তাঁকে তপশ্চারিনী বা ব্রহ্মচারিণী বলা হয়। তিনি সহস্র বর্ষ ধরে মাত্র ফল-মূলের আহার করে জীবন ধারণ করেছিলেন। শতবর্ষ তিনি শাক আহার করে জীবন নির্বাহ করেছিলেন। কিছুকাল কঠিন উপবাসে থেকে খোলা আকাশের নিচে বর্ষা ও গ্রীষ্মের দাবদাহে কাটিয়েছেন। এই কঠোর তপশ্চর্যার পরে তিন সহস্র বছর শুধুমাত্র গাছ থেকে মাটিতে ঝরে পড়া বেলপাতা আহার করে অহর্নিশ ভগবান শঙ্করের আরাধনা করেছেন। তারপর তিনি সেই শুষ্ক বেলপাতা আহার করাও পরিত্যাগ করেন। অতঃপর কয়েক সহস্র বছর নির্জলা, নিরাহারে থেকে তপস্যা করতে লাগলেন। পাতা (পর্ণ) খাওয়া ও পরিত্যাগ করায় তাঁর অন্য একটি নাম হয় 'অপর্ণা'। কয়েক সহস্র বছর এই তপস্যা করায় ব্রহ্মচারিণী দেবীর পূর্বজন্মের শরীর কৃশ-একদম ক্ষীণ হয়ে গেল। তিনি অতি কৃশকায় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই দশা দেখে মা মেনকা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি তাঁকে এই কঠিন তপস্যা থেকে বিরত করার জন্য বললেন, 'উমা, না ওরে আর না!' তখন থেকে দেবী ব্রহ্মচারিণীর পূর্বজন্মের আর এক নাম হয় 'উমা'। অবশেষে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে সম্বোধন করে প্রসন্ন হয়ে আকাশ বাণীর মাধ্যমে বললেন, হে দেবী! আজ পর্যন্ত কেউ এরূপ কঠোর তপস্যা করে নি। তোমার দ্বারাই এরূপ তপস্যা সম্ভব। তোমার এই অলৌকিক কাজে চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব উঠেছে। তোমার মনোষ্কামনা সর্বতোভাবে পূর্ণ হবে। ভগবান চন্দ্রমৌলি শিবকে তুমি পতিরূপে পাবে। এবার তুমি তপস্যায় বিরত হয়ে গৃহে ফিরে যাও। তোমার পিতা শীঘ্রই তোমাকে নিতে আসবেন। 'মা দুর্গার এই দ্বিতীয়রূপ ভক্ত এবং সিদ্ধদের অনন্ত ফল প্রদান করে। তাঁর উপাসনা দ্বারা মানুষের স্বভাবে তপ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সদাচার, সংযম বৃদ্ধি পায়। জীবনের কঠিন সংঘর্ষেও তাঁর মন কর্তব্যে বিচলিত হয় না। মা ব্রহ্মচারিণী দেবীর কৃপায় তাঁর সর্বদা সিদ্ধি ও বিজয়প্রাপ্তি হয়। দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিনে এঁর স্বরূপেরই আরাধনা করা হয়। এই দিন সাধকের মন 'স্বাধিষ্ঠান চক্রে'স্থিত হয়। এই চক্রে চিত্ত-প্রতিষ্ঠ যোগী তাঁর কৃপা ও ভক্তি লাভ করে।

৩। চন্দ্রঘণ্টাঃ দেবীর এই স্বরূপ পরম কল্যাণকারী । এঁনার মস্তকে

অর্ধচন্দ্র থাকে, তাই দেবীকে চন্দ্রঘণ্টা নামে ডাকা হয়। এঁনার শরীরের রং স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল । এই দেবী দশভুজা । এঁনার হাতে কমণ্ডলু, তরোয়াল, গদা, ত্রিশূল, ধনুর্বাণ, পদ্ম, জপ মালা থাকে । এঁনার বাহন সিংহ। দেবী তাঁর ঘণ্টার ন্যায় প্রচন্ড চন্ড ধ্বনিতে দুরাচারী রাক্ষস, দানব, দৈত্য দের প্রকম্পিত করেন ।

৪। কুষ্মাণ্ডাঃ দেবী দুর্গা তাঁর চতুর্থ স্বরূপে "কুষ্মাণ্ডা" নামে পরিচিতা। নবরাত্রের চতুর্থদিনে, অর্থাৎ চতুর্থী তিথিতে মাতৃপ্রাণ ভক্তগণ এই কুষ্মাণ্ডারূপেই আদ্যাশক্তিকে আহ্বান করে থাকেন। দেবী সিংহবাহিনী, ত্রিনয়নী ও অষ্টভুজা। আটটি হাতে সুদর্শনচক্র, ধনুর্বাণ, রক্তপদ্ম, কমণ্ডলু, ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয়। মায়ের বামহস্তে একটি অমৃতপূর্ণ কলসও রয়েছে। এখানে অমৃত ব্রহ্মের রূপক, দেবী ভগবতী অমৃতপূর্ণ কলস অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার হাতে নিয়ে বসে রয়েছেন। যোগ্য সাধক আপন তপোবল ও কৃচ্ছতা দ্বারা মহামায়াকে প্রসন্ন করতে পারলে তবেই মা সেই অমৃতভাণ্ডের অমৃতধারায় সাধককে স্নান করিয়ে তৃপ্ত করবেন, ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানে কৃতার্থ করবেন।

মায়ের হাতে আরও একটি বস্তু রয়েছে, সেটি হল জপমালা। সেই জপমালা সিদ্ধমন্ত্রে মন্ত্রিত, তাহা অষ্টসিদ্ধি ও নবনিধি দান করতে সমর্থ। এবার যে ভক্ত রুচি অনুযায়ী যা চাইবে, কল্পতরু মা সেই অনুসারেই বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। যে সিদ্ধি ও সিদ্ধাই চাইবে, মা তাকে তাই দিয়ে ভোলাবে। আর যে পার্থিব সম্পদে অনীহা প্রকাশ করে ওই অমৃতপূর্ণ কলস, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান চাইবে, মা তাকেও তাই দিয়েই সন্তুষ্ট করবেন।

দেবী কুষ্মাণ্ডার যেহেতু আটটি হাত, তাই তিনি "অষ্টভুজা" নামেও পরিচিতা। এনাকে "কৃষ্ণমাণ্ড" নামেও ডাকা হয়। মহাপ্রলয়ের পরে যখন সর্বত্র শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছেয়ে রয়েছে, তখন এই ভগবতী কুষ্মাণ্ডা "ঈষৎ হাস্য" করে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তাই আদ্যাশক্তি বলতে আমরা যাঁকে বুঝি, তিনিই ইনি। দেবীর বাসস্থান সৌরমণ্ডলে। ভীমাপর্বতেও দেবী নিবাস করেন বলে উল্লেখ আছে।

৫। স্কন্দমাতা : আমরা যেমন দেবীকে গণেশ জননী হিসেবে বেশি পুজো করি, পশ্চিম ভারতে আবার দেবী মান্যতা পান কার্তিকেয়র মাতা হিসেবে। কার্তিকের আরেক নাম স্কন্দ। নবরাত্রির পঞ্চম রাতে দুর্গা পূজিত হন স্কন্দমাতা রূপে। ত্রিনয়নী দেবী চার হাত বিশিষ্টা। ডানদিকের উপরের হাতে ধরে আছেন শিশু কার্তিককে। প্রস্ফুটিত পদ্ম থাকে আর এক দক্ষিণ হস্তে। বাঁ দিকের একটি হাত বারিয়ে দিচ্ছে। আর এক হাতে ধরে আছেন পদ্ম। এই রূপে দেবী দুর্গা কোনও বাহনে উপবিষ্ট নন। তিনি বসে থাকেন ফুটে থাকা কমলে। পূজিত হন নবরাত্রির পঞ্চমদিনে।

৬ । কাত্যায়নী : এই নাম এবং রূপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক পৌরাণিক কাহিনি। বৈদিক যুগে কাত্যায়ন নামে এক ঋষি ছিলেন। এক পুত্রের পিতা কাত্যায়নের ইচ্ছে হয় একটি কন্যাসন্তান লাভের। দেবী দুর্গার তপস্যা করে তিনি অভীষ্ট পূর্ণ করেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে স্বয়ং দেবী দুর্গা জন্ম নেন মহাঋষি কাত্যায়নের কন্যা রূপে। তখন তাঁর নাম হয় কাত্যায়নী। নবরাত্রির ষষ্ঠ দিনে আরাধিতা হন ভক্তদের কাছে।

৭ । কালরাত্রি : এখানে দেবী কৃষ্ণবর্ণা। আলুলায়িত কেশে তিনি ধাবিত শত্রুর দিকে। তাঁর কণ্ঠে বিদ্যুতের মালিকা। ত্রিনয়নী দেবীর শ্বাস প্রশ্বাসে বেরিয়ে আসে আগুনের হলকা। ভীষণ দর্শনা দেবীর তিন হাতে অস্ত্র। এক হাতে ভক্তদের প্রতি বরাভয়। এই রূপই উপাসিত হয় কালিকা রূপে। তবে এই রূপেও দেবী ভক্তের শুভ করেন। তাই অন্যদিকে তিনি শুভঙ্করী। দেবীর বাহন গর্দভ। ভক্তরা তাঁর পুজো করেন নবরাত্রির সপ্তম রাতে।

৮। মহা গৌরী : হিমায়লকন্যা নাকি ছিলেন কৃষ্ণা। মহাদেব যখন গঙ্গাজল দিয়ে তাঁকে স্নান করান, তখন তিনি হয়ে ওঠেন ফর্সা। তাঁর এই রূপের নাম হয় মহাগৌরী। প্রচলিত বিশ্বাস, নবরাত্রির অষ্টম রাতে তাঁর পুজো করলে সব পাপ ধুয়ে যায়। সাদা পোশাক পরিহিতা, চার হাত বিশিষ্টা দেবীর বাহন ষাঁড়। দেবীর এক হাত শোভিত বরাভয় মুদ্রায়। বাকি তিন হাতে থাকে পদ্ম, ত্রিশূল এবং ডমরু।

৯। সিদ্ধিদাত্রী : নবদুর্গার নবম তথা শেষ রূপ হল সিদ্ধিদাত্রী। সিংহবাহিনী দেবীর চার হাতে আশীর্বাদী মুদ্রা। তিনি সিদ্ধি দান করেন। অর্থাৎ তাঁর উপাসনায় সংসারে আসে সুখ এবং সমৃদ্ধি। সবাইকে বরাভয় দেন এই মাতৃকামূর্তি। দেবী ভগবত্ পুরাণে আছে, স্বয়ং মহাদেব দেবী দুর্গাকে সিদ্ধিদাত্রী রূপে পুজো করেছিলেন। এবং তার ফলে মহাদেব সকল সিদ্ধি লাভ করেন। সিদ্ধিদাত্রীর আশীর্বাদেই অর্ধনারীশ্বর রূপ লাভ করেন মহাদেব।

নবদুর্গা রূপের প্রথম দিনের রূপটি হল ‘ শৈলপুত্রী’, দ্বিতীয়ায় দ্বিতীয় রূপটি হল ‘ব্রহ্মচারিণী’। বেদ-এ এর উল্লেখ আছে। এদিন যোগী সাধক তাঁর মনকে ‘স্বাধিষ্ঠান’চক্রে স্থিত করেন যোগসাধনার মাধ্যমে। নবরাত্রি আরাধনার তৃতীয় দিনে মা দুর্গার তৃতীয় শক্তির নাম ‘চন্দ্রঘণ্টা’, উপাসনায়যোগী তাঁর মনকে ‘মণিপুর’চক্রে প্রবিষ্ট করান। মা দুর্গার চতুর্থ রূপের নাম হল ‘কুষ্মাণ্ডা’, এই চতুর্থী তিথিতে সাধকের মন ‘অনাহত’চক্রে অবস্থান করে। মহাপঞ্চমীতে দেবী দুর্গা ‘স্কন্দমাতা’রূপে পূজিতা হন। এই দিনে সাধক তাঁর মনকে ‘বিশুদ্ধ’চক্রে স্থাপন করেন। দেবী দুর্গাকে প্রথম আরাধনা করেন মহর্ষি কাত্যায়ন কন্যারূপে। তাই দেবী দুর্গা মহাষষ্ঠীতে ‘কাত্যায়নী’রূপে পূজিতা হন। শ্রীকৃষ্ণ-সহ সমস্ত গোপ ও গোপী দেবী কাত্যায়নীর পূজা করেন, এর উলেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা সাধক ‘ধাজ্ঞা’চক্রে তাঁর মনের উত্তরণ ঘটান। দুর্গাপূজার সপ্তম দিনে মহাসপ্তমীতে দেবী দুর্গাকে ‘শালরাত্রি’রূপে পূজা করার বিধান। সে দিন সাধকের মন ‘সহস্রার’চক্রে অবস্থান করে। মহাষ্টমীতে দেবী দুর্গার রূপ হয় ‘মহাগৌরী’ -সন্ত তুলসীদাস এই দেবীর উপাসনা করতেন। এই দিন সাধকের সাধনা ‘সন্ধিচক্র’-এ অধিষ্ঠিত হয়। নবদুর্গার শেষ রূপটি হল ‘সিদ্ধিদাত্রী’। ‘মার্কণ্ডেয়পুরাণে’-এ ‘সিদ্ধিদাত্রী’ অষ্টভুজা, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে ‘সিদ্ধিদাত্রী’অষ্টাদশভুজা। ‘সিদ্ধিদাত্রী’চতুর্ভুজা রূপেও দেখা যায়। সেখানে তিনি অর্ধনারীশ্বররূপী। এই হল দেবী দুর্গার নানা রূপের চর্চিত কাহিনি।

উৎস: " শ্রী দেবী ভাগবত" মার্কণ্ডেয় পুরাণ; উইকিপিডিয়া।

আমি একটি ছোট মেয়ে। আমি ঢাকাতেই থাকি। আমাদের গ্রামের বাড়ি খালিয়া, টেকেরহাট, রাজৈর। সেখানে ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, কাকারা থাকেন। তাই প্রতি দুর্গাপূজাতে আমরা সকলে বাড়ীতে চলে যাই অনেক অনেক আনন্দ করতে। তাছাড়া আমাদের বাড়িতে

দুর্গাপূজার স্মরণী কথা

শৈলী কর্মকার

কালীপূজা হয় নিজেদের মন্দিরে। তাই তো যেতেই হয় কালীপূজা করতে। তাছাড়া আমি এ ঘরের প্রথম মেয়ে তাই ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, কাকা-কাকীসহ সকলে আমাকে বেশী ভালোবাসে এবং আদর করেন। আরও কয়েকজন আছেন, যাহারা আমাকে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসে এবং আদর করেন। তাদের কাছে আমি অনেক বেশী বেশী প্রিয়। তারা হলেন আমার এক মাত্র পিসি, পিপি (মানে পিসামহাশয়) এবং আমাদের আদরের বড়বোন দীপান্বিতা দিদি। দিদি আমার চেয়ে অনেক বড়। হলিক্রস কলেজ থেকে এইচ, এস, সি জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে। কিন্তু আমাদের সাথে ভীষণ মিল, মাঝে মাঝে মনেই হয় না- দিদি আর আমি অনেক বড়-ছোট। আমরা সব সময় একসাথে থাকি, সব কথা ভাগা-ভাগি করি ও আনন্দ করি। আবার মাঝে মাঝে অনেক রাগা-রাগি, মারা-মারিও করে থাকি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা দিদি আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। প্রতিরাতে আমরা একসাথে ২ জনে ঘুমাই। মাঝে মাঝে আমার নিজের বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করি যে – দিদি তো অনেক অনেক ভাল ছাত্রী, লেখা-পড়ায় বেশ ভাল, আমি কি দিদির মত হতে পারবো ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে হ্যাঁ, আমি দিদির মত বড় হবো। তবে জানো দিদি ডাক্তার হতে চায় মানুষের সেবা করার জন্য। আমি ডাক্তার হবো না, কেন যেন আমার ভালো লাগে না। তবে হ্যাঁ, আমি ইঞ্জিনিয়ার বা পুলিশের অনেক বড় ব্যক্তি হতে চাই। তোমরা কিন্তু সকলে আমাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করবে–ভুলে যাবে না কিন্তু। তার সাথে সাথে আমার দিদিকেও আশীর্বাদ করো। দিদি যেন অনেক বড় ডাক্তার হতে পারে এবং তোমাদের সহ আমাদের সকলের সেবা করতে পারে। বাড়ীতে গেলে বেশ ভালোই লাগে। চারিদিকে গাছপাল ও বড় বড় মাঠ। বাড়ীতে গেলে এক দৌড়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যাই। সারাদিন শুধু খেলা আর খেলা কোথাও বাধা নেই। মাঝে মাঝে ঠাকুরদাদা, রাগ করেন দুষ্টুমীর জন্য। কারণ তো বুঝতে পারনি প্রথমে, তাই না? তবে বলছি শোন, খেলার জন্য ঠিকভাবে খাওয়া-দাওয়া, স্নান ও পড়াশোনা করিনা তো! তাই বলে রাগ করে। তবে হ্যাঁ, গ্রামের সকলে ভীষণ ভালবাসে আমাদের, কত রকম খাওয়া-দাওয়া দেয়। কিন্তু আমি আবার একটু কম কম খাই তাই সকলে আমাকে একটু বকা-বকি করে। করুক কি হবে আনন্দ তো করছি সকলে তাই বল। এবারেও মনে হয় বাড়ীতে যাবো। ও আর একটা কথা তো ভুলেই গেছি। আমাদের ছোট একটি ভাই ও একটি ছোট বোন আছে। যমজ, ভীষণ দুষ্টু দু'জনে। ভাই রুদ্রনীল কর্মকার আর বোন ঈপশীতা কর্মকার। বয়স মাত্র ১৯ মাস। সারাদিন ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি করে। হাসে, মাঝে মাঝে আমার পড়াশোনায় বেশ ডিস্টাব করে। তবে বেশ ভাল লাগে ওদের সাথে যখন খেলাধুলা করি।

এখন গ্রামের বাড়ীর দুর্গাপূজার কথা বলছি। ঢাকা থেকে সকলে মিলে আনন্দ করতে করতে গেলাম গ্রামের বাড়ীতে। গ্রামের বাড়ী খালিয়াতে বেশী পূজা মন্ডপ নেই। বাড়ীর কাছে যেটা আছে সেখানে আমরা সকলে যাই। পূজায় অঞ্জলী দিতে হবে তাই রাতে সবকিছু ঠিক করা হল। সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেল-অঞ্জলী দিতে যাব তাই। তাড়াতাড়ি দিদিসহ আমি স্নান করলাম, নতুন জামা-কাপড় পরলাম, কিন্তু কিছুই খেলাম না। বাড়ীর বড়রা বলল, না খেয়ে অঞ্জলী দিতে হয়। আমার আর দিদির সবকিছুই তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে কিন্তু কি আর বলবো মা, পিসি, কাকীসহ সকলের আর কাজ শেষ হয় না, একটার পর একটা করেই যাচ্ছে। সময় যে চলে যাচ্ছে তার কোন খেয়াল নেই তাদের। তাছাড়া আমরা তো ছোট সকালে উপবাস আছি, খেতে হবে কিছুই বুঝে না তাঁরা। এভাবে করতে করতে ১০টার সময় পূজা মন্ডবে গেলাম সকলে মিলে। পূজা মন্ডবে অনেক লোক। সকলেই অঞ্জলী দিবে। কি আর করবো আস্তে আস্তে দুর্গামায়ের কাছে চলে গেলাম অঞ্জলী দিবার জন্য। তখন মায়েদের উপর যে কি রাগ লাগছিল বলতে পারবো না আর কি? অনেক সময় বসে থাকলাম। পরে অঞ্জলী আরম্ভ হল। অঞ্জলী শেষ হতে না হতেই আমার ভীষণভাবে খিদে পেয়ে গেল। কাহাকেও কিছু না বলে চুপি চুপি মন্ডপের পিছনে চলে গেলাম। আগেই দেখেছিলাম সেখানে অনেক প্রসাদ আছে। প্রাসাদ থেকে ১টি সন্দেশ, কিছু কলা হাতে তুলে নিলাম খাওয়ার জন্য। হঠাৎ করে তাঁকিয়ে দেখি আমার কাছে ২টি খালি গায়ে ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার প্রসাদের দিকে ডেব ডেব করে তাঁকিয়ে আছে। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমিও তো ছোট, ওদের মত, আমার যেমন খিদে পায় তেমনি ওদের তো পায়। আজ পূজার দিন ওদের গায়ে কোন নতুন জামা-কাপড় নেই। পুরানো প্যান্ট পরা মাত্র। আমি ছোট হলেও আমার মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল এবং খিদে কোথায় চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। আস্তে আস্তে ওদের কাছে গেলাম। বললাম তোমাদের নাম কি, কোথায় থাকো? নাম বলল, অরুণ আর রমা, এখানে থাকি। আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। তুমি খাচ্ছ আমাদের একটু দাও না? সকাল থেকে আমরা কিছু খাইনি। পরে আমার খাবার থেকে ২ জনকে কিছু কিছু দিলাম এবং বাকীটা আমি খেলাম। আমার যে কি ভালো লাগলো এক সাথে খেয়ে বলতে পারবো না। পরে বললাম- তোমাদের নতুন জামা-কাপড় নেই। বললো আমরা তো গরীব মানুষ তাই নতুন জামা কাপড় বাবা কিনতে পারেনি। পরে আমি ওদেরকে আমাদের সাথে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। ঘর থেকে লুচি, মিষ্টিসহ অন্যান্য প্রসাদ দিলাম খেতে। খেয়ে কিযে আনন্দিত হল ওরা, কি আর বলবো। পরে ওরা আমাদের সাথে অনেক সময় খেলাধূলা করলো। বেশ মজা হল আমাদের সকলের।

আমি ছোট হলেও সেই পূজার কথা আমার খুব মনে পড়ে, প্রতিবছর যখন দুর্গাপূজা আসে। বাড়ীতে যাই তখনই ওদের কথা মনে পড়ে, আর ভাবি ওরা কেমন আছে। আরো ভাবি যদি ওরা আসতো তা হলে মজা করে খেলতে পারতাম। আমি ছোট মেয়ে বলে তোমরা আবার বলো না মেয়েটি কি পাকা-পাকা কথা বলছে। আমাকে দিদি বেশ করে সাহায্যে করেছে। আমি তো তেমন গুছিয়ে লিখতে পারি না। শুধু মুখে বলতে পারি। তাই আমি মুখে মুখে বলেছি দিদি আমাকে গুছিয়ে লিখে দিয়েছে। দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমরা সকলে আমাকে আশির্বাদ করবে। আমি যেন এর পরে নিজে নিজে লিখতে পারি তোমাদের সকলের জন্য। সকলকে আমার প্রণাম ও ভালোবাসা।

EASTLAND INSURANCE CO., LTD.

The name you have learnt to Trust

Yet another feather in the Cap

CRISL has upgraded AA+
Credit Rating to Eastland

Awarded **Best Corporate Award**
by ICMAB for 4 consecutive years 2012-2015

Awarded **Certificate of Merit** by ICAB
for Best Presented Annual Report 2013

Eastland Insurance started its journey as one of the first generation Non-Life Insurance Companies in the private sector from 5th of November, 1986. The present **Authorized Capital of the Co. is Tk. 1000** million and the **Paid-up Capital is Tk. 739** million, **Total Asset is Tk. 2520** million, **Total Reserve Fund is Tk. 971** million and **Total Investment Portfolio is Tk. 926** million. The **Total Claims settled so far is Tk. 2566** million. Eastland has been paying 'Double Digit' dividends to its shareholders ever since its inception including stock bonus in recent years.

Eastland offers a comprehensive range of insurance packages from its 28 branches throughout Bangladesh, which includes **Fire, Marine, Hull, Motor, Industrial All Risk, Engineering, Aviation, Personal Accident, contractors' All Risks (CAR), Overseas Mediclaim Scheme and Miscellaneous Risks.** Eastland has the credit of being insurer to a host of clients ranging from distinguished individuals to big trading firms, Banks and Financial Institutions as well as large national and multi national companies.

The Company is living up to its promised slogan: *The name you have learnt to Trust* by upholding its personalized services in both Sunny & Rainy days! As such, Eastland's name has been embedded in the hearts of thousands of their clients.

Eastland- Committed to Excellence.

EASTLAND INSURANCE COMPANY LIMITED
ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
ESTD.1986

Head Office: 13 Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 9564600 (Hunting), Fax: 9565706, 9554569, E-mail: info@eastlandinsurance.com
www.eastlandinsurance.com

সংগঠন ও নানা কথা

এড. বিনয় চন্দ্র

পরিবার মানুষের মৌলিক ও আদিম সংগঠন। প্রতিটি মানুষ কোন না কোন সংগঠনের সাথে জড়িত থাকে। কারণ একা একা যেমন বাস করা যায় না, তেমনি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ততা অতিব দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজে সামাজিক জীব হিসাবে কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত একটা সামাজিক দায়িত্ব। আর মানুষের তার ব্যক্তি, সামাজিক মর্যাদা সহ অনেক প্রকার দায়িত্ব যখন নিজের মধ্যে চলে আসে তখন তিনি একাধিক সংগঠনের মধ্যে যুক্ত হতে বাধ্য হন। কখনও কখনো অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুক্ত হতে হয়, নিজের এবং সামাজিক প্রয়োজনে। কথায় বলে না- একা আর বোকা সমান। তাই মানুষ জীবিকা, সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তি ইত্যাদির কারনে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকেন। যদি কেহ চিন্তা করেন কি দরকার বেশী বেশী মানুষের সাথে মেলামেশা করা, অতিরিক্ত দায়িত্ব কাঁধে নেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবনের কোন এক সময় তিনি নিজে বুঝতে পারবেন যে কত বড় ভুল করেছি আমি। পৃথিবীতে যেমন একা একা বাস করা যায় না। তেমনি জীবনের, পরিবারের প্রয়োজন সমাজবদ্ধতা একটি গুরুত্বপূর্ন দরকারী বিষয়। আমার জীবন থেকেই আমি অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারি এবং পেরেছি। আমার এ সামান্য জীবনে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত আছি। নিজের জীবন থেকে বুঝতে পারলাম সংগঠন কত বেশী প্রয়োজন। তাছাড়া আমি পেশায় একজন উকিল, বুঝতেই তো পারছেন উকিল মানেই মানুষদের নিয়ে চলাফেরা করা। আর মানুষের সাথে থাকার আনন্দটাই অন্য রকম শান্তি। আমি মনে করি মানুষের সাথে থাকা মানে স্রষ্টার সাথে থাকা আর স্রষ্টার সাথে থাকা মানেই মানব জনমের আর একটা সার্থকতা আছে সেটা হয় সৃষ্টির সেবা, মানব হিসাবে সমগ্র সৃষ্টির সেবা করা এবং একজন সামাজিক জীব হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজ আর একা একা লাগে না পৃথিবীতে। বাহিরে বের হলে মনে হয় যেন-আমি তো অনেকের সাথে আছি। যখন কেহ পেছন থেকে আমাকে ডাক দেন এবং বিভিন্ন বিষয় খোঁজ-খবর নেন তখন নিজেকে বেশ মানুষ মানুষ মনে হয়। আমি আসলেই পৃথিবীর প্রধান জীবের একজন। আলোর পেছনে যেমন অন্ধকার থাকে তেমনি অন্ধকারের পেছনে আলো থাকে। এটা বলছি কারণ-সংগঠন যেমন পথ চলতে সাহায্য করে আবার অনেক সময় পথকে বন্ধ করেও দেয়। সংগঠন করতে গেলে-বিশেষ প্রয়োজন অর্থের। কথায় বলে না গড়হবু রং ঃযব ঝবপড়হফ এড়ফ. আসলে তাই, অর্থ সংগঠনের শক্তি যোগায়। তারপরে আপনি যদি সংগঠনে ভালভাবে মিলেমিশে থাকতে চান- সে ক্ষেত্রে আপনাকে সকল স্তরে সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। যদি সমানভাবে অংশগ্রহণ না করতে পারেন, দেখবেন আপনার স্থানটি একটু নড়বড়ে হয়ে গেছে এবং আপনার সংগঠনের উপস্থিতি সামাজিক মর্যাদা টুকুন একটু একটু করে হেয় প্রতিপন্ন হতে চলেছে। অর্থ ছাড়া অন্যটা হল-"সময়" সময় বড় প্রয়োজন। প্রতিটি সংগঠনকে সময় দিতে হবে এবং সংগঠনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আপনাকে সংগঠনের নিয়ম নীতি মেলে চলতে হবে। কিন্তু অনেক সময় বাধ সাধে যায় পারিবারিক কাজ ও পেশার কাজের জন্য। তবুও আমরা চেষ্টা করি সবকিছু সঠিক রাখতে। তবে এটা ধ্রব সত্য যে জীবনে পরিবার এবং পেশা প্রধান। পরিবার, পেশা, অর্থ ইত্যাদি সঠিকভাবে থাকলে আপনার সামান্য বুদ্ধি দিয়ে সামনের দিকে এগুতো পারবেন। যেটা আমার জীবন থেকেই উপলব্ধি করছি। অনেক বড় বড় কথা হল এখন সংগঠন বিষয় আমার সামান্য কিছু কথা :-

১। সংগঠন অর্থ সং-অর্থ সংগ এবং গঠন অর্থ মজবুত অর্থাৎ গঠন অর্থ সীমাহীন লোকের একত্রে পরিচালিত হওয়া, সংগঠন অন্যকে ভালবাসা। সংগঠন মানে সমগ্র সৃষ্টিকে ভালবাসা।

২। সংগঠন অর্থ জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্রের উন্নয়ন ও শান্তি কামনা করা এবং সকলকে সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া, সমগ্র সৃষ্টিকে ভালবাসতে পারলেই সংগঠনের স্বার্থকতার প্রতিফলন ঘটে।

৩। সংগঠন অর্থ সকল জীবজন্তু তথা সৃষ্টিকে ভালোবাসা। সুহৃদ হল তারই একটি মাইল ফলক মাত্র।

চিন্তা করেন আমি একজন ভাল মানুষ, সেটা প্রথমে আমার পরিবার থেকে আমাকে আসতে হবে। আমার পরিবার পরিজন যখন ভাল বলবে তখন আমার প্রতিবেশী ভালো বলবে, পরে বলবে গ্রাম, পাড়া, মহল্লা, ইউনিয়ন, থানা, জেলা, তথা বিশ্বের সমগ্র মানবজাতী। সংকীর্নতা দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না। তাই আসুন আমরা সকলে সংকীর্নতার উর্ধ্বে উঠে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত জীবনালিঙ্গন এবং মহত্ব বিনিময় করা। এতে গোটা বিশ্বে শান্তির প্রতিফলন ঘটবে।

৪। দেখুন আপনি যদি কারও নিকট থেকে সম্মান পেতে চান তবে আপনাকে আগে ঐ ব্যক্তিকে সম্মান করতে হবে, তখন অন্যের নিকট থেকে সম্মান পাবেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির সেরা হচ্ছে মানুষ আমি একজন সৃষ্টির সেরা হয়েও কেন আমার সকল কাজেই সেরা হবে? এইটা কি প্রত্যেকের কাম্য হতে পারে। একজন মানুষ ইচ্ছা করলেই সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু করতে পারে। সেইদিক থেকে প্রথমে বলতে হয় "দৃষ্টিভংগী বদলান জীবন বদলে যাবে"। মনে রাখতে হবে আমার কৃতকর্মই আমার পরবর্তী জেনারেশন বহন করবে। সুতরাং আমাদের সঠিক ভাবে জীবন অতিবাহিত করা প্রয়োজন। প্রথমে আপনাকে স্রষ্টাকেই ডাকতে হবে নইলে আপনি তার করুনা বা কৃপা পাবেন না। আসুন আমরা সবাই সবাইকে ভাল জানি, ভালবাসি এই মূল মন্ত্র গ্রহণ করি। সেই দিক থেকে "সুহৃদ" দীর্ঘ জীবী-হোক ঈশ্বর তার সকল সৃষ্টিকে সুন্দর রাখুক এই প্রার্থনা। যে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালবাসে স্রষ্টা তাকে ভালবাসে। আর এমন মহৎ ব্যক্তির দ্বারাই ভালকাজ সম্ভব, সৃষ্টির সেবা করা সম্ভব, সৃষ্টিকে সুসংঘঠিত করা সম্ভব, "সুহৃদ বাংলাদেশ" এটাই চায়। সংগঠন সকলের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করতে চায়। মহান স্রষ্টার একটা স্বরূপ "মা দূর্গা" তিনি সৃষ্টির দুর্গতি নাশ করার জন্যে আবির্ভাব হন। তাই দূর্গতি নাশিনী সমাজের অশুর গ্রাস করে সাধু সৎজনকে প্রতিষ্ঠা করে। এজন্যেই মা দুর্গার আবির্ভাব। মা দূর্গা যুগে যুগে আবির্ভাব হওয়া মানব জাতি তথা সমগ্রই সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য তার আবির্ভাব। সেই দিক থেকে মায়ের প্রনাম মন্ত্রে বলা হয়েছে। "সব মঙ্গল মঙ্গাল্লে শিবে সর্বাত্মক সাধিকে শরন্নে ত্রাম্বকে গৌরী নারায়নী নমস্তুতে।"

শুধুমাত্র ফ্রেশ সিমেন্টেই নির্মিত হচ্ছে
দ্বিতীয় মেঘনা, কাঁচপুর ও গোমতি–
তিন তিনটি ব্রিজ
ফ্রেশ
ফাউন্ডেশন ◀ স্ট্রাকচার ▶
● সর্বাধুনিক জার্মান পলিকম টেকনোলজিতে প্রস্তুত
● সব টেস্টে ধারাবাহিকভাবে সেরা পারফরমেন্স
● সর্বোন্নত কাঁচামাল ব্যবহারে সেরা গুণগত মান
জাগছে বাংলাদেশ
অর্থ-বাণিজ্যে আরো গতি, বিশাল সব স্থাপনা আর নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন নিয়ে নির্মিত হচ্ছে
আগামীর বাংলাদেশ। সেই কর্মযজ্ঞে আমরাও এক গুরুদায়িত্বের অংশীদার।
দেশ ও দেশবাসীর এতটা আস্থা অর্জনে আমরা সত্যিই গর্বিত।
Fresh CEMENT
HIGH PERFORMANCE CEMENT
MGI
Meghna Group of Industries

ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎকার

প্রমোদ রঞ্জন রায়

ঈশ্বর-অবিশ্বাসী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। কেমন ছিল দুই কিংবদন্তির সাক্ষাৎ? জানতে ফিরে যেতে হবে ১৩৩ বছর আগে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। তিনি ষড়দর্শন পাঠ করেছেন। জানতে চেয়েছেন ঈশ্বরকে। আর এইটুকু বুঝতে পেরেছেন যে, ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকালেন বিদ্যাসাগরের দিকে। যেন বুঝতে পারলেন বিদ্যাসাগরের মনের কথা। বললেন, ব্রহ্মবিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত। মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগর শুনছেন মুগ্ধ বিস্ময়ে। বলে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ -এই জগতে বিদ্যামায়া-অবিদ্যামায়া দুই আছে। জ্ঞান-ভক্তি আছে। আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে। সৎ-ও আছে। আবার অসৎ-ও আছে। ভাল আছে। আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ জীবের পক্ষে। সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে। ব্রহ্মের ওতে কিছু হয় না। বিদ্যাসাগর বললেন, কটু ব্যাখ্যা করে, আরও সহজ করে বুঝিয়ে দিন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ সরল হাসি হেসে বললেন, প্রদীপ যেমন নির্লিপ্ত; ব্রহ্মও সেইরকম। প্রদীপের সামনে কেউ ভাগবত পড়ছে আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপের তাতে কিছু যায় আসে না। কোনও কাজটির সঙ্গেই প্রদীপ যুক্ত হচ্ছে না। সে নির্লিপ্তভাবে শুধু জ্বলছে। যদি বলো দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কী? তার উত্তর এই যে ওসব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। যেমন ধরো সাপের মধ্যে বিষ আছে। অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না। বিদ্যাসাগরের মুখে রা নেই। তিনি ক্রমে বুঝতে পারছেন, এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের মুখে বেদান্ত কী সহজ সরল ভাষায় উচ্চারিত হচ্ছে! শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ব্রহ্ম যে কী মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব এঁটো। থামলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাকালেন বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে। বিস্মিত বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন, এঁটো কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে উত্তর দিলেন, মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে, তাই এঁটো হয়ে গেছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয়নি গো! সেই জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কী, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। আবেগে কাঁপছে তাঁর শরীর। শ্রীরামকৃষ্ণ বয়সে অনেক ছোট, তবু বিদ্যাসাগরের ইচ্ছে হল তাঁর কাছে নতজানু হওয়ার। তিনি শুধু কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আজ একটি নতুন কথা শিখলাম। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হননি। ঘরে তখন অনেক মানুষের ভিড় হয়ে গেছে। সবাই শুনছে ঠাকুরের কথা। কী সহজ কী প্রাণস্পর্শী কী গভীর। ঠাকুর কী অনায়াসে আড়াল সরিয়ে দিচ্ছেন। ফুটে উঠছে নতুন আলো। জাগ্রত হচ্ছে নব চেতনা। উদ্ঘাটিত হচ্ছে সত্যের মুখ। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, এবার একটা গল্প বলছি, শোনো। এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্যে ছেলে দুটোকে বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বছর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল। এসে বাপকে প্রণাম করলে বাপের এবার ইচ্ছে হল, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কেমন হয়েছে একটু বাজিয়ে দেখবার। বড় ছেলেকে জিগ্যেস করলেন, বাপ ! তুমি তো সব পড়েছো। ব্রহ্ম কীরূপ বলো দেখি। বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে লাগল। বাপ শুনলেন। কোনও কথা বললেন না। বড় ছেলে বাপের মনের ভাব বুঝতে পারল না। এবার ছোট ছেলেকে বললেন, তুমি বলো দেখি ব্রহ্মের কী রূপ? ছোট ছেলের মুখে কোনও কথা নেই। সে হেঁট মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল। বাপ প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, বাপ, তুমি একটু বুঝেছো। ব্রহ্ম যে কী তা মুখে বলা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ থামলেন। তিনি জানেন, সাধারণ মানুষকে তাঁর কথার মর্ম বুঝতে একটু সময় দিতে হয়। তারপর তাঁর গল্পের সূত্রটি ধরেই বললেন, মানুষ মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। কিন্তু সত্যি কি জানা যায়? জানা গেলেও কতটুকুই বা জানা যায় তাঁকে? বিদ্যাসাগর নিবিষ্ট হয়ে শুনছেন। আর অপলক তাকিয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে। আর কারও কথা শুনে কখনও এমন ঘোর লাগেনি তাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন, আর একটা গল্প বলছি শোনো। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গেলো। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আর এক দানা মুখে করে সে বাসার পথে চলেছে। যাবার সময় ভাবল, এবার এসে সব পাহাড়টা নিয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এইসব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত! যে যতই বড় হোক না কেন, তাঁকে জানা যায় না। বিদ্যাসাগর হঠাৎ বলে ফেললেন, কেন শুকদেব? তিনি তো . . . শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, শুকদেবাদি না হয় ডেঁও পিঁপড়ে। চিনির আট-নটা দানা না হয় মুখে করেছে। তার বেশি নয়। ঘরে এত মানুষ। তবু পিন পড়লে শব্দ পাওয়া যাবে। রোজ কত পণ্ডিত মানুষের আসা-যাওয়া বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। কিন্তু এমন জীবন্ত বেদান্ত কখনও দেখিনি! শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনছেন আর ভাবছেন বিদ্যাসাগর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে, সে কী রকম বলা জানো? বিদ্যাসাগর বুঝলেন, ঘরের মধ্যে আর কেউ না বুঝুক তিনি অন্তত ধারণা করতে পারলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হতে চলেছে বেদ ও পুরাণ! তিনি উদগ্রীব হয়ে শুনছেন। ঠাকুর বললেন, একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিগ্যেস করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে, -ও ! কী দেখলুম ! কী হিল্লোল, কল্লোল। ব্রহ্মের কথাও সেই রকম। বেদে আছে তিনি আনন্দস্বরূপ। সচ্চিদানন্দ। বিস্মিত বিদ্যাসাগর। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ পড়েছেন! তিনি তো নিরক্ষর। বিদ্যাসাগর কী ভাবছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বুঝতে পারলেন। বললেন, শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর-তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন মাত্র। তাঁরা কিন্তু ব্রহ্মসাগরে নামেননি। এ সাগরে নামলে আর ফেরবার জো নেই গো। ঠাকুরের কথায় চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। এতো একেবারে নতুন কথা। অথচ কী অবলীলায় কথাটি বললেন পরমহংস ! বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন তাহলে ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান হওয়ার উপায়? ঠাকুর উত্তর দিলেন সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। সেই অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কী বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটা গল্প বললেন নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেছিলো। কত গভীর জল সেই খবরটা সে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু খবর দেওয়া আর হল না। যেই নামল জলে

অমনি গেল গলে। কে আর খবর দেবে? একজন প্রশ্ন করলেন, সমাধিস্থ ব্যক্তি যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কী আর কথা কন না? বিদ্যাসাগরকে চমকে দিল ঠাকুরের বিদ্যুতের মতো উত্তর শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। বিদ্যাসাগর এই কথার গভীর অর্থটুকু বুঝতে পারলেন। আপাত অশিক্ষিত একটি মানুষের জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখে তিনি স্তম্ভিত ! শ্রীরামকৃষ্ণ এবার আরও সহজ করে তাঁর বক্তব্যের সারাৎসার তুলে ধরলেন - ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার তেমনি সমাধিত পুরুষ -লোকশিক্ষা দেবার জন্য আবার নেমে আসে আবার কথা কয়। বিদ্যাসাগরের চোখে একইসঙ্গে ফুটে ওঠে মুগ্ধতা আর শ্রদ্ধা।

তাঁর মন বলে ওঠে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সেই পুরুষ তো তুমি নিজে। সমাধিস্থ হয়েও লোকশিক্ষার জন্য নেমে এসেছো, কথা বলছো! শ্রীরামকৃষ্ণ এবার ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বরূপ অন্যভাবে ফুটিয়ে তোলেন - যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করে মাতাল হবার পরে আবার কখনও-কখনও গুনগুন করে। পুকুরে কলসিতে জল ভরার সময় ভকভক শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ নেই। তবে আর এক কলসিতে যদি ঢালাঢালি হয় তাহলে আবার শব্দ হয়। একজন হঠাৎ বললেন, ঋষিদের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ হয়েছিল। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা দেখা-শোনা-ছোঁয়া এসবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখত। সমস্ত দিন ধ্যান করে কাটত। তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করত। এবার সরাসরি বিদ্যাসাগরের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ। দেহ বৃদ্ধি যায় না। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, তাদের 'আমি' কোনও ভাবে যায় না। তাদের বরং 'আমি ব্রহ্ম' না বলে বলা উচিত আমি ভক্ত আমি দাস। এ অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরকে যেন সরাসরি বলছেন ঠাকুর-জ্ঞানীর পথও পথ। আবার জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য। ভক্তির পথও সত্য। সব পথ দিয়েই তাঁর কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ তিনি 'আমি' রেখেছেন আমাদের মধ্যে ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা। শ্রীরামকৃষ্ণ এবার যেন শুধু বিদ্যাসাগরকেই দেখছেন। তিনি এই মহাপণ্ডিতকে বললেন্ বিজ্ঞানী কী বলে? বিজ্ঞানী বলে যিনি ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্রহ্ম নির্গুণ। তিনি গুণাতীত। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। এই জীবজগৎ, মন বুদ্ধি বৈরাগ্য, জ্ঞান, এসব তাঁর ঐশ্বর্য। দেখো না এই জগৎ কী চমৎকার। কত রকম জিনিস চন্দ্র, সূয, নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড় ছোট ভালমন্দ কারু বেশি শক্তি, কারু কম শক্তি। ব্রহ্মই ভগবান হয়েছেন। যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। যিনি নির্গুণ তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। বিদ্যাসাগর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন তিনিই কি কাউকে বেশি শক্তি, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন? উত্তর দিলেন পরমহংস-তিনি বিভুরূপে সর্ব ভূতে আছেন। বিভু মানেই তো পরমেশ্বর। আবার বিভু মানে সর্বব্যাপী।

পিঁপড়ের মধ্যেও তিনি আছেন। আবার বিরাট পাহাড়ও তারই প্রকাশ। সর্বত্র তিনি। কিন্তু শক্তির তারতম্য তো আছেই। ঠাকুর এবার বিদ্যাসাগরকেই বললেন-এই যেমন তুমি। তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? তোমাকে মানে তার কারণ তোমার দয়া, তোমার বিদ্যে আছে অন্যের চেয়ে অনেক বেশি। তুমি একথা মানো কি না? বিদ্যাসাগর লজ্জা পেলেন। তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বললেন-একঘর লোকের সামনে বিদ্যাসাগরকে একথা বলার সাহস কারও হত না ঠাকুর বললেন শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। মনে রেখো, তাঁকে জানবার জন্যেই বই পড়া। তাঁকে জানাই একমাত্র জানা। তাঁকে জানাই সব জানা আর সব অবিদ্যা। এবার প্রশ্ন করলেন বিদ্যাসাগরকে, গীতার অর্থ কী? কী বলবেন বিদ্যাসাগর? গীতার অর্থ এককথায় বলা যায়? চুপ করে থাকলেন বিদ্যাসাগর। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, গীতার অর্থ দশবার 'গীতা' বলতে যা হয় তাই। দশবার 'গীতা' বলতে গেলে ত্যাগী হয়ে যায়। গীতার শিক্ষা হল, হে জীব সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করার চেষ্টা করো। সাধুই হও, আর সংসারী হও, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। এবার বিদ্যাসাগরের দিকে তাকালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঘরে যেন আর কেউ নেই। বললেন অনেক পড়লেই কিছু হয় না গো। অন্তরের কথাটি বুঝতে হবে। শুধু পাণ্ডিত্য নয়। ভক্তি চাই। তাঁকে ভালবাসতে হবে। তোমাকে একটা গল্প বলছি। গল্পটা বুঝতে পারলে সব হবে। চৈতন্যদেব তখন দক্ষিণে তীর্থভ্রমণ করছিলেন। দেখলেন একজন গীতা পড়ছে আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে আর কাঁদছে। কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিগ্যেস করলেন, তুমি এসব বুঝতে পারছো? সে বললে, ঠাকুর, আমি এসব শ্লোক কিছুই বুঝতে পারছি না। চৈতন্যদেব জিগ্যেস করলেন তবে কাঁদছো কেন? ভক্তটি তখন বললে, আমি দেখেছি অর্জুনের রথ। আর তাঁর সামনে কৃষ্ণ। আর অর্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি। বিদ্যাসাগরের বুকের শিরায় টান ধরল। তাঁর চোখ ভরে এল জলে। মন ভরে গেল গভীর কৃতজ্ঞতায়। নতুন চেতনায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি !

বিদ্যাসাগরকে বলতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে মনে বিদ্যাসাগর নতজানু করজোড়। শুনছেন তিনি। নিষ্কম্প শিখার মতো। ঠাকুর বলতে লাগলেন, তাঁকে কি শুকনো পাণ্ডিত্য দিয়ে বিচার করে জানা যায় গো? তাঁর দাস হয়ে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাকো। মনে রেখো, 'আমি' ও 'আমার', এই দুটি অজ্ঞান। আমার বাড়ি, আমার টাকা আমার বিদ্যা আমার এইসব ঐশ্বর্য এই যে ভাব, এটি অজ্ঞান থেকে হয়। আর যদি ভাবো হে ঈশ্বরও, তুমিই কর্তা, এসব জিনিস তোমার, টাকাকড়ি আমার বিদ্যা, আমার ঐশ্বর্য, আমার পরিবার, সব কিছুই তোমার,আমার বলতে কিছুই নেই-এই ভাব জ্ঞান থেকে হয়। বিদ্যাসাগর, তোমার কোন ভাব গো? হঠাৎ জানতে চাইলেন ঠাকুর। বিদ্যাসাগর কিছুটা অপ্রস্তুত। খুব মৃদু স্বরে বললেন-আপনাকে সেকথা একলা একদিন বলব। ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে এবার তাঁর অন্তর কথা, তাঁর নিজস্ব ভাবটি বলার জন্য গান ধরলেন-কে জানে কালী কেমন? ষড়দর্শনে না পায় দরশন। মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন। কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসী রূপে করে রমণ। আত্মারাগের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন। তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন। মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন। মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম অন্য কে বা জানে তেমন। প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরন। আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন। গান শেষ করে শুধু একটি কথা বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ ষড়দর্শনে না পায় দর্শন-পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না গো। এরপর ঠাকুর কিছুক্ষণ সমাধিস্থ। চেতনায়

ফিরে এসে জিগ্যেস করলেন-কটা বাজে গো? বিদ্যাসাগর বললেন, রাত ৯টা। এবার যে উঠতে হবে। ফিরতে হবে সেই দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদায় দিতে মন চাইছে না বিদ্যাসাগরের। কেন তাঁর এমন হল? ঠাকুর লাবণ্যময় কণ্ঠে বিদ্যাসাগরকে বললেন, একবার বাগান দেখতে যেও। রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা। বিদ্যাসাগর-যাবো বৈ কি! আপনি এলেন আর আমি যাব না? শ্রীরামকৃষ্ণ -আমার কাছে ! ছি ছি ! বিদ্যাসাগর- সে কী ! এমন কথা বললেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)-আমরা জেলেডিঙ্গি। খালবিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু তুমি তো জাহাজ গো। কী জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। বিদ্যাসাগর চুপ। উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণই এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগরকে উদ্ধার করতে। বললেন, তবে এই সময়ে জাহাজও যেতে পারে। বিদ্যাসাগর ইঙ্গিতটি ধরতে পারলেন। হেসে বললেন, হ্যাঁ, এটা বর্ষাকাল বটে। মহেন্দ্র গুপ্ত টিপ্পনি কাটলেন, এতো নবান রাগের বর্ষা। নবানুরাগের সময় মান-অপমান বোধ থাকে না বটে। শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিমধ্যে উঠে পড়েছেন। তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। একজন ভক্তের হাত ধরে আছেন। বিদ্যাসাগর আগে আগে চলেছেন। বাতি হাতে পথ দেখাচ্ছেন তিনি। শ্রাবণকৃষ্ণা ষষ্ঠী। এখনও চাঁদ ওঠেনি। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। বাতাস ভিজে ভিজে, মিঠে। বাতাসে ভেজা ঘাস-পাতা-মাটির সুবাস। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্যে দিয়ে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বাতির ক্ষীণালোক বহন করে ফটকের সামনে বিদ্যাসাগর। শ্রীরামকৃষ্ণ ফটকে পৌঁছতেই সামনে এসে দাঁড়াল এক গৌরবর্ণ, শ্মশ্রুধারী, বাঙালি পোশাক-পরা যুবক। যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করল। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, বলরাম ! তুমি এখানে এত রাতে? বলরাম-আমি অনেকক্ষণ এসেছি। এখানেই দাঁড়িয়েছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ- ভেতরে যাওনি কেন? বলরাম-আজ্ঞে, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন , সেখানে গিয়ে বিরক্ত করিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ এবার তার ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে পড়লেন। বিদ্যাসাগর প্রায় চুপি চুপি মহেন্দ্রকে জিগ্যেস করলেন, ভাড়া কি দেব? মহেন্দ্র বললেন- আজ্ঞে না। ও হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর ঘোড়ার গাড়ির দরজায় এগিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে বাতিটি ধরা। বাতির ক্ষীণালোকে ঠাকুরের মুখটি দেখলেন। তাঁর সমস্ত অন্তর লুটিয়ে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে এক দীর্ঘায়িত প্রণামে। শ্রীরামকৃষ্ণের গাড়ি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি থেকে। তিনি একা ঠাকুরের প্রস্থানের পথের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর মনে হল ভগবান এসেছিলেন। এক ঝলক দেখা দিয়ে চলে গেলেন। তারই আশীর্বাদ হয়ে যেন স্বর্গ থেকে নেমে এল ঝিরঝিরে বৃষ্টি ! বৃষ্টির জলে নিভে গেল বিদ্যাসাগরের হাতের বাতিটি। অন্ধকারে একা বিদ্যাসাগর। রামকৃষ্ণ-ধারায় কতদিন পরে এমনভাবে প্রাণ জুড়াচ্ছে তাঁর।

Heartiest wishes in the event of Durga Puja

With the best compliments from

mainstream
SHIPPING & LOGISTICS LTD.

International Freight Forwarder & Logistics Service provider

www.mainstream-bd.com

Corporate Office: House # 288 (3rd Floor), Road # 19/C, New DOHS, Mohakhali
Dhaka-1206, Bangladesh, Tel: +880 2 9859526, 8711714, Fax: +880 2 8711715

Branch Office: 11, Sk. Mujib Road, Chaity Plaza (4th Fl.), Agrabad C/A, Chittagong, Bangladesh
Email: keshab@mainstream-bd.com

Registered Office: 49, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

Heartiest wishes in the event of Durga Puja

With the best compliments from

Bushra international

Importer and Govt. Supplier

www.bushraintl.com

Corporate Office: House # 288 (2nd Floor), Road # 19/C, New DOHS, Mohakhali
Dhaka-1206, Bangladesh, Tel: +880 2 9859526, 8711714, Fax: +880 2 8711715
E-mail: info@bushraintl.com

Registered Office: 49, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

মানব জীবনে সাফল্যের নিগূঢ় রহস্য

প্রণব কুমার সাহা

প্রচণ্ড ইচ্ছাই একজন মানুষকে বড় করে তোলে। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের পেশা ও কর্মসংস্থানের ব্যাপ্তি রয়েছে। জীবনে সফল হতে হলে প্রথমে আপনাকে ভাল লাগার পেশা অথবা কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। মানুষের জীবনে সফলতার জন্য স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সেই স্বপ্ন সফল করার জন্য নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। বিশ্বাস (Faith) থাকলেই আস্থা (Confidence) তৈরি হবে। এই আস্থাই তাকে কর্মপন্থা (Strategy) তৈরি করতে সাহায্য করবে। ধীরে ধীরে সে তখন তার পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক গন্তব্য স্থলে পৌছাতে পারবে। জীবন একটি ভ্রমণ কাহিনী। এই ভ্রমণ করতে কখনও সফলতা, কখনও ব্যর্থতার মুখোমুখী হতে হয়। কিন্তু এই ভ্রমণ যাত্রায় সর্বদাই মানসিক শক্তি ও বিশ্বাস ধরে রাখতে হবে।

একটি শিশু এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সর্ব প্রথম সে তখন তার মাকে দেখে, তারপর সে তার বাবাকে দেখে। তারপর সে তার পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে দেখে। কথা বলা শেখে, হাঁটা শেখে। মা-বাবার হাত ধরে স্কুলে যায়। স্কুলে তার সহপাঠীদের সাথে আন্তসম্পর্ক গড়ে তোলে। এমনি করে সে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে তার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে থাকে। মনে রাখতে হবে, ঐ শিশু তার মা, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী, শিক্ষক যাদের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর মধ্যে দিয়ে নিজের একটি Value System I Power of Reasoning তার অন্তরে তৈরি হয়। জীবন, জগৎ সম্পর্কে তার একটি নিজস্ব চবৎপবঢ়ঃরড়হ তৈরি হয়। আমি যেটা বলতে চাই, সেটা হলো ঐ শিশুটির সফলতা আনার জন্য তার জীবনে একটি সঠিক Mentor বা পথ প্রদর্শক প্রয়োজন হয়। এই পথ প্রদর্শন এবং আর্থিক বুনিয়াদ যে শিশুর যতটা বেশি সেই শিশু ততটা বেশি সফলতার মুখ দেখতে পাবে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। এই পৃথিবীতে দেখা গেছে, অনেক শিশুই তার নিজস্ব মেধা-বুদ্ধির কারণে সে জীবনে ভাল স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। একসময় সে সমাজে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ ঐ শিশুর জীবনে স্বপ্ন দেখানোর যোগ্যতা সম্পন্ন একজন পথপ্রদর্শক (Mentor) এবং অর্থের যোগানদাতার খুবই প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, কোন কাজে একবার ব্যর্থ হলে সেই কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, একবার না পারিলে দেখ শতবার। অর্থাৎ একবার ব্যর্থ হলেই ঐ কাজ ফেলে চলে আসা যাবে না। এটা প্রমাণিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে যে, প্রথমবারে সফল না হলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে সে সফল হয়েছে। এর উদাহরণ আমাদের সমাজে ভুরি ভুরি রয়েছে। পরিশ্রম ছাড়া জীবনে কেউ কখনো সফল হতে পারে না। সুতরাং যে সফল হতে চায় তার মধ্যে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই এবং সেই ইচ্ছাশক্তির সাথে তার মানসিক শক্তি ও পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। আমাদের জীবনে চার ধরণের স্বাস্থ্য রয়েছে। যথা- দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য। অর্থাৎ তাকে এই চারটি স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যে খাবার প্রয়োজন তা তাকে দিতে হবে । তা না হলে তার স্বাস্থ্যের দুর্বলতার কারণে সফলতা কিছুটা হলেও ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে অসীম স্থিতিশক্তি (Potential Energy) লুকিয়ে থাকে। শুধু প্রয়োজন এই স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তি (Kinetic Energyt)-তে রূপান্তরিত করা।

আমি আগেই বলেছি, প্রত্যেকটা মানুষের তার পেশা ও কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভালবাসা (চধংংরড়হ) থাকতে হবে। সে যেন ঐ পেশা ও কর্মের মধ্যে নিজের মানসিক আনন্দ খুঁজে পায়। তাহলেই সে সেই পেশা ও কর্মের সফলতার চূড়ায় পৌঁছাতে পারবে। শুধু অর্থের জন্য কোন পেশা বা কর্মে নিয়োজিত থাকলে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তার পেশা বা কর্মের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। আমাদের সমাজে আমরা অনেকেই দেখি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে রসায়ন-এর মতো বিজ্ঞানের শাখা পড়লেও কর্মজীবনে সে হয়তো সাহিত্যে বা নাটক বা অন্য কোন সৃজনশীল কর্মে নিজের সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। ইংরেজিতে তিনটি অক্ষরের একটি ফর্মুলা আছে যাকে আমরা অঝক – Attitude, Skills and Knowledge A_©vr Zvi Attitude Aek¨B Positive/Can Do থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র Positive Attitude-সম্পন্ন মানুষকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার Skills I Knowledge কে সমৃদ্ধ করা যায়।

আমি Alfred Lord Tennyson-এর একটি উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। সেটা হলো– "Life is a continuous process of learning and knowing. Action is life and inaction is death." তাই জীবনের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে প্রত্যেককে সর্বদাই শেখার জন্য তার মনের দরজাটি উন্মুক্ত রাখা দরকার। অর্থাৎ তার Quick Learning Ability থাকতে হবে। আমরা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা-ই শিখে আসি সেটাই যে বাস্তবে সর্বদা প্রয়োগ হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। জীবনে সর্বদাই অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে পার হতে হয়। তাই সে-ই সফল হতে পারবে যার দ্রুত শেখার সামর্থ্য আছে। তাকে ভাষাজ্ঞান, Power of Reasoning I Quick Learning Ability থাকতে হবে। তবেই সে জীবনে সফল হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি বাণী না বললে আমার এ লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হলো– (সম্পর্কই জীবন) অর্থাৎ প্রত্যেককে তার পিতা-মাতা, পরিবারের সদস্য, সহপাঠী, সহকর্মী সবার সাথেই তার সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তা না হলে তার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে অর্থাৎ সফলতার জন্য তার প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে।

বাংলায় প্রবাদ আছে, বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। অর্থাৎ একজন মানুষ যে পরিবেশে বড় হয়, বড় হয়ে তার মধ্যে যে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ (ঠধষঁব ঝুংঃবস) তৈরি হয় সে তার মধ্যেই ভাল থাকে। তাই আমরা দেখি প্রবাস জীবনে ভালবাসাহীন পরিবেশে মানুষের আর্তনাদ আমাদের চোখে ধরা পড়ে। রামায়ণে ভগবান শ্রীরাম

বলেছেন, "জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।" তাই প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে তার জন্মভূমির ওপর যে অধিকার এবং ভালবাসা রয়েছে তার কোন বিকল্প নাই। আমাদের উচিত এই জন্মভূমিতে নিজেদের শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা। প্রয়োজনে পৃথিবীর উন্নত দেশ তথা ইউরোপ, আমেরিকায় আমরা যাব উচ্চশিক্ষা, ডিগ্রী ও প্রশিক্ষণের জন্য। কিন্তু শিক্ষা শেষে অবশ্যই নিজের দেশে ফিরে আসব। নিজের দেশে নিজের ধর্মবিশ্বাসের ওপর আস্থা রেখে মানুষের সাথে একত্রিত হয়ে সামাজিক সুখী জীবন গড়ে তুলব। বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও জাতীয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন তথা উৎসবে আমরা একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেব। আমরা দেশের সার্বিক উন্নয়নে এবং পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের মর্যাদা সম্পন্ন ভাবমূর্তি তুলে ধরতে একসাথে কাজ করব। বর্তমান সরকারের ২০২১ ও ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়ন তথা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার জন্য এক সাথে কাজ করব।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে একা বাঁচতে পারে না। তাকে সমাজের প্রত্যেকের সাথে সম্পর্ক রেখে এগিয়ে যেতে হবে এবং একতাবদ্ধভাবে চলতে হবে। তার সমমনা মানুষদের সাথে পারিবারিক বন্ধনে জড়িয়ে তার ভালবাসাময় বৃত্তের মধ্যে থাকতে হবে। তবেই সে জীবনের বাঁকে বাঁকে তার সহযাত্রী খুঁজে পাবে এবং জীবনে চলার আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

এ বছর সকলেই"মা দুর্গা" বিষয়ে অনেক কিছুই লিখেছেন। তাই আমি সে দিক নিয়ে না লিখে আমাদের প্রাণ প্রিয় ধর্ম "হিন্দু ধর্ম " বিষয়ে কিছু লিখছি।

হিন্দু শব্দটি উৎসারিত হয়েছে সংস্কৃত সিন্ধু শব্দটি থেকে। সিন্ধুনদ

esaote

Color Doppler Ultrasound Machine

Weight- bearing MRI

Digital Spirometer

Digital X-Ray Machine

Distributor
MEDISPEC USA
FONA ITALY
esaote ITALY
NUVO USA
Assing ITALY
ELCON GERMANY
MEDITECH INDIA
MIR ITALY

New Vision Medisystem

17/2 (3rd Floor), New Eskaton Road,
Moghbazar, Dhaka – 1000.
Phone No.: 02 48311483
Mobile No.: 01819281713, 01914983303.
E-mail : newvisionmed@gmail.com

হিন্দুধর্ম

সঞ্জীব কুমার সাহা

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক নাম। ঋগবেদে সিন্ধু নদের স্তুতি করা হয়েছে। পরবর্তীকালের আরবি সাহিত্যেও আল-হিন্দ শব্দটির মাধ্যমে সিন্ধু নদ অববাহিকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতের নামের সমার্থক শব্দ হিসেবে হিন্দুস্তান বা হিন্দুস্থান শব্দটির উৎপত্তি হয়। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ "হিন্দুদের দেশ"।

প্রথমদিকে হিন্দু শব্দটি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় উপমহাদেশের সকল অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কেবলমাত্র চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবত ইত্যাদি কয়েকটি ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে অন্যান্যদের কাছ থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পৃথক করার জন্য শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয় বণিক ও ঔপনিবেশিক শাসকেরা ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাসগুলির অনুগামীদের একত্রে হিন্দু নামে অভিহিত করে। ধীরে ধীরে এই শব্দটি আব্রাহামীয় ধর্মসমূহ অথবা অবৈদিক ধর্ম বিশ্বাসগুলির (যেমন জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও শিখধর্ম) অনুগামী নন এবং সনাতন ধর্ম নামক ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন সকল ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে পড়ে।

ইংরেজি ভাষাতে ভারতের স্থানীয় ধর্মীয়, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি বোঝাতে হিন্দুইজম বা হিন্দুধর্ম কথাটি চালু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে।

হিন্দু ধর্ম (সনাতনধর্ম) ভারতীয় উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক মতবাদ। হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ স্বীয় ধর্মমতকে সনাতন ধর্ম নামেও অভিহিত করেন। হিন্দুধর্মের সাধারণ "ধরনগুলির" মধ্যে লৌকিক ও বৈদিক হিন্দুধর্ম থেকে বৈষ্ণব ধর্মের অনুরূপ ভক্তিবাদী ধারার মতো একাধিক জটিল মতবাদগুলির সমন্বয়ের এক প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। যোগ, কর্মযোগ ধারণা ও হিন্দু বিবাহের মতো বিষয়গুলিও হিন্দুধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

হিন্দুধর্ম একাধিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গঠিত। এই ধর্মের কোনো একক প্রতিষ্ঠাতা নেই। লৌহযুগীয় ভারতের ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মে এই ধর্মের শিকড় নিবদ্ধ। হিন্দুধর্মকে বিশ্বের "প্রাচীনতম জীবিত ধর্মবিশ্বাস" বা "প্রাচীনতম জীবিত প্রধান মতবাদ" আখ্যা দেওয়া হয়।

হিন্দুধর্মকে বলা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। কারন এটি প্রাচীনযুগে আর্বিভূত হয়েছে। এবং ধর্মাবলম্বীরা একে সনাতন ধর্ম ("চিরন্তন নিয়ম বা চিরন্তন পথ") বলে আখ্যায়িত করেন। পশ্চিমা পন্ডিতরা হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ এবং সংশ্লেষণ হিসেবে গন্য করেন যার মূলে একক কোন ব্যক্তির অবদান নেই এবং এর একাধিক উৎপত্তির উৎস রয়েছে। এটি সনাতনি বা চিরন্তন কর্তব্যের কথা যেমন সততা, অহিংসা, ধৈর্যশীলতা, সমবেদনা ও আত্মনিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি আরো অনেক মানবিক উৎকর্ষজনক উপায়ের কথা বলে এবং বাহ্যিক আচার বিচারের থেকে পরম সত্যের জ্ঞানকে সর্বদাই মুখ্য স্থান দেয়।

হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আছে (কিন্তু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়)পুরুষার্থ, যা মানব জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য। এর মধ্যে আছে ধর্ম (নীতি), অর্থ, কাম এবং মোক্ষ যার অর্থ, জন্ম মৃত্যুর পুন: পুন: জন্ম (ইহলোকে বা স্বর্গাদি অন্যলোকে) থেকে মুক্তি; কর্ম (কাজ, অভিপ্রায়ও ফল); এবং বিভিন্ন ধরনের যোগ সাধনা (মোক্ষ লাভের পথ)। হিন্দুদের নিত্যকর্মে তালিকায় আছে পূজা, অর্চনা, ধ্যান, পারিবারিক সংস্কার, বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং তীর্থযাত্রা। কেউ কেউ সমাজ ও সভ্য জগতে ঐহিক সুখ ছেড়ে পারমার্থিক শান্তির আশায়ও মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহন করে।

জনসংখ্যার বিচারে হিন্দুধর্ম খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলামের পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মমত। এই ধর্মের অনুগামীদের সংখ্যা প্রায় ১৬৯ কোটি। এদের মধ্যে প্রায় ১২০ কোটি হিন্দুমতে বিশ্বাসী মানুষ বাস করেন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে। এছাড়া নেপাল (২,৩০,০০০০০), বাংলাদেশ (প্রায় ২,০০,০০০০০), মরিশাস (২৫০,০০০) ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপ বালিতে (৩০০,০০০) উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হিন্দুরা বাস করেন।

হিন্দুধর্মের শাস্ত্র গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর। হিন্দুশাস্ত্র শ্রুতি ও স্মৃতি নামে দুই ভাগে বিভক্ত। এই গ্রন্থগুলিতে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও পুরাণ আলোচিত হয়েছে এবং ধর্মানুশীলন সংক্রান্ত নানা তথ্য বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বেদ সর্বপ্রাচীন, সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য প্রধান ধর্ম গ্রন্থগুলি হল উপনিষদ্, পুরাণ, ও ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। ভগবদ্গীতা নামে পরিচিত মহাভারতের কৃষ্ণ-কথিত একটি অংশ বিশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে থাকে।

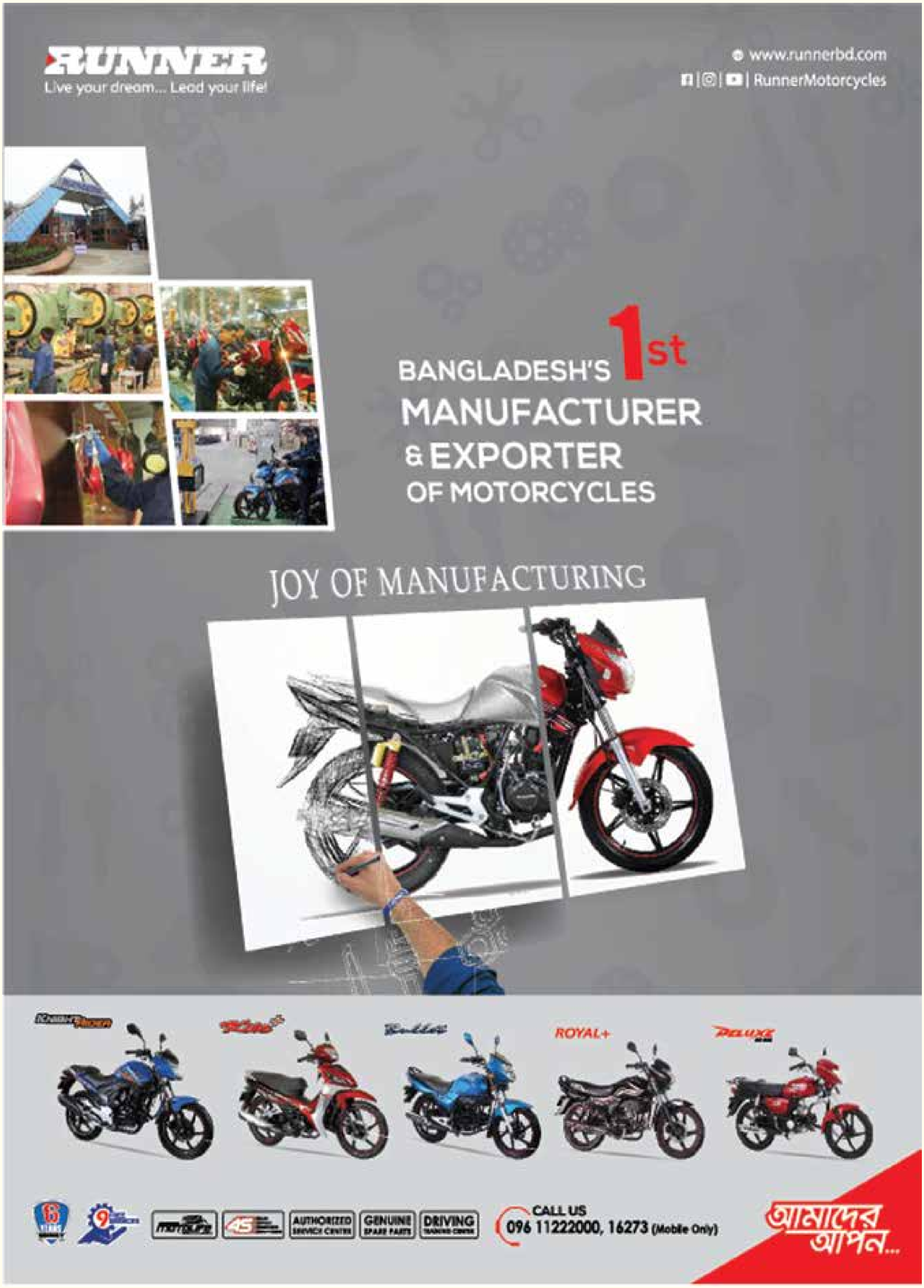
RUNNER
Live your dream... Lead your life!
www.runnerbd.com
RunnerMotorcycles
BANGLADESH'S 1st
MANUFACTURER
& EXPORTER
OF MOTORCYCLES
JOY OF MANUFACTURING
ROYAL+
AUTHORIZED SERVICE CENTRE
GENUINE SPARE PARTS
DRIVING
CALL US
096 11222000, 16273 (Mobile Only)
আমাদের আপন...

Positive and Negative Influence of Technology

Swami Sarvagananda

The word ‘technical’ is derived from the Greek technikos, of art, skilful; from French techne, art, craft, skill; akin to Greek tekton, builder, carpenter. It means having special and usually practical knowledge especially of mechanical or scientific subjects marked by, or characteristic of, specialization; relating to practical subject organized on scientific principle, or, of relating to technology.

1 Technology therefore means an applied science; or a technical method of achieving a practical purpose; totality of means, employed to provide objects necessary for human sustenance and comfort.

This is a very broad definition and will necessarily include such subjects as education and even yoga and spiritual science. Education technology is the applied science of education by which very important practical gains are achieved. Yoga is Ea practical science with wide application. Even spiritual practices are highly developed applied sciences or technologies.

The Word, technology, however, in the modern context, gained a specific connotation as? science technology? According to The Huntington Concise Dictionary of Sciences the word technology means,

The use of tools, power, and materials, generally for the purpose of production. Almost every human process forgetting food and shelter idepends on complex technological systems which have been developed :over a period of 3-million-years. Significant milestones include the advent of (1) steam engine in 1812, (2) the introduction of electricity and internal combustion engine in mid 1870s, and (3) recent developments in communication electronics, and the nuclear and space industries.

The Advanced technology (highly automated and specialized) on which modern Industrial society depends is frequently contrasted with the low technology (labour intensive unspecialized) that characterizes some developing countries. Intermediate technology is an attempt to adapt to scientifically advanced inventions to less developed areas by using local materials and methods of manufacture.

Technology, like any tool is value neutral. Sri Ramakrishna used to say: in front of the candle someone is reading the Bhagavatam while someone else is printing false currency notes, but the candle light is neutral.

Technology has become connected to every action in our life today. Starting from Big bang to Super computer,from catering to beauty parlour, from football to music - there is technology. Wherever you go,technology follows you. Now a days we are habituated to byteful music music digitalized!

Technology in Ancient India

It is told in the Chhandogya Upaqnishad : Yadeva vidyaya karoti shraddhayaupanishada tadeva viryavattaram bhavati. If you want to execute a fruitful job, you should do it vidyaya i.e. technically perfectly; shraddhaya i.e with full confidence and deep love for the work: and upartishada. with reliance upon the knowledge bestowed upon you through your preceptors. The wordvidya in Sanskrit means technology. be it music or meditation. engineering or surgery. agriculture or physiology. aerotech or astronomy. teaching or athletics. management or politics. child care or animal husbandry. education or religious rites - all are vidya only.

The author is a monk of the Ramakrishna Mission. This is an abridged and edited version of his talk delivered at the 30th annual conference of the All India Association for Educational Technology held at Coimbatore from 23-25 February, 2000.

In the Upanishads. Vidya. which we have equated with technology. was classified into two: para and apara. This was the answer given by the sage Angiras when he was asked: Kasminnu bhagavo vigyate sarvamidam vigyatam bhavati,3 ‘Knowing what every thing else is known? Thus, in ancient India, two technologies were developed: the technology of spiritual science to know the Ultimate Truth and the technology of applied. secular or material science for advancement in the mundane world. The Indian sages however laid great stress on the para vidya or the technology of spiritual science in the absence of which rest of the technological advancements would be like putting zeros one after the other. without the first numerical number.

The ancient Mimamsakas were giant technocrats. so were the Vedangis who cultivated Sikshza. Kalpa, Nirukta. Chhartda. Jyotish and Vvakararta. At the very outset of Taittiriya Upanishad. education is explained: We shall speak of the science of pronunciation. The things to be learnt arc the alphabet, accent. measure. emphasis. unifomtity, juxtaposition. Thus we find education technology was started as early as the Rig Vedir period. Add to it the social structure with four t-arnas viz. Brahmana. Kshatriya. Vaishya. Shudra. and four ashramas viz.. brahmacharya. householder. recluse and monk together comprising the 'Varnashrama Dharma, which is a technical device for the formation of an ideal society. congenial for the accomplishment of thc four purusharthas. dharma. arthn. kama and finally moksha.

The people of India in ancient times also had a sophisticated technology of science. They knew how to transplant heart: they knew how to change the sex of men

and women. Buddha's physician. Jeevak. was highly efficient in heart and kidney transplantation.

The incubation of the embryo of the Kauravas was done outside the womb. Implantation of a severed head on a body was a common affair being done in the case of Ganesh and Daksha. War technology was highly advanced with the development of extremely powerful and sophisticated missiles. These technologies were in most part used for the good of humanity. though there were also instances of their misuse.

Negative Influences of Science Technology

As we have already said technology is value neutral. It is neither positive nor negative. However, for a lover of science having technical wisdom. positive influences dominate. wherears for the general public who e ignorant about technical details. negative influences exist and sometimes become awfully harmful. For example. pranayama. a part of Raja Yoga, is a perfectly scientific technique which may prove dangerous if not practised under the guidance of an able preceptor. Again. laser beams are very useful. With the help of laser beams we operate the computers. Beautiful laser torches are used as pointers, but they may prove dangerous also. Recently a junior student got a laser torch from his parents. None of them knew anything about laser. The boy was very happy and looked at the beautiful red beam for a few seconds. Few hours later. he could not see well. The doctor said both his retinae were perforated.

Movies are powerful media for education and cultivation of values. But it is unfortunate that they propagate sex and violence. Computer technology today has captured the world in almost every walk of life. We are now working with nanotechnologies. nanopot advanced materials etc. Genetic engineers are forming clones. and some physicists are working on secondary time axis and secondary world. But people are using Internet for cracking others websites and to cheat people. Even the defence secrets of a country are not safe.

Too much of automation makes us lazy and destroys creativity. Too much of application of modern medical technology makes one more body conscious and prevents us from detaching ourselves from nature. Too much of digital techniques spoil our appreciation for natural beauty. We are entering into subtle and subtler. technologies whereas our own subtle feelings of heart are becoming dry. The prejudiced mind is losing love and aesthetic sense.

One of our Swamis. while at Paris, entered a co-operative store. He purchased some items and went to the cash counter. All of a sudden the power failed. The calculating machine did not work. The operating; girl became dumbfounded. The Swami took a piece of paper and added the prices and told the total amount to the girl but she did not listen to him. When power came she operated the machine and found the result exactly tallied with what the Swami said. With a bright face she exclaimed. You are an Indian Yogi aren't you?

There is no alternative to hard labour. Once automation penetrates society. the economically backward countries find it very difficult to restore the work culture. People: become lazy. But in the first world countries people are accustomed to the latest technologies and yet the never give up hard labour. Japan is a bright example. Consequently poverty is our eternal friend in India notwithstanding our enormous natural resources. American people have no sympathy for poor people. because they believe that people are poor because they are lazy.

Technology has made our youth extrovert, lazy, lustful and greedy The commercial people are always filthily engaged in instigating the baser tendencies in man. Technology is used to misguide public. Statistical techniques are employed to bewilder the customer and to suck money from them. Colour xerox machines are used to forge currency notes.

Ever since the First World War. researches have been undertaken all over the world to develop sociological. political and scientific technologies. A number of theories were evolved correlating micro and macro-economy of a country in the perspective of its political identity. A democratic process of electing the cherished ruler of the nation through majority vote was also developed. But alas! No attention was paid to the technology of mind. The harmful tendencies of mind called the six ripoos, (enemies) had never been subdued in society and people were never taught the techniques of controlling them. Rather. Environments were created to aggravate these harmful inclinations because it appears to be crucial for the success of market economy. We, the guardians of society, never try to improve the situation around a new-born baby so that it gets a good environment to grow up into a useful citizen.

Positive Influences of Technology

If we now look at the positive influences in contradistinction to my earlier statement that technology is neutral, 1 can say there is no end to them. Moreover, the effect of technology upon the mind can also be very beneficial.

Technology makes a man precise. This computer age is an age of precision. Ancient India could efficiently teach us how to be precise. But the marvellous precision of ancient India was lost. The aphorisms of Panini on Sanskrit grammar written more than four thousand years ago are probably the most precise treatise of our heritage. Then there are the Yoga Sutras of Patanjali and above all the Brahma Sutras of Vyasa. It is said that a sutrakar (inventor of the sutra) would get greater delight in reducing one or half a letter in his sutra than in the birth son. Latest technology has bequeathed to us the age-old trdition of precision in a new dimension with extended potency.

Technology survives on reason and logic. Consequently the logical attitude has to be developed. Logic was very much there in India. West Bengal was like a university of Navya- Nyaya during the time of Shri Chaitanya. The entire Vedanta philosophy is based on reason. We find most precise logical structure in Vedantic arguments and ratiocination. It was lost due to slavery of a millennium. In India computer education has greatly helped in the general restoration of logical faculty in the masses.

During the Industrial Revolution the so called technical people thought they would explain everything that exists with absolute certainty with the help of Newtonian Mechanics.But the view started changing at the beginning of twentieth century when Einstein steered scientific concepts into the new direction of Relativity. People could understand that there. are things subtler than the subtle; Man started studying nature indepth. The distance between nature and man that was created by the Industrial Revolution started lessening slowly with the advancement of modern technology. This is due to the discoveries of a modern science which has taught us understand that we shall have to go back to nature if we really want to survive. The range of our education has thus been extended from the bottom of the ocean to the pulsating stars in the sky, from the lifestyle of the white ant to behavioural pattern of plants in extraterrestrial space. Technological advancements compel us, especially Indians, to learn the secret of team work. We Indians are awfully weak in teamwork. A surgical operation in a hospital requires a full team of a number of doctors, assistants, anaesthetist, nurses, etc. A good administration also requires perfect teamwork.

Technology also makes a person honest. A person who adores technology cannot become dishonest, undisciplined or untruthful. His concern for perfect technology will compel him to remain honest and disciplined. There is no question of deceiving the computer, for example. it will not work if the command is wrong. The nervous system itself of a software engineer will prevent him from deceiving others.

Yatra vishvam bhavati eka needam, 'Where the entire world is a single nest,' says the Upanishad. Through Internet today the earth has become practically a global village. Cultural and intellectual exchange has become so easy that the ancient noble, Upanishadic concept has come true. Udara-charitanantu uasudhaiva lkutumbakam- for the large hearted people, the whole world is a family. This has been taking place with the help of technology. Technology has helped man to transcend casteism and other social superstitions.

Technoiogy unveils the Truth. Advanced medical sciences, even on the verge of forming human clones, admit that some unseen force, call it God, created this beautifully 'technical' world. Technology helps increase the faculty of discrimination. As we find in the Bhagavad Gita, the jnani discriminates and discovers the transient nature of the world by seeing both the beginning and the end of things. Consequently he is never deluded. Technology helps us by increasing dispassion.

It is said in the Yogasutra of Patanjali that the degree of sense of urgency counts for success. Our life-style has become very fast today in a technologically dominated society. A large number of people have become accustomed to a fast life and consequently the sense of urgency has increased much. This is an important contribution of technology. Technology also teaches us patience and perseverance. We know the story of PARAM-the indigenous supercomputer-completely an indigeniously developed software. Mrs. Indira Gandhi told the scientists about the absurd terms and conditions the United States wanted to impose upon India to install a supercomputer. The scientists requested the Prime Minister to wait for two years. Within two years they created PARAM at par with the American supercomputer. The headline of an American newspaper was, 'Angry India does it. 'Someone remarked, 'Why India does not always remain angry?'

It is also evident that dogmatism and if anaticism are slowly disappearing with the advancement of technology. Of course, scattered upsurges are there at different parts of the world. That is because education and technology have not reached there.

Focus on Education Technology.

Education has four parts or stages:

Acharyat padamadhatte,
padam shishyah svamedhaya.
Padam sabrahmacharibhyah
padam kalakramena chao

A quarter (of education) is gained from the preceptor; another the disciple gains by his own intelligence. The third is acquired with the help of colleagues (by mutual discussion). The final quarter is gained in due course of time as learning matures.

Medhaya has the implication of the older impressions stored in the mind coupled with the brilliance of the disciple. What we learn cognitively in our waking state is ratified by memory, since we generally try to place the new experience in an old category. There are many patterns or categories and the process of education simply implies putting what is learnt into those categories. This is, of course, primary and secondary education. That is why Vivekananda said, 'Education is the nervous association of certain ideas. Education, in the true sense, means 'manifestation of perfection already in Man. ' This is done through assimilation of ideas. The above mentioned stages of education must be reflected upon if we really want to make our education technology effective.

For a child, education means only gathering of information and simultaneously forming certain good habits. As it

grows, it learns to relate? the new information received with the older one. At the second stage the youth classifies data. thinks and rethinks on what he has learnt. In There is ample scope for the process thesis. antithesis and synthesis. In the third stage man assimilates some ideas. and translates them into life. Only at this stage education has a real impact upon the life and character of a man. The fourth stage is the state of the manifestation of perfection already in man.

Education and Technology

How does modern technology influence the above mentioned; stages of education? Science has provided ample opportunities for a child to use its eyes. ears, and touch and thus gain wider education. Multimedia is a very effective means of education. Various apparatus have been devised for the blind and deaf and dumb.

For the youth innumerable books. journals, laboratories, and libraries are available today, so that they can obtain vast information and enrich their knowledge. Finally, for the already grown up thoughtful individuals, modern technology has opened floodgates. They can undertake researches on new lines for the development of science or culture, indoor or outdoor. Technology is indispensable for such purposes. However, it depends upon the government to apply technology for

the education of the masses. The method of education of a single individual is totally different from mass-education. Indians comprise 16.5% of the total population of the world, whereas 33.8 % of the total illiterate people of the world reside in India! This could change if we emphasize women's education. If Women are educated and moral, society can quickly achieve a high cultural and moral profile compared to one where women are neglected and kept uneducated. An educated mother produces an educated child.

Conclusion

The advancement of technology is carrying us towards the ancient Indian values-we are receding towards the starting point, The word religion comes from the Latin word-'religion' and means to go back towards the source. In that sense technology and religion seem to be synonymous or the obverse and reverse of the same coin, Thus a technical man Will be religious and all religious people will have to be technical, be it in the field of Vedantic decrimation or meditation or Karma Yoga or even Bhakti Yoga. But for this to happen, pare vidya, will have to be reemphasized.

আমারে কেউ ছুঁয়ো না গো সজনী

প্রকাশ আদিত্য

"আমারে কেও ছুঁয়োও না গো সজনী" অথবা জাত গেল জাত গেলো বলে– একি আজব কারখানা, যুগ যুগ ধরে মরমী কবিদের এ আর্তনাদ সৃষ্ঠিকর্তার কাছে ঠিকমত পৌঁছুতে পারে নাই। কেন না এখনও কূলহারা হয়ে যাবার বেদনা? কিসের বলে হিন্দুর্ধমের বিশেষ কোন শ্রেণীর এ অহংকার? সামাজিক এসব জটিলতা স্বভাবতই মনটাকে বিষাদে ভরিয়ে তুলে।

'হিন্দুইজম বা হিন্দুত্ববাদ' সমাজে বর্নপ্রথা অথার্ৎ ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শুদ্র-আগে থেকে চর্চা ছিল। জাত-পাতের শ্রেণীভেদ, একবিংশ শতাব্দীর গ্লোবাল বিশ্বেও বড়ই অমানবিক আর অযৌক্তিক তা ভাবনার নতুন খোরাক যোগায়।

জাতের উচ্চতা ও নিম্নতা নিয়ে যারা এখনও নাক উঁচু করে চলে তাদের শিক্ষা জ্ঞান এবং স্পর্ধার কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়। খোলামনে ধর্মীয় ইতিহাসের অলিগলি পেরুলে এর উত্তর মেলে। এর জন্য আর মহাপন্ডিত বা গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষ কোন মাণবিক গুণাবলী, শিক্ষা অথবা গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা না থাকার পরও কেবল মাত্র জন্মের উচিলায় ধর্মীয় আভরনে উচ্চ বর্ণের সুযোগ ভোগ করবে অথবা অপরাপর বর্ণের মানুষের উপর প্রভাব খাটাবে। কেমন আহম্মকি ব্যাপার না? প্রাকৃতিক ভাবে উপমহাদেশের বাইরে এ গ্রহের অন্যপ্রান্তে জন্ম নেয়া মানব শিশু তাহলে কোন বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করবে? জ্ঞান-আহরণ, সমাজ নিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক বিধি-বিধান প্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতা বা অধিকার উচ্চবর্ণের এই শ্রেণীর মানুষ বেশ আগ থেকে চর্চ্চা করছে। কেবলমাত্র বৃটেনের রাজপরিবার ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও জন্মের কারণে সুযোগ ভোগ করার উদ্ভট চিন্তা সম্ভব নয়। রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী, ঈশ্বরচন্দ্র, ও ঠাকুর পরিবারের সদস্যবৃন্দ সনাতন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নানা কুসংস্কার থেকে বের করে শাশ্বত মানব ধর্মে নিয়ে যাওয়ার চেষ্ঠা করেছিল। আচার সর্বস্ব রীতিনীতি থেকে সরিয়ে চেষ্ঠা করেছিল এক ঈশ্বরের রথে মানবতার পতাকা ওড়াতে। তাঁদের এ নতুন ভাবনার আকুলতায় লালন। রাধারমন, হাসন, দুরবীনশাহ, রবিঠাকুর, নজরুল, অতুলপ্রসাদ শাহ ও আবদুল করিমসহ আরো অনেকে নানা সময়ে উদ্যোগ নিয়েছেন।

পরিবর্তন যে আসেনি তা বলা যাবে না। তবে তা প্রত্যাশার চেয়ে কম। জাত পাতের বেড়া ডিঙিয়ের তাই তো আমরা বন্ধুর বাড়ি ফুলের গন্ধ নিতে শিখেছি। শ্রেণীভেদ ভুলে ধর্মীয় উন্মাদনাকে পাশে সরিয়ে সকল ধর্মের সহ-অবস্থানে মানুষের জন্য কল্যাণময় ধর্মের কথা ভাবতে শিখেছি।

"যত মত তত পথ" হউক। তাতে আমার কোন আক্ষেপ নেই। কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে চুড়ান্ত গন্তব্য বা লক্ষ্য তো একটাই, ঈশ্বর প্রাপ্তি বা স্বর্গলাভ। তাহলে নানা পথ ঘুরে। অন্যকে মাড়িয়ে, নিষ্পেষিত করে, বিভক্তির পর বিভক্তি রেখা টেনে কিভাবে ভগবানকে মানুষ ছুঁতে পারবে? কাছে পাবে? অনুগ্রহ বা কৃপালাভ করবে?

প্রকৃতির চক্রাকার চলাচলে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মেতে উঠে নানা উৎসবে। রোদ-বৃষ্টি, চাঁদ-সূর্য, শরৎ-বসন্ত, ফাগুন-চৈত্র নানা অনুসঙ্গে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠে। বসন্তের রঙে রাঙ্গিয়ে উঠে দোল উৎসবে, শরতে শুভ্রতায় কাঁশফুলের সাথে শিউলির সঙ্গে পালন করে দুর্গোৎসবে। জাগতিক ও সামাজিক অন্ধকার কুসংস্কার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে উদ্‌যাপিত হয় দীপবলী।

নানা এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে বর্ণপ্রথার উচ্চ শ্রেণীর হাতে। ভগবান যেহেতু সর্ব জনের, সব সৃষ্টির তবে আরাধনা বা নৈকট্যলাভের সামর্থ ও শক্তি অবশ্যই সকলের। তাই যদি হয়, তাহলে কেবলমাত্র তথাকথিত শ্রেণী বিশেষের দিকে নির্দেশনা বা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কেন? যদি তা ভগবান কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত থাকতো তাহলে অঞ্চলভেদে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নানা রূপ হবেই বা কেন? আমাদের সহজ চাওয়া উপসনালয়ে পবিত্রতার সাথে সকলের সমান সুযোগ পাওয়া।

সকল ধর্মীয় উৎসবের দুটো দিক। একটি হল আধ্যাত্মিক ও আরেকটি হল সামাজিক। আধ্যাত্মিক দিক উপলব্ধির বিষয়। সামাজিক দিক হল উপভোগের। অনেকের সঙ্গে আনন্দের অংশীদার হওয়া। কিন্তু সনাতন ধর্মাল্বীরা কী এক কাতারে এসে এ আনন্দ যজ্ঞে মিলতে পারে? আমার অভিজ্ঞাতায় এর সহজ নৈব্যক্তিক উত্তর না। কিছু কিছু অঞ্চলে দেখেছি জাত-বেজাতের দ্বন্ধ উচ্চ শ্রেণী-নিম্নশ্রেনীর মন দূরত্ব। তাই জেলে পল্লীর ঠাকুর দেখতে তথাকথিত উচ্চবর্ণ এবং অর্থনৈতিক সচ্চলতার লোকের রুচিতে বাঁধে। কিন্তু জেলে পাড়ার উপকরণ-উপাচার পূজো শেষে বাড়ি নিতে হিসেবের ভুল হয় না।

জন্মের পর নানা সামাজিকতা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের উত্তরণ হয়ে থাকে। জেলে পরিবারে জন্ম নিয়ে তিনি হতে পারেন একজন বড় সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী কিংবা মানবতার স্বপক্ষ গোষ্ঠির সদস্য। অন্যদিকে ব্রাক্ষণ পরিবার বা বর্ণশ্রেণীর উচ্চ স্তরে জন্ম নেয়ার পরও নানা সহজ সুযোগ নিয়ে সামাজিক মর্যদার উচ্চ পদে তাদের অবস্থান ক্রমশয় অস্তগামী।

তাহলে কেবলমাত্র জন্মের কারণে একজন মানুষ ১ম, ২য়, ৩য় বা ৪র্থ ধাপে অবস্থান করবেন? অথবা ভারতীয় উপমহাদেশে বা সনাতন ধর্মাবলম্বীর ঘরে জন্ম না নিয়ে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে জন্ম নিলে তিনি কোন বর্ণের আশ্রয়ে চিহ্নিত হবে?

তাই আমি বলতে চাই–এ যে বর্ণপ্রথা জাত বেজাত স্পৃস্য– অস্পৃস্য, আপনি উচ্চ বংশীয়-আমি নিচু বংশীয় এ ধারণা আসে কিভাবে? কেন এখনো আমরা কেবল মানুষ বলে পরিচিত হতে পারছি না।

ঢাক-ঢোলের শব্দের মাঝে অথবা অর্থ-বৈভবের পাশ ঘেষে শক্তি আর অবস্থানের কারণে সাধারণ কোন মানুষও যেন ভগবানের কৃপালাভ থেকে দূরে সরে না যায়। সকল পবিত্র মানুষের জন্য উপসনালয়ের দরজা খোলা থাক। যদি তার উল্টোটা হয়, মানুষের মধ্যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের দড়ি টানাটানি চলে তবে শোষিত বঞ্চিত শ্রেণী নানা মত আর পথের মাঝ গিয়ে ভিন্ন পথে গিয়ে চরমগন্তব্য খুজে নেবে। সনাতন ধর্ম অবলম্বীদের ক্রমাশয় সংখ্যা তাত্বিব সংকোচনের মূলে আমার মনে হয় জাত-পাত, ছোট-বড় এসব মিশ্র অদ্ভুত আচরনই দায়ী।

আমাদের তরুণ সমাজকে সঠিক পথে নিয়ে চলার এখনই সময়। ধর্মকে ধারণ করবো মনে, বিশ্বাসে আর আচার-আচরণে, মন খুলেই মানুষকে চিনবো শ্রদ্ধা করবো-ভালবাসবো। তাদের শেখাবো ধর্মকে কিভাবে মানবতার মাঝে প্রকৃতির সাথে সম্মেলন ঘটাতে হয়।

Available With Attractive Price & Excellent Quality
SHIN-NIPPON JAPAN
Operation Microscope
LUMENIS. GERMANY
Enhancing Life. Advancing Technology.
CO2 Laser
bio LITEC
DIODE LASER
GERMANY
PENTAX MEDICAL
JAPAN
Endoscope System
ENT Surgical kits: Netcell (Merocell), Nasal Pack, Tympovent(Ventilation T-Tube), PROVOX Voice Prosthesis, Grace Stapes Piston, Tracheal T-Tube & others are also avalable
IRIS ENTERPRISE
Centre Point Concored Lavel # 12B Farmgate , Dhaka-1215. Moblie : 01726-311097, 01759-776232, 01714-215227
Tel : 9118196, 9114961, E-mail : sahapk1968@gmail.com, www.irisxenon.com
bistos
Bistos America Inc.
BISTOS/KOREA
LED Headlight
Hawk
Hawk/CHINA
Different Endoscope
ENT/Urology/Laparoscopy etc.
Sanma
SANMA/INDIA
Different Operation Microscope
(ENT/Dental/Neuro/Eye
DAESIN / KOREA
CO2 Laser
Others :
Eye/ENT/Urology/Gynae etc. Heavy Medical, Equipments and surgicals are also avaiblle with us.
Contact Address : Xenon
Centre Point Concored Lavel # 12B Farmgate , Dhaka-1215.
Moblie : 01726-311097, 01759-776232, 01714-215227
Tel : 9118196, 9114961, E-mail : sahapk1968@gmail.com, www.irisxenon.com

শারদীয় দুর্গোৎসব

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি হলেন দেবী দুর্গা। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন যাঁকে মহাশক্তি হিসেবে মনে করেন। তিনি বহু নামে আমাদের মাঝে পরিচিত যেমন চণ্ডিকা, যোগমায়া, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, মহিষাসুরসংহতরিনী, নারায়নী, মহামায়া, কাত্যায়নী ইত্যাদি। মা দুর্গা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন বেশে অনেকগুলো হাত নিয়ে আর্বিভূত হয়ে থাকেন। তিনি অষ্টাদশভূজা, ষোড়শভূজা, দশভূজা, অষ্টভূজা ও চতুর্ভূজা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আগমন করে থাকেন বলে হিন্দুধর্মালম্বীগণ ভিন্ন ভিন্ন সময় ও তিথিতে দেবী দুর্গাকে পূজা-অর্চনা করে থাকেন।দেবী দুর্গার দশভূজা রূপটি হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট বেশী জনপ্রিয়।তাঁর বাহন সিংহ। দেবী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি রূপে অসুরকে বধ করেছিলেন। হিন্দু পৌরানিক মতে দেবী দুর্গা শিবের স্ত্রী পার্বতী। শিব হলেন সনাতন ধর্মের মূলস্তম্ভ ত্রিশক্তির প্রধান যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। শিব পূজিত ঈশ্বরের পাঁচটি প্রধান রূপের (গনেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও দুর্গা) একটি রূপ। শিব হলেন ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা। শিব গৃহরূপে পার্বতীর স্বামী। পার্বতীর সপরিবারে পিতৃগৃহে অবস্থানের আনন্দময় দিনগুলো দুর্গাপূজা হিসেবে পরিচিত।

মা দুর্গার পূজা-অর্চনা বাঙ্গালী হিন্দুদের মাঝে প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বছরে দু'বার দুর্গোৎসবের প্রথা বিদ্যমান। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে শারদীয়া ও চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বাসন্তী দুর্গাপূজা পালিত হয়। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা-ভাষিদের মাঝে দুর্গাপূজা প্রবর্তিত হয় বলে কথিত আছে।

দেবী দুর্গার পূজাবিধি পুরানে উল্লেখ রয়েছে। দেবীদুর্গা, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা, চণ্ডী, নারায়নী রূপে পূজিত হয়ে থাকেন। ভাগবত, মহাভারত ও পুরানে দেবী দুর্গার ভিন্ন অবতার হলো কালিকা, নন্দা, ভ্রামরী, শাকম্ভরী, রক্তদণ্ডিকা, সতূ, পার্বতী, কৌশিকী ইত্যাদি। রাজা সুরথ বসন্ত ঋতুতে চৈত্রমাসে প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন। দেবী ভাগবত ও কালিকা পুরানমতে- শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র রাবন বধের জন্য দুর্গাপূজা করেছিলেন যার জন্য একে অকালবোধন বলে আখ্যায়িত করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালন করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড এবং আমাদের বাংলাদেশে বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে দেবীদুর্গার পূজা অর্চনা করা হয়।এছাড়া পৃথিবীর যেস্থানে বাঙ্গালী হিন্দু লোকজন বসবাস করেন সেস্থানে মা দুর্গার পূজা-অর্চনা করা হয়।

রাজা কংসনারায়ণ রায় রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার তাহেরপুরে প্রথম শারদীয় দুর্গাপূজা আরম্ভ করেছিলেন বলে কথিত আছে। ধর্মপরায়ন রাজা মহাযজ্ঞ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি রাজ বংশের পুরোহিত তৎকালীন বাংলা বিহারের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয় পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট মহাযজ্ঞের বিধি-বিধান জানতে চান। রাজার ইচ্ছানুযায়ী রমেশ শাস্ত্রী বিভিন্ন অঞ্চলের শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী পুরোহিতগণের মতামতের ভিত্তিতে দুর্গোৎসবের পরামর্শ ও সর্বজনীন মহাযজ্ঞের উৎকৃষ্ট বিধান উপস্থাপন করেছিলেন। এ বিধানমতে মা দুর্গার মূর্তি তৈরি করা হয় যা ইতোপূর্বে কোথায়ও দেখা যায়নি। এ পূজা বেশ কয়েকদিন উৎসবমূখর পরিবেশে অনেক লোকজনের মহাসমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা সে সময়ে ৮লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন যা বর্তমান সময়ের কয়েক কোটি টাকার সমান।রাজা কংসনারায়ণ বিধানমতে রাজকীয়ভাবে প্রথম ৫৩৮ বছর আগে মহাসমারোহে যজ্ঞাদিসহ শারদীয় দুর্গোৎসব করেন।

এ দুর্গোৎসব ইতিহাস খ্যাত। যা উপমহাদেশের ইতিহাসে সত্য বলে প্রমাণিত । এ পূজার আয়োজন করায় সারা বাংলায় প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজার জয়জয়কার ও উচ্ছসিত প্রশংসা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এ পূজার পর থেকেই উপমহাদেশের বাঙ্গালী সনাতন ধর্মের লোকজনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবমূখর পরিবেশে সর্ববৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গোৎসব। এ পূজার আগে ২/৪টি পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকলেও কংস নারায়ণের পূজার মত বৃহৎ পরিসরে আয়োজন করা হতো না।তাই রাজা কংস নারায়ণকে উৎসবমূখর পরিবেশে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের প্রবর্তক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম তিথি শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচদিন যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়াদশমী হিসেবে উৎসবমূখর পরিবেশে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়।

বাঙ্গালী চির দিনই উৎসব পাগল জাতি। আর এই উৎসবের চক্র ঘিরে রেখেছে বাঙ্গালী সমাজকে । দুর্গাপূজাও এমন একটি উৎসব যে উৎসব জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভুলে সবাই হারিয়ে যায় উপভোগের গভীর অতলে। এটি হিন্দু তথা সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলেও হয়ে গেছে বাঙ্গালীর উৎসব। এ উৎসব চলে আসছে সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে। আজকের দিনে দুর্গামূর্তির যেমন বৈচিত্রময় কারুকার্য লক্ষ্য করা যায় কিন্তু প্রাচীনকালে মূর্তির এমন বাহার ছিল না। তখন মূর্তি ছিল ভক্তির আধার।

দুর্গাপূজা এমনই এক উৎসব যা বাঙ্গালী হিন্দুদের মনে বিশাল চেতনায় ছড়িয়ে দেয়। এ সময় নাস্তিক বা আস্তিক বিবেচনার অবকাশ থাকে না। কারণ তখন উৎসব হয়ে দাঁড়ায় মহাসমুদ্রের মহা অবগাহন। পূজার দিনগুলোকে কেন্দ্র করে তরুণ সমাজ হয়ে উঠে ধর্মের শ্রেষ্ঠ অনুগামী কর্মী। তরুণরা পূজা মণ্ডপকে সাজিয়ে তোলে আপন মহিমায় কল্পনার শৈল্পিক মহামন্দির রূপে। তরুণ সমাজ পূজার ভার বহন করে, আর প্রবীণরা থাকেন পিছনে। পূজার একমাস আগে থেকে তরুণদের আহার নিন্দ্রা থাকেনা। পূজার বাজেট পূরণ করতে চাঁদার চাপ পড়ে অনেকের উপর। তারপরও নতুন পোশাক , নতুন খাবার, আত্মীয় স্বজন নিয়ে মেতে থাকেন সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। বন্ধু-বান্ধবের সান্নিধ্যে মুখরিত হয় পূজা

উৎসব। হিন্দু ধর্মের উৎসব প্রকৃত অর্থে নিজ সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে সব ধর্মের মহা ঐক্যের আহ্বান জানায়। এ পূজা হয়ে উঠে ভ্রাতৃত্বের নবায়ন উৎসবে। তাই দুর্গাপূজা শুধু হিন্দুর উৎসব বলে আর কেউ ভাবে না, ভাবে বাঙ্গালীর উৎসব বলে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সব ধর্মের এক মহামিলন মেলা। আত্মিক মিলনের এক পরমক্ষণ।

বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের প্রধান উৎসব হিসেবে শারদীয় দুর্গাপূজা পালিত হয়। কথিত আছে মা দুর্গা আমাদেরকে দুষ্ট ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার্থে দেবকূল থেকে মনুষ্যকূলে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। তিনি বিপদনাশিনী মা। তিনি সকলকে বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। শারদীয় দুর্গাপূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অপকর্মের বিনাশ ও সত্যের জয় নিশ্চিত করা। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বাঙ্গালী হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ শান্তি, সমৃদ্ধি ও অপশক্তিরোধ এবং মানব জাতির কল্যাণ কামনায় শারদীয় দুর্গোৎসব পালন করে থাকেন। বাংলাদেশে সনাতন ধর্মের লোকজন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদযাপন করে আসছেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন পাড়া-প্রতিবেশী একত্রিত হন এবং পূজা-অর্চনার পাশাপাশি সকলে আনন্দ-উৎসবে মিলিত হন। যার দরুণ দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় উৎসব নয় সামাজিক উৎসবও বটে। এ উৎসবটি শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব নয়, যা আজ সকলের উৎসব হিসেবে পরিণত হয়েছে।তাই দুর্গাপূজা সর্বজনীন দুর্গোৎসব।বিশ্বের সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনায় শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হউক এ প্রত্যাশা রইলো।

সিঙ্গেল ডিজিটে সোনালী ব্যাংক

নিজের পছন্দের নির্মাণ শৈলীতে নির্মিত বাড়ীর মালিক হওয়ার সুযোগ দিতে এলো দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

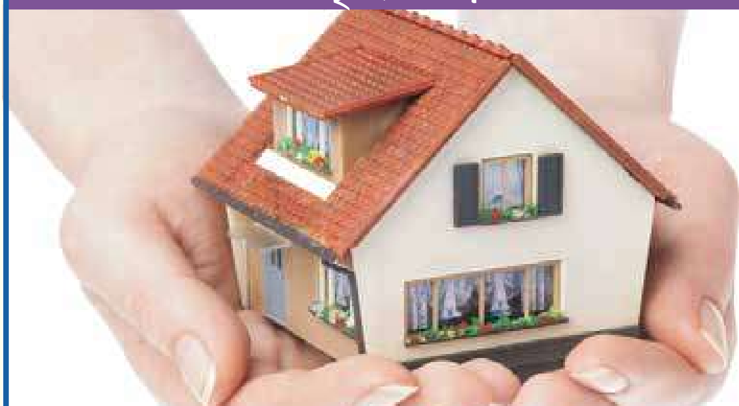

আপনার স্বপ্ন পূরণ আমাদের লক্ষ্য

- মাত্র ৯ শতাংশ সুদ ভিত্তিক সাধারণ গৃহনির্মাণ ঋণ কর্মসূচির আওতায় দেড় বছর গ্রেস পিরিওড সহ সর্বোচ্চ ২০ বছর মেয়াদী এই ঋণ গ্রহণে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করুন।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী, দেশের সকল বিভাগীয় শহর, সিটি কর্পোরেশন, জেলা শহর, 'এ' এবং 'বি' গ্রেডভুক্ত পৌরসভার আবাসিক হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় ঋণ প্রদান করা হবে।
- সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে একটি চমৎকার আবাসনের গর্বিত মালিক হোন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ফোন: ০২-৯৫৫০৪৮৩, মোবাইল: ০১৭২৯-০৯০৭৯৫

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

আমার জীবনের বাসনা ও আমাদের দুর্গাপূজা

দীপক লাল কর্মকার

যা দেবী সর্বভুতেষু শক্তিরূপেন সংস্থীতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ
যা দেবী সর্বভুতেষু মাতৃরূপেন সংস্থীতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ

আমার লেখার প্রারম্ভে বিশ্ব জননী "দুর্গামা" কে স্মরণ করছি এবং মায়ের সকল আর্শীবাদ নিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করছি মাত্র। লেখার আগে ব্যক্তিগত কিছু অতিব প্রয়োজনীয় মনের বাসনা লিখছি– ছোট বেলা থেকে বেশ আনন্দ সহকারে গ্রামের বাড়ীতে দুর্গাপূজা পরিবারের সকলে মিলে মিশে উপভোগ করতাম। আমাদের পরিবার ছিল অনেক বড়। অনেকেই গ্রামের বাড়ীর বাহিরে থাকতেন কিন্তু পূজার সময় সকলে ঠাকুরদাদার আদেশ মোতাবেক বাড়িতে আসতেন এবং লক্ষ্মীপূজার পরে পুনরায় যে যার কর্মস্থলে চলে যেতেন। আসলে পূজার আনন্দ লিখে বুঝানো যায় না, এটা শুধু মন দিয়ে অনুধাবন করা যায় মাত্র। আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলাম বিদ্যালয়ে পেরিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিবছর পূজা মন্ডবে যেতে যেতে মনের মধ্যে একটা বাসনা আর্বিভুত হতে লাগলো। যদি আমি কখনো একবারের জন্যও মা দুর্গার পূজা করতে পারতাম এবং মা দুর্গা যদি সে ক্ষমতা আমাকে দিতেন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ভাবনা। আমাদের পরিবার দুর্গাপূজা এককভাবে করতেন না। আমরা সার্বজনীন পূজার সাথেই জড়িত ছিলাম। মা-এর আর্শীবাদে পূজা করার মত সামর্থ্য আমাদের পরিবারের ছিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের ঘর-বাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য (সোনা) একদম শেষ হয়ে গেল। মোটকথা একদম পথে বসে ছিল আমাদের পরিবার। আমি তখন বেশ ছোট প্রথম শ্রেণীতে পড়ি মাত্র। পরিবারের কিছু সদস্য দেশত্যাগ করে কলকাতা চলে গেলেন। আস্তে আস্তে পরিবার ছোট থেকে ছোট হল। বাবা আর তেমন ব্যবসা করলেন না। যাই হোক, এভাবেই চলছিল দিনকাল। দিনের পর দিন এভাবেই চলে যাচ্ছে আর কী? অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে জীবনকে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখনই দুর্গাপূজা চলে আসতো তখনই ছোট-বেলার সেই বাসনাটি মনের মধ্যে আনাগোনা করতো। কিন্তু সব কিছুই ছিল হাতের বাহিরে। সামর্থ্য কোথায় পূজা করার? দুর্গাপূজা তো অনেক বড় পূজা ও বড় ব্যাপার। প্রতি বছরই মা কে বলতাম, একবার তোমার পূজা করতে চাই মা, সে ক্ষমতা ও সামর্থ্য আমাকে দাও। এভাবেই বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে জীবন থেকে কোন আশা পাচ্ছি না। আমার মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে হলিক্রস স্কুলে ভর্তি হল। মোহাম্মদপুর থেকে চলে এলাম ফার্মগেইট। মেয়ে হলিক্রসে পড়ার কারণে মেয়ের বান্ধবীর বাবা-মায়ের সাথে পরিচয় এবং নতুন নতুন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে সকলের সাথে বিভিন্ন বিষয় আলাপ আলোচনা হতো। গত ২০১৭ ইং সালে জুলাই মাসে তেজকুনী পাড়ার কয়েকজন হিন্দু ভাইয়েরা চিন্তা করল, এ এলাকার যে সব হিন্দু সম্প্রদায় বাস করছেন তাদেরকে কিভাবে একই ছাতার নিচে আনা যায় এবং এ এলাকাতে পূজা অর্চনা সহ স্থায়ী মন্দির স্থাপন করা যায়। এ মহৎ উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে একটু একটু করে এগুতে আরম্ভ করলো সকলে মিলে। মোটামুটি এলাকায় সকলের কাছে সাড়া পেতে আরম্ভ করলো ব্যাপারটি। মিটিং এর পর মিটিং করে চলছেন সকলে মিলে সামনের দিকে। হঠাৎ একদিন আমার এক প্রিয় বন্ধু মোবাইল করলো আমাকে এবং এই সমিতির কথা, ভবিষ্যৎ চিন্তা ধারা বিস্তারিত আমাকে বললেন। তার কথা শুনে আমার বেশ ভালো লাগলো। হঠাৎ করেই একদিন মিটিং এ চলে গেলাম এবং সংগঠনের সকলের ভালবাসা, বন্ধুসুলভ ব্যবহারে নিজেকে তাঁদের সারিতে দাঁড় করালাম। আমার সেই বন্ধুর নাম সংগিত কুমার ঘোষ, ব্যাংকার (আমার মেয়ের বান্ধবীর বাবা)। একে একে সকলের সাথে পরিচয় হল– যেমন অরুনদা, নন্দিদা, প্রদীপদা, সচীনদা, স্বপনদা, প্রকাশদা, অসীমদা, আশোকদা, সঞ্জীব স্যার, তপনদা, নেপালদা, রনধীরদা, গোপালদা, মানিকদা, হিরালালদা, শ্যামলদা, কেশবদা, প্রমথদা, সঞ্চিবদা, সুবিমলদা, সান্তনুদা, উত্তমদা, খোকনদা, বিশ্বজিৎদা, বিমলদা সহ আরো অনেকের সাথে। নাম না জানা আরো অনেকের সাথে দেখা ও কথা হল। এভাবে একদিন মিটিং এ প্রস্তাব হলো আমরা পূজা করবো কারণ পূজা করলে এলাকার সকলের কাছে আমাদের এই সংগঠনের নাম এবং আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য পরিস্কার ভাবে প্রকাশ পাবে। সকলে একমত হলাম পূজা করার, প্রথম পূজা "সরস্বতী পূজা"। এখন সংগঠনটির নাম বলা উচিৎ। আমাদের সংগঠনটির নাম – "তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ"। মিটিং করে সকলে পূজার কাজ ভাগ করে নিলাম। বেশ জাঁক-জমকভাবে সরস্বতী পূজা করলাম বটমলী অরফানেজ মাঠে। সরস্বতী পূজার মাধ্যমে চারিদিকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম ও উদ্দেশ্য ছড়িয়ে পড়লো।

আস্তে আস্তে এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আমাদের সাথে একাগ্রতা প্রকাশ করলেন। প্রয়োজনে পুনরায় সংগঠনের কমিটি গঠন করা হল বৃহদাকারে। আরম্ভ হল মন্দির প্রতিষ্ঠানসহ দুর্গাপূজা করার প্রক্রিয়া। আমাকে নতুন কমিটির সহ-সভাপতির পদ দিলেন সকলে মিলে। নিজেকে বেশ ধন্য মনে হল, কারণ ঢাকাতে এসে জীবনের মাঝপথে অনেকের সাথে একত্রে একটি ছাতার নিচে স্থান পেলাম এ

ভেবে। তখন বুঝতে পারলাম এখন আর আমি একা নই, আমার এখন অনেক সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধব আছেন এ এলাকাতে। আগে যখন বাইরে বের হতাম তখন নিজেকে বেশ একা একা লাগতো। একই স্থানে অনেকে চলাফেরা করছি অথচ কেহ কাহাকে জানি না, চিনি না। সংগঠন করার আগে রাস্তায় কখনো কখনো কাহারো গায় গায় লেগে চলে যাচ্ছি, কেহ কাহাকেও চিনছি না, জানছি না, কথা বলছিনা। আজ আমরা এমন একটা প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছি যে, এখন আর বাহিরে গেলে নিজেকে একা একা মনে হয় না। মনে হয় চারিদিকটা যেন আমাদের সকলের। এ রকম ভাবে ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে দুর্গাপূজার সময় চলে এল। মিটিং হলো মায়ের পূজা আমাদের সংগঠন জাঁক-জমকভাবে সম্পন্ন করবে। মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুসারে মোটামুটি ভাবে সকলে মিলে একটার পর একটা কাজ ভাগ করে সামনের দিক এগুছি। কিন্তু পূজার স্থান ঠিক হতে একটু দেরী হচ্ছে মাত্র। এলাকার কাউন্সিলার সহ সকলে আমাদের সাথে থেকে পূজা করার শক্তি জুগিয়েছেন। মা-এর অনেক আর্শিবাদে অবশেষে সবকিছুর আয়োজন সম্পন্ন হল। পূজার একটি প্রধান বিষয় হল স্মরণিকা প্রকাশ। প্রথমবারের মত স্মরণিকা প্রকাশ করার চিন্তা হল সকলের। সকলের অনেক বুদ্ধি, চিন্তা, ইচ্ছায় প্রকাশিত হল স্মরণীকা। স্মরণিকার নাম দেয়া হল 'অপরাজিতা'। সংগঠন আমাকে সহ কয়েকজনকে দায়িত্ব দিলেন স্মরণিকা তৈরী করার। জীবনে কোনদিন এত বড় কাজ আমি করিনি। তেমন কোন আইডিয়া নেই আমার। কাজ করতে আমার কোন অনিচ্ছা নেই। কাজ তো করতেই হবে, তাই কাজ আরম্ভ করলাম মা-দুর্গার নাম নিয়ে। হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল আমার সেই জীবনের আকাঙ্খার ও ইচ্ছের কথা। দুর্গাপূজা করবো একবার যদি মা দুর্গা আর্শীবাদ করনে। মা দুর্গা এবং ভগবানের কি লীলা। মা দুর্গা ও ভগবানের কাছে কিছু মনদিয়ে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন না। ভগবান সর্বদা তার সৃষ্টিকে সাহায্যে করেন যে কোন ভাবে হোক না কেন । কিন্তু মনে রাখতে হবে চাওয়াটা পবিত্র ও সুন্দর মনের হতে হবে। মা দুর্গা আমার প্রার্থনা শুনেছেন। তাই তিনি আমাকে একা একা পূজা করতে না দিয়ে সকলের সাথে মিলে-মিশে পূজা করার আর্শীবাদ করলেন। মা দুর্গা আমার প্রার্থনা শুনলেন এবং আর্শীবাদ করলেন পূজা করার জন্য। এটা যে আমার জীবনের কত বড় পাওনা সেটা ভাষায় বলে বুঝাতে পারবো না। নিজেকে সকলের সাথে মিশিয়ে ফেললাম। সামনে পূজা অনেক কাজ, কাজ গুলো আস্তে আস্তে করে যাচ্ছি আমরা সকলে। কোথাও কোন বাধা পেলাম না কাজ করতে। মা দুর্গা সর্বদিকে আমাদের আর্শীবাদ করলেন। এখন স্মরণীকার কাজের কথা বলছি, প্রথমে মা-দুর্গাকে প্রণাম করে বসে গেলাম ঈড়সঢ়ঁঃবৎ-এর সামনে, ওহঃবৎহবঃ এ একটা পর একটা দেখতে লাগলাম মা দুর্গা বিষয় কি কি আছে। নিজের চেষ্টায় বুদ্ধিতে যা যা বুঝলাম উড়হিষড়ধফ করে মনের মত করে সাজালাম। পরে আমাদের সংগঠনের সকলকে দেখালাম এবং আমার পরিকল্পনার কথা সকলকে বললাম। সকলেই আমাকে বেশ উৎসাহ ও বুদ্ধি দিলেন এবং সামনের দিকে এগুতে বললেন। সকলের কথায় মনে বেশ বল পেলাম আর ভাবলাম মা-দুর্গা চাইলে সবকিছুই সম্ভব। 'স্মরণিকা' প্রকাশ একটি বৃহৎ কাজ। তাই আমাদের সংগঠন 'স্মরণিকা' কমিটি করে দিলেন। সম্পাদক অধ্যাপক স্বপন কুমার বনিক, সম্পাদক পরিষদ: ১. মৃত্যুঞ্জয় রায় ২. দীপক লাল কর্মকার ৩. সঞ্জীব কুমার মৈত্র ৪.অশোক ধর ৫. কেশব সেন ৬. সনৎ দত্ত ৭. প্রকাশ আদিত্য। সকলে মিলে যার যার অভিজ্ঞতা একত্রিত করে কাজ আরম্ভ করলাম। সঠিকভাবে এত বড় কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, তবে আমার এক ভাই শিল্পী অশোক কর্মকার (প্রথম আলো পত্রিকার প্রধান শিল্পী) তিনি বিভিন্ন সময় ছবি, বই এর প্রচ্ছদ সহ ইত্যাদি অনেক বড় বড় কাজ করতেন, তার সাথে থেকে সেটা দেখেছি এবং তাকে মাঝে মাঝে কাজে সাহায্য করেছি বলে একটু একটু বুঝতাম কাজটি কি। তাছাড়া আর্শীবাদ তো মা দুর্গার আছে। আমাদের হাতে সময় খুব কম ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। প্রথম বার বলে সবকিছু একটু এলো-মেলো ছিল। তার মধ্যে কলকাতা থেকে প্রথম বারের মত পূজাতে আমার ভাগ্নী, ভাগ্নী জামাই, জামাইবাবু এলেন। সব কিছু মিলিয়ে বেশ হিমশিম খাচ্ছিলাম। তবুও নিজের মন স্থির করে একটু একটু করে এগুতে লাগলাম সকলের সাথে স্মরণিকার কাজে এবং পরিশেষে অধ্যাপক স্বপন কুমার বনিক (সম্পাদক) এবং আমি সহ সম্পাদনা পরিষদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতায় আমাদের স্মরণিকা 'অপরাজিতা' প্রকাশিত হল সুন্দরভাবে। পূজার মধ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্মরণিকা 'অপরাজিতা' উন্মোচন করলেন। সাথে সাথে সকলেই আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন আমাদের স্মরণিকা 'অপরাজিতা'। আপনারা জানলে খুশী হবেন যে, প্রথমবারের মত "তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ" কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা 'অপরাজিতা' দু' দুটি পুরস্কার লাভ করেছে। ১টি ঢাকা মহানগর পূজা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে এবং অপরটি ঢাকা উত্তর মহানগর পূজা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে। ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন আমাদের স্মরণিকার সম্পাদক অধ্যাপক স্বপন কুমার বনিক সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যগণ এবং দ্বিতীয় পুরস্কার গ্রহণ করেছেন আমাদের সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ কুমার সাহা সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যগন। সংগঠনের সকল সদস্যগন প্রথমবার পুরস্কার লাভে বেশ আনন্দিত। পুরস্কার সবাইকে আনন্দ দেয় এবং অনুপ্রেরণা যোগায় আরো ভাল ভাল কাজ করার। সেই আনন্দ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে এবছরও পুনরায় আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মরণিকা 'অপরাজিতা' দ্বিতীয় বারের মত প্রকাশ করতে যাচ্ছি। প্রথমবারের মত আমাদের দ্বিতীয় প্রকাশিত স্মরণিকাটি আপনাদের ভাল লাগবে বলে আশা করছি।

সবকিছু মিলিয়ে আমাদের দুর্গাপূজা সুন্দরভাবে সম্পন হল। মা দুর্গা চাইলে কিনা করা যায়। আজ আমি ধণ্য যে, আমার মনের আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পেরেছি সকলের সাথে একত্রে মা-দূর্গার পূজা করার মধ্য দিয়ে। সাথে সাথে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সংগঠন 'তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদকে। না, ধন্যবাদ দিলে সেটা অতি রঞ্জিত বলা হবে। আসলে এই সুযোগ সহযোগীতা ধন্যবাদের অনেক অনেক উর্ধ্বে। এখন আর আমাদের পিছনের দিকে তাকাতে হচ্ছে না। শুধুই সামনের দিক পথ চলা। কিছু দিন পরে আবার জাক-জমক ভাবে সরস্বতী পূজা ২০১৮ করলাম। এখন আমাদের মহৎ কাজ "মন্দির প্রতিষ্ঠা", সে কাজে সকলে মিলে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে চলছি সকলে মিলে। বলতে বলতে আবার মা-দুর্গা পূজার সময় চলে এল। মা দুর্গার আর্শিবাদে এবারেও আমরা দুর্গা পূজা করছি। মা দুর্গা সকলের সহায় আছেন বলেই সবকিছু সঠিকভাবে সম্পন্ন করে এবারেও সুন্দর ভাবে দুর্গা c~Rv

সম্পন্ন হবে বলে আমরা বিশেষ আশাবাদী।

আমার জীবনের অনেক কথা আপনাদের বললাম– এখন মা দুর্গার বিষয় কিছু বলার চেষ্টা করছি মাত্র- কতটুকুন পারবো জানি না তবে চেষ্টা করছি :-

দুর্গা মা'র কিছু কথা

জগজ্জননীর আগমনী বার্তায় সকলের প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছে মঙ্গলবার্তা। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুর্গাপূজা এখন শুধু মাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব নয়। এটি আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। দুর্গা মহমায়া, শিবানী, দশভূজা, ভবানী ইত্যাদি নামে পরিচিত। জীবের দুর্গাতি নাশ করেন বলে দুর্গাতনাশিনী হিসেবে হিন্দুদের নিকট দেবী দুর্গা পূজনীয়। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। ব্রহ্মার বরে পুরুষের অবধ্য মহিষাসুর নামে এক দানব স্বর্গরাজ্য দখল করলে রাজা রাজারা দৈবতারা বিষ্ণুর শরনাপন্ন হন। পুরান মতে, অসুরের আস্ফালনে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, দেবতারা যার যার অস্ত্র তুলে দিলেন মা দুর্গাকে। মা দুর্গা হলেন দশভুজা। এই দশভুজা মা দুর্গার হাতেই বধ হল অসুর, জয় হল দেবকুলের। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে যে দেবীর জন্ম হয় তিনিই দুর্গা। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এ দেবী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর এক নাম হয় মহিষামর্দিনী।

দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজন প্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তাঁরা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্টা দেবীর বরে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর এক নাম বাসন্তী পূজা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা। বাসন্তী পূজা হয় চৈত্রের শুক্লপক্ষে, আর শারদীয়া পূজা হয় সাধারণত আশ্বিনের কখনও বা কার্তিকের শুক্লপক্ষে। বর্তমানে শারদীয়া পূজাই সমধিক প্রচলিত। এসময় শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী (মহানবমী)-তে পূজা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। দুর্গাপূজা তিন প্রকার: সাত্ত্বিক (জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ ভোগ দ্বারা পূজা), তামসিক (কিরাতদের জন্য বিহিত; এতে জপ, যজ্ঞ ও মন্ত্র নেই; মদ্য, মাংস প্রভৃতি দ্বারা পূজা করা হয়) ও রাজসিক (পশুবলি ও আমিষ ভোগ দ্বারা পূজা করা হয়)। অতীতে দুর্গাপূজার সময় ছাগ, মেষ, মহিষ, হরিণ, শূকর, গন্ডার, ব্যাঘ্র, গোসাপ, কচ্ছপ বা পাখি বলি দেওয় হতো; কোনো কোনো গ্রন্থে নরবলির বিধানও আছে। বর্তমানে অবশ্য বলির প্রচলন নেই বললেই চলে। দেবী সাধারণত দশভুজা, তবে শাস্ত্রানুসারে তাঁর বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোলো, আঠারো বা কুড়ি। প্রতিমার রং হতে পারে অতসীপুষ্পবর্ণ বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কখনও বা রক্তবর্ণ। প্রতিমা ছাড়াও পূজা হতে পারে দর্পণে, অনাবৃত ভূমিতে, পুস্তকে, চিত্রে, ত্রিশূলে, শরে, খড়্গে বা জলে। দুর্গাপূজায় হিন্দুদের সকল বর্ণের লোকেরাই অংশগ্রহণ করতে পারে।

বঙ্গদেশে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) রাজত্বকালে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, মতান্তরে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩)। কিন্তু জীমূতবাহনের (আনু. ১০৫০-১১৫০) দুর্গোৎসব নির্ণয়, বিদ্যাপতির (১৩৭৪-১৪৬০) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) দুর্গোৎসববিবেক, কৃত্তিবাস ওঝার (আনু. ১৩৮১-১৪৬১) রামায়ণ, বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫-১৪৮০) ক্রিয়াচিন্তামণি, রঘুনন্দনের (১৫শ-১৬শ শতক) তিথিতত্ত্ব ইত্যাদি গ্রন্থে দুর্গাপূজার বিস্তৃত বর্ণনা থাকায় অনুমান করা হয় যে, বাংলায় দুর্গাপূজা দশম অথবা একাদশ শতকেই প্রচলিত ছিল। হয়তো কংসনারায়ণ কিংবা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে তা জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। উনিশ শতকে কলকাতায় মহাসমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষ অব্দি ইউরোপীয়ানরাও দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করত।

শরৎকাল চলে এলেই আমাদের মনে পূজা পূজা ভাব আনাগোনা করতে থাকে। চোখের সামনে ভেসে উঠে মা-এর ছবি ও আগমনী বার্তা। মা এর পূজার ১৫ দিন আগে চারিদিকে প্রচারিত হয় "মহালয়া"। এটি প্রভাতী অনুষ্ঠান, এই মহালয়া অনুষ্ঠানটি রচনা ও প্রবর্তনা বানীকুমার, প্রন্থনা ও শ্লোক পাঠক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সংগীত পরিচালনা পঙ্কজকুমার মল্লিক, অ্যালবাম কভার "মহিষাসুর মর্দ্দিন"।

মহিষাসুরমর্দ্দিনী (অর্থাৎ মহিষাসুরকে দমনকারী) হল ১৯৩১ সাল থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আকাশবাণী বা অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সম্প্রচারিত একটি বাংলা প্রভাতী বেতার অনুষ্ঠান। দেড় ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে রয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দুর্গা সপ্তশতী থেকে গৃহীত দেবী চণ্ডীর স্তোত্র বা চণ্ডীপাঠ, বাংলা ভক্তিগীতি, ধ্রুপদী সংগীত এবং পৌরাণিক কাহিনির নাট্যরূপ। অনুষ্ঠানটির একটি হিন্দি সংস্করণও তৈরি করা হয় এবং বাংলা অনুষ্ঠানটি সারা ভারতের শ্রোতাদের জন্য সম্প্রচার করা হয়। প্রতি বছর মহালয়ার ভোরে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। প্রথমদিকে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হত, কিন্তু ১৯৬৬ সাল থেকে রেকর্ড করা পূর্বের অনুষ্ঠানই শোনানো হয়। এই অনুষ্ঠানটি এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে, প্রায় ৮০ বছর পর আজও এর জনপ্রিয়তা তথা মহিমায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি।

দেবীপক্ষের সূচনায় মহালয়া অমাবস্যা ও দুর্গাপুজোর সাথে এই

অনুষ্ঠানের নাড়ির যোগ। এই মহালয়ার পুণ্যলগ্নে শিশিরভেজা মৃদুশীতল ভোরে প্রায় প্রত্যেক বাঙালি জেগে ওঠেন এবং "মহিষাসুরমর্দ্দিনী" সম্প্রচার শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন।

মহিষাসুরমর্দ্দিনীর আড়ালে তাঁর মন্ত্রমুগ্ধকর কণ্ঠের জন্য এবং বাঙালির মহালয়ার প্রভাতকে মোহময়করে তোলার জন্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র চিরস্মরণীয় থাকবেন। এই কিংবদন্তি কণ্ঠ শিল্পী চমৎকারভাবে সংস্কৃত শ্লোক এবং দেবী দুর্গার মর্ত্যে অবতরণের কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। মহালয়া উপলক্ষ্যে দেবীপক্ষের সূচনায় দেব-দেবীরা শারদোৎসবের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেন। ১৯৩১ সালে কলকাতার আকাশবাণী বেতারে প্রথম মহালয়া সম্প্রচারিত হয়। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রাইচাঁদ বড়াল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের জনপ্রিয়তা এতটাই তুঙ্গে উঠেছিল যে, ১৯৭৪ সালে বাংলার সর্বকালের সেরা অভিনেতা উত্তম কুমারকে দিয়ে সেই শ্লোক পাঠ করালে, আপামর শ্রোতা মেনে নেয়নি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আবার স্বস্থানে সসম্মানে ফিরে আসেন। পৌরাণিক পটভূমিতে আধারিত এবং বৈদিক মন্ত্র সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানটি একটি অতুল্য অদ্বিতীয়সৃষ্টি। এর রচনা করেছেন বাণী কুমার, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র করেছেন শ্লোকপাঠ এবং দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় (জাগো দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী), মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (তব অচিন্ত্য), সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, শ্যামল মিত্র এবং সুপ্রীতি ঘোষ (বাজলো তোমার আলোর বেণু) তাঁদের মধুর স্বরে গান গেয়েছেন। সংগীত-পরিচালনা করেছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সাথে সাথে শঙ্খধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হয় ওঠে। চণ্ডীপাঠে দেবী দুর্গাকে সনাতনী শক্তিরূপা গুণময়ী হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। তিনিই জ্যোতির্ময়ী নারায়ণী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, শিবদূতিনী ও নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডারূপে প্রকাশমতী। দেবী চণ্ডিকা চিন্ময়ী। তাঁর আদি নেই, তাঁর প্রাকৃত মূর্তি নেই।

মহালয়া আরাম্ভ মানেই পূজা আরাম্ভ। এক একটা দিন কিভাবে যে চলে যায় সেটা বুঝাই যায় না। চলে সেই আনন্দের দুর্গাপূজা। আমাদের সংগঠণের (তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ণ পরিষদ) সকলেই নিজেদের পূজা নিয়ে ভীষণভাবে ব্যস্ত থাকেন। আসলে নিজেরা পূজা না করলে বুঝাই যায়না দুর্গাপূজার কত কাজ, কত চিন্তা। আমাদের সংগঠনের সদস্যরা অধিকাংশ অন্যত্র পূজা দেখার সময়ও পান না। এ চারদিন মা যেন আমাদের সকলকে মন্দিরের মধ্যে মিলিয়ে রাখেন। আমরা অনুভব করতে পারি যে, মা আমাদের প্রাণে মিশে আছেন। আমরা শুধু পূজা আর্চনা করি না। তার সাথে সাথে পূজার অনেক অনুষ্ঠান মালা থাকে। যেমন– সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, রক্তদান কর্মসূচী, সিদুঁর খেলা, আরতী প্রতিযোগিতা এবং একদিন সকলের মাঝে প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠান। আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছে এই দুর্গাপূজার সময় ধনী-গরীবসহ সকল স্তরের মানুষের মাঝে আনন্দের ভাগ বিলিয়ে দেয়া এবং মিলেমিশে একত্রে সামনে পথ চলবো এ প্রত্যাশার শপথ নেয়া। সর্বশেষে আবারো একান্তভাবে স্মরণ করছি "তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদকে" আমাকে তাদের মাঝে স্থান দিয়ে এবং সকলের সাথে একত্রে মিলেমিশে কাজ করার সুযোগ দান করার জন্য।

পরিশেষে : প্রাণের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে অতিথি। আসছে শরৎ। আসছে উৎসব। অতিথির বরণের প্রস্তুতিতে নিমগ্ন এই বঙ্গভূমিতে ধীরোদাত্ত আনন্দের প্রকাশ ঘটছে সুললিত গতিতে। এই নাগরিকতায় দীর্ণ জীবনেও বাৎসরিক শারদ মহোৎসব আজও সাড়া জাগায়। একথা সত্য যে, বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকালে আনন্দের চেয়ে আশঙ্কার কারণ সংখ্যায় অধিক বলে বোধ হয়। অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়ও আজ বাংলার বুকে জাগরুক। তবু দিন যায় আর নতুন দিন আসে। আমরা মুখ ফিরিয়ে রাখি আগামীর দিকে। সেইদিকে তাকিয়েই নবকলেবরে সেজে ওঠে বাংলার শহর-গ্রাম, এবং সাজায় আশার আলোকমালা। এ সময় পরিবারের, নিজের মানুষজনকে আরও নিজের করে পাওয়ার, সন্তানের মুখে নতুন করে হাসি ফুটিয়ে তোলার, বাড়ির বড়দের পরিবারে আরও বড় স্হানে বরণ করে নেওয়ার। নিজের পরিবারের সঙ্গে পাশের মানুষের কল্যাণ কামনাও যে-কোনও উৎসবের মূল কথা। উৎসব কথাটির অর্থ 'যাহা সুখ প্রসব করে'। সুখ ও আনন্দ তো বটেই, সেই সুখ যেন সর্বজনের কাছে পৌঁছায়, সেজন্যই যেন 'উৎসব' শব্দটির মধ্যে 'সব' শব্দটি রয়ে গিয়েছে। এই বছর আমরা মনে রাখব, অন্তর্ভুক্তিই কাম্য। বাইরে রাখা নয়, অন্দরে ডেকে আনা, অন্তরে স্হান দেওয়া। ঘর থেকে বাইরের দিকে আমরা যেন হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। তার সঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য বাইরে আনতে, অন্তরের সঙ্গীত আকাশে বাতাসে ভাসিয়ে দিতে, ঘরের পরিচ্ছন্নতা বহির্জগতে উৎসারিত করতে, নব পরিধানের সঙ্গে মালিন্যমুক্ত সুচিন্তাবিধৌত চিত্তাকাশ লাভ করতে আমাদের প্রচেষ্টা চলতেই থাকবে। এই উৎসবের মরশুমে নতুন করে এই বাক্যটি হৃদয়ঙ্গম করার সময় এসে উপস্হিত হয়। সকলে সুখে শান্তিতে থাকুন। জলে, বায়ুতে, বাক্যে, মনে, চিত্তে, সর্বত্র সুধার সঞ্চার হোক। আনন্দের সঙ্গে বর্তমান থাকুক আমাদের প্রাণ প্রিয় সংগঠন "তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ"। সবাইকে শারদীয় দুর্গোৎসবে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। জয় মা দুর্গা।

IFAD Autos Limited
ASHOK LEYLAND
IFAD Multi Products Ltd.
ISO 22000:2005
IFAD Enterprises Limited
ELGi Equipments Ltd.
Industrial Air Compressors
ESCORTS
AGRI MACHINERY
IFAD Motors Limited
TVS
www.ifadgroup.com
Sonartori Tower, 12 Biponon C/A, Sonargaon Road, Dhaka-1000
E-mail: contact@ifadgroup.com, Phone: +88 02 9632753-7, Fax: +88 02 9632765
IFAD GROUP
Since 1985

শারদীয়া দুর্গা পূজা- ২০১৮

শিশির রঞ্জন দাস (বাবু)

শারদীয় দুর্গাপূজা। অকাল বোধন বলে। বোধন অর্থ জাগরণ। দেবী নিদ্রিতা। পূজার জন্য মাকে ঘুম থেকে জাগানো হয়। মা জগজ্জননী চৈতন্য স্বরুপিনী। তাঁর চৈতন্যই সব চৈতন্যময়। আমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ জড়ত্বের মোহে আচ্ছন্ন। চৈতন্য রাজ্যে উপনীত হতে হলে আমাকে জাগ্রত হতে হবে। আমি সুপ্ত। প্রার্থনার ফলে আমাদের সুপ্তি ভেঙ্গে যায়। আমরা জাগ্রত হয়ে উঠি। রাবন বধের জন্য রামচন্দ্র কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। মাঘ থেকে আষাঢ় ছয় মাস উত্তরায়ন, শ্রাবণ থেকে পৌষ ছয় মাস দক্ষিণায়ন। উত্তরায়নের সময় দেবতারা জাগ্রত থাকে। দক্ষিণায়নের সময় নিদ্রিত। শরৎকাল দক্ষিনায়নের মধ্যে। তাই দেবতারা নিদ্রিত। এই সময়ে তাঁদের পূজা করতে হলে, জাগ্রত করতে হবে। সে জন্য রামচন্দ্র দেবীর বোধন করলেন। মাকে জাগিয়ে তার পূজা করলেন। কৃত্তিবাসী রামায়নে রামচন্দ্রের শরৎকালীন এ পূজার বিষদ বিবরণ আছে। দেবীর বোধন বা পূজা কোনটাই রামচন্দ্র নিজে করেননি, করেছিলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই আদ্যশক্তি জগজ্জননী দেবী দুর্গা। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত জীবে দুর্গতিহরণ করার জন্য আবির্ভাব দেবী দুর্গার। দেবতাদের তপস্যা ও জ্যোতি সৃষ্ট আদ্যশক্তি মহামায়া দুর্গা নাম নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। দুর্গাকে করুণাময়ী নারী মূর্তিতে কল্পনা করেন। যিনি ব্রহ্ম, তিনি শক্তি, তিনিই দুর্গা। দুর্গাপূজা শক্তির আরাধনা দুর্বলের আত্মজ্ঞান হয় না। চাই শক্তির সাধনা। ব্রহ্মা পরিপূর্নতা লাভ শক্তিতে। শক্তির পরিপূর্ণতা ঘটে জগৎ সৃষ্টিতে, দুর্গা মহাশক্তিরই প্রতিক। মহাশক্তিকেই প্রতিমার মধ্য দিয়ে চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তিকে দর্শন করে। ব্রহ্মাবৈবর্ত পূরানে, রাজা, সুরথ চৈত্র মাসে শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে শাস্ত্র বিধিমতে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অর্চনা করেছিলেন। ভগবত ও কালিকা পুরানে এ পূজার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। শরৎকালে পূজা করতে হলে প্রথমে তাদের জাগরিত করতে হবে। এজন্য ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতার সাথে করজোড়ে দেবীর স্তব করলেন। হে দেবী, তুমি গিরিবাসীনি ও বিল্বদলবাসিনী। তুমি দুর্গা, দুর্গতিহারা, শান্তা, শান্তজনপ্রিয়া, পদ্মালয়া, পদ্মনয়না ও সহস্রদল বাসিনী। হে দেবী, তুমি লজ্জা, তুমি বুদ্ধি এবং তুমিই ত্রিবিধ প্রসধিনী, তোমাকে নমস্কার, স্তবে তুষ্ট দেবী কুমারী মুর্তিতে দেবতার সম্মুখে অবিভুত হয়ে বললেন। আপনারা বিল্বৃবৃক্ষমূলে দেবীর বোধন করুন।

আপনাদের প্রার্থনায় তিনি প্রবুদ্ধা হবেন। দেবগণসহ ব্রহ্মামতে এলেন এবং সেখানে দুর্গম নির্জন স্থানে বেলগাছের শাখায় সবুজ ঘন পত্ররাশির মধ্যে বিনিদ্রতা পরমাসুন্দরী এক বালিকা মুর্তি দেখতে পেলেন। এই মুর্তিই জগজ্জননী মহাদেবী ব্রহ্মার এইরূপ অনুভব হওয়ায় নতজানু হয়ে দেবগণসহ তিনি দেবীর বোধন স্তব পাঠ করলেন। হে দেবী, তুমিই যে মহাদেবী তা আমি নিশ্চিত রূপে জেনেছি। ভূতলে তোমার ক্রীড়াভূমি। তাই এখানে এসেছি। তুমি শত্রুরূপা, আবার মিত্ররুপাও বটে। বন্ধনকারিনী রুপে তুমি শত্রু আর বন্ধন মোচনকারিনীরূপে তুমি মিত্র। মহা যৌগগণ ধ্যানযোগে অন্তরে তোমাকে ধারণ করতে পারেনা। সেখানে যে শক্তির ক্রিয়া সকলেই তোমার। আমি ব্রহ্মা, আমার শক্তি ও তোমার তুমি সর্বশক্তি স্বরূপিনী। রাম ও রাবনের যুদ্ধে রামের শক্তি ও তোমার, রাবনের শক্তি ও তোমার। তুমি তোমার শক্তি নিয়ে রামচন্দ্রে রামচন্দ্রে প্রবর্তিত হও। জননী তুমি জাগরিত হও। ব্রহ্মার স্তবে দেবী জাগরিত হলেন এবং তাঁর বালিকামুর্তি ছেড়ে চন্ডিকারুপে প্রকাশিত হলেন। ব্রহ্মা বললেন ঐং রাবণ্যস্বধার্থায় রামম্যানু গ্রহায় চ। অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যা কৃতো ময়া।

অর্থাৎ মা অকালে তোমাকে ডাকছি রাবন বধে রামচন্দ্রকে অনুগ্রহ করার জন্য। আরো বললেন। যতদিন রাবনবধ না হয় ততোদিন তোমার অর্চনা করে যাব। বোধন করে তোমার অর্চনায় ব্রতী হয়েছি। যতকাল সৃষ্টি থাকবে, ততোকাল মানুষ তোমার অর্চনা করবে। তুমি কৃপা করে তোমার সর্বশক্তি দিয়ে রাবণ বধে রাম চন্দ্রের সহায় হও। স্তবে তুষ্টা দেবী বললেন। সপ্তমী তিথিতে রামচন্দ্রের দিব্য ধনুবানে প্রবেশ করবে। অষ্টমীতে রাম রাবনের মহাযুদ্ধ হবে। অষ্টমী- নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবনের দন্ডমুন্ড ছিন্ন হবে। সেই ছিন্নমুন্ড পুনর্যোজিত হলে নবমীতে রাবন নিহত হবে। দশমীতে রামচন্দ্র বিজয় উৎসব করবে। দেবীর অনুগ্রহ রামচন্দ্র রাবনকে বধ করে সীতা দেবী কে উদ্ধার করলেন। মহাবিপদ কেটে গেল বলে অষ্টমীর নাম হলো মহাষ্টমী- মহা সম্পদ লাভ হলো বলে নবমীর নাম মহা নবমী। রাম চন্দ্রের দুর্যোগের স্মরণ করেই আমাদের শারদীয় মহাপূজা। দেবীর অনুগ্রহে রামচন্দ্র রাবনকে বধ করে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। সীতারুপী মহাসম্পদ লাভ করেছিলেন। আমরা দেবীর বোধন ও পূজা করে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো আর কী মহাসম্পদই বা লাভ করব ? উত্তরে বলা যায়, যিনি পূজক তিনি স্থিত শ্রীরামের ভূমিকায়। সংসারাশ্রয়ী নরনারীর দারিদ্রই মহাবিপদ, ঐশ্বর্যই মহাসম্পদ আর জীবনমাত্রই যুদ্ধ। ওই যুদ্ধে জয়লাভ করে মহাবিপদ অব্যাহতি পেয়ে মহাসম্পদ লাভ মায়ের অনুগ্রহেই হয়ে থাকে। যারা যোগী, সাধনই তাদের সমর। বিষয় বন্ধন তাদের মহাবিপদ, মুক্তিলাভই মহাসম্পদ। জগজ্জননীর অর্চনায় যোগী সাধক সমরে জয় লাভ করেন। তার ভববন্ধন ছিন্ন হয়। তিনি মুক্তিসুখে ডুবে থাকেন। যারা জ্ঞান মার্গের সাধক অজ্ঞানতাই তাদের মহাবিপদ। ব্রহ্মা জ্ঞানই পরম ধর্ম। মহাদেবীর অর্চনায় সাধন যুদ্ধে তারা জয় লাভ করেন। জগজ্জননী নিজেই মুর্ত ব্রহ্মাজ্ঞানরুপিনী যারা ভক্তি পথের উপাসক,

তাদের হৃদয়ের ভক্তিরুপিনী সীতা দেবীকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল রাবণ- এ বেদনা তাদের বেদনাতুর করে। যোগমায়া কাত্যায়নীর আরাধনায় মহাপরাধিরুপী দশননের বধ হয় মহাষ্টমীতে, প্রেম ও ভক্তিরুপিনী সীতার উদ্ধার হয় মহানবমীতে। দশমীতে এ পরম সত্য অনুভূতিকে হৃদয়ের গভীর তলদেশে চিত্তদর্পণে নিরঞ্জন করে ভক্ত সাধক বিশ্বমানবকে ভাই বলে আলিঙ্গন করে। দ্বন্দ্বময় জগতের মানুষ অন্তরে ও বাইরে শত্রুদ্বার পরিবেষ্টিত। ধনী নিধনের সজ্ঞাত, উচ্চ ও নীচের ভেদ, সবলের হস্তে দুর্বলের নির্যাতন এসব মানুষের বাইরের

শত্রু। এদের দৌরাত্ম্যে জগতে আজ মানবিক বিপর্যয়। তাই যুদ্ধে এদের পরাভূত করতে না পারলে মানুষের জাগতিক অগ্রগতি ও অভ্যুদয় অসম্ভব। অপর পক্ষে দুর্দমনীয় ভোগ লালসা, দম্ভ দর্প অভিমান, ক্রোধ মানুষের অন্তশত্রু, সাধকের সাধনায় অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। এগুলো বিশ্বাস করতে না পারলে সাধক জীবন অগ্রসর হওয়া সুদূর পরাহত । তাই বোধনের এ পূণ্যলগ্নে আসুন দেবতাদের মতো আমরাও সংকল্প গ্রহন করি। হে দেবী যতদিন পর্যন্ত না আমাদের বাহ্য ও অন্তর শত্রুরুপী রাবনকে আমরা যুদ্ধে পরাভূত ও বধ করতে পারছি। ততোদিন আমরা তোমার অর্চনা থেকে বিরত হবোনা। হে সর্বশক্তি স্বরুপিনী দেবী তুমি কৃপা করে সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুবিনাশে সর্বতোভাবে আমাদের সহায় হও। তোমার কৃপায় রামচন্দ্রের মতো আমাদেরও যেন মহাবিপদ কেটে গিয়ে মহাসম্পদ লাভ হয়। বঙ্গদেশে মা দুর্গার যে কাঠামো সচরাচর আমরা দেখতে পাই তা হল সাতটি মুর্তি মধ্যে দেবী দুর্গা, তাঁর দক্ষিণে ওপরে লক্ষী,নীচে গনেশ, বাম পাশে ওপরে সরস্বতী, নীচে কার্তিক, পদতলে এক দিকে সিংহ পৃষ্ঠে ও বাঁ পায়ের শ্রুতঅঙ্গুলী অসুরের স্কন্ধে স্থাপিত। হে পরিবার সমন্বিতা ভক্তিসুলভে সুরশ্রেষ্ঠা দুর্গা, যতক্ষণ তোমার পূজা করব, ততক্ষণ ধরে স্থিরভাবে অবস্থান করো অচঞ্চল থাক। শরৎকালের মহাপূজায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে দেবীর অধিষ্ঠান হয় প্রধানত কন্যা রূপে। কার্তিক ও গনেশ দেবীর পরিবারভূক্ত। বাঙ্গালী হিন্দুরা মনে করেন শারদোৎসবের মাধ্যমে কন্যাস্থানীয় দেবী সপরিবারে তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে আগমন করেন। আসে দুর্গারানী ধনদাত্রী, লক্ষী, বিদ্যাদায়িনী স্বরস্বতী, শৌর্যবীর্যের প্রতীক কার্তিকের সিদ্ধিদশা গনেশ ও তাদের বাহন। সবার মুর্তিসহ মহামহিয়সী দুর্গামুর্তির পরিকল্পনা ও পূজা বাংলার নিজস্ব। দুর্গা শব্দটি বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক । যিনি দুর্জেয়। যার তত্ত্ব দূরধিগম্য তিনিই দুর্গা। তুমি কৃপা করো যারে, সে তোমারে জানতে পারে। “দ” অক্ষরটি দেত্যনাশক “উ” পাপনাশক “অ” কার ভয়নাশক অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, ভয় ও শত্রু থেকে যিনি রক্ষা করেন তিনিই নিত্যদুর্গা নামে খ্যাত। তিনি সমস্ত শক্তির আধার। নিখিল দেবগণের শক্তির ঘণীভূত মুর্তি, তিনি স্নেহময়ী জননী তার নয়ন থেকে করুনাধারা সতত বর্ষিত হচ্ছে। “মায়ের স্নেহ চক্ষে প্রেম বক্ষে অমিয় করে। যুদ্ধে যখন তিনি অতি ভাষনা তখনো তার আঁখি করুণায় ঢল ঢল। চিত্তে কৃপা এবং সমরে নিষ্ঠুরতা; হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপদ কঠোরতা মায়ের মধ্যে এই দুইভাবের অপূর্ব সমন্বয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে শারদীয়া উৎসব পালিত হচ্ছে। বিশাল আড়ম্বর করে পালিত হয়। অন্যদিকে বর্তমান বিশ্বে ধর্মে ধর্মে হানা হানি বাড়ছে। ধর্ম যার যার উৎসব সবার ভাল কথা হৃদয়ে ছোয়া কথা, উৎসবের মাঝেও ঘটে যায় বহু অনাকাঙ্খিত ঘটনা যা কোন ধর্মীয় মানুষের কাছে কাম্য নয়। শান্তি সম্পৃতি ও সাম্যই প্রতিটি ধর্মের মর্মবাণী। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যেন অবাধে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রতিটি দেশের সরকার ও সমাজের । এ পৃথিবী ছেড়ে আমাদের সবাইকে পরপারে যেতে হবে। সে কথা মনে রেখে প্রত্যেক মানুষকে মানবতা বিরোধী উন্মাতার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। এটাই হোক বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে মা দুর্গার আহ্বান। একই সাথে আমরা ধর্ম পালন করতে গিয়ে অন্যদের ধর্ম পালনে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। তাই আযানের সময় শংখ বাদ্য বাজানো উচিত নয়, এতে করে সংঘাত সৃষ্টি হয়। এ বৃহৎ উৎসবে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। অনেক সময় ক্ষুদ্র ঘটনা নিয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করে। তাই সকলকে ধৈয্য ধারণ করে যে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা মোকাবেলা করতে হবে। আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্য করিই না সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। এটাই সনাতন ধর্মের মূল মন্ত্র। তাই বিবাদ নয়। সহায়তা বিনাশ নয় পরস্পরের ভাবগ্রহণ, মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শক্তি, হিংসা, ক্রোধ, হত্যা নির্যাতন দেখতে চাইনা এ ধরণীতে। শিবম সত্যম সুন্দরম, দুঃখের পৃথিবীটা হোক আনন্দ আশ্রম। এটাই হোক প্রতিটি ধর্মের অনুযায়ী মানুষের কামনা। বাংলাদেশ হাজার বছরের সম্প্রীতির দেশ। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এ দেশ সবার। শারদীয়া উৎসবের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা। সকলের প্রাণের আনন্দে এ উৎসবকে মহিমান্বিত করে তুলি। এই শুভ কামনাই রইল।

সবার প্রতি অভয়দায়িনী মা দুর্গা মঙ্গল করুক। দুর্গা পূজা উপলক্ষে সবার সাফল্য ও সুখ সমৃদ্ধি হবে এ কামনা । সবার প্রতি রইল সশ্রদ্ধ প্রনাম ও নমস্কার, সকলের উপর মা দুর্গার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। মাতৃকৃপায় সবার জীবন আলোকিত হোক এ প্রার্থনা করছি।

কলামিষ্ট, সদস্য বাংলা একাডেমি।

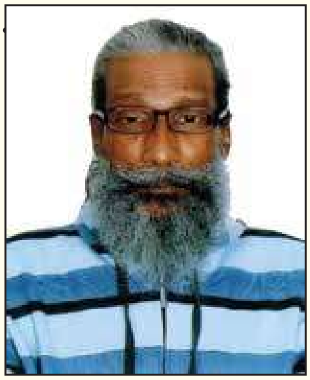

Ratneswar Das
Chairman

Shantanu Das Bappi
Managing Director

Sonjib Das Bachhu
Director

AGRADOOT TRADERS LIMITED

Customs Clearing & Forwarding Agent

For, Airport-Dhaka, ICD-Kamalapur, Pangaon, DEPZ-Savar, Akhaura, Benapole, Mongla and Chittagong

At Your Service Since 1975

Head Office

Centre Point Concord, 6th floor, Room # 6C
14/A & 31/A Tejkuni Para, Farmgate, Dhaka-1215
Tel: 01711-528220, 58156897, 9145348, 9133731 # Fax: 88-02-9113005
E-mail: agradoot75@gmail.com

Chittagong Branch

1724, Sk. Mujib Road, 1st floor
Agrabad C/A, Chittagong

Mongla Branch

5 K.D.A C/A, KCCI Building, 6th Floor, Jessore Road, Khulna

Benapole Branch

Opposite of 03 No. Customs Godown Gate, Benapole

Enlisted Bank (LIM): Islami Bank BD Ltd. and Al-Arafah Islami Bank Ltd.

We are 24 Hours Open for your Car Service
All kinds of reconditioned Car, Motor parts, Engine Importer, wholeseller and total solution by Computerized
OUR PRESENT BRANCHES:
Baridhara-1
Road #08, Plot #17, Block # J, Baridhara Diplomatic Zone, Vatara, Dhaka-1212
Baridhara-2
Road #13, Plot #3, Block # J, Baridhara Diplomatic Zone, Vatara, Dhaka-1212
Baridhara-3
Road #13, Plot #02, Block # J, Baridhara Diplomatic Zone, Vatara, Dhaka-1212
Swadesh Khulna
A/31, Mojid Swarani Sona Danga Road Khulna. Cell: 01715648703
Swadesh-Motijheel
151, Motijheel C/A. (Behind Wapda petrol pump) Dhaka Cell: 01989733408
Swadesh-Chittagong
Noor Nagar Housing Society, Baddar Hat 1 Kilometer, Chittagong Cell: 01728653890
Proposed Branches
Uttara, Feni, Rangpur, Barishal, Mymensingh, Sylhet, Rajshahi
SWADESH AUTO LTD. ★ SWADESH MOTORS ★ SWADESH CNG CONVERSION ★ SWADESH RENT A CAR
SWADESH AUTO TRAINING INSTITUTE ★ SWADESH DRIVING TRAINING INSTITUTE
Corporate Office: Road # 13, Plot # 3, Block # J, Baridhara Diplomatic Zone, Vatara, Dhaka-1212 Cell: 01818214751, 01712287659, Phone: 02-58812198, 02-8836765

দেবী দুর্গার আগমন ও প্রভাব

হেনাবসু মজুমদার

দেবী দুর্গার পরিচয় ঃ

দুর্গা শব্দের অর্থ হলো দুর্গতিনাশিনী দেবী অর্থাৎ এ মহা বিশ্বের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট বিনাশ কারিনী দেবী। তিনি ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। একবার মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। তখন দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন দুর্গা।

দেবী দুর্গার রূপ ঃ

দেবী দুর্গা দশভুজা। তাঁর দশটি হাত ও তিনটি চোখ রয়েছে। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কপালের উপর অবস্থিত চোখ-জ্ঞান বা অগ্নি নির্দেশ করে। তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে। যা শক্তির প্রতীক এবং শক্তিধর প্রাণী সিংহ তাঁর বাহন। দেবী দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মত সোনালী হলুদ। তিনি তাঁর দশ হাত দিয়ে দশ দিক থেকে সকল অকল্যাণ দূর করেন এবং আমাদের কল্যাণ সাধন করেন। দেবীর ডান দিকের পাঁচ হতে পাঁচ প্রকার অস্ত্র ও বামদিকে পাঁচ হাতে পাচঁ প্রকার অস্ত্র আছে। এ' সকল অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক।

উৎসবের সময় ঃ

পৃথিরবীর বিভিন্ন দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রথা ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের শারদীয় এবং চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের বাসন্তী দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। মহালয়ের উদ্‌যাপনের মাধ্যমে দেবী দুর্গার আগমনে ঘোষিত হয়। আশ্বিন মাসে শুক্ল পক্ষেল ষষ্ঠী তিথিতে প্রতিমা স্থাপন করে দুর্গোৎসব শুরু হয় এবং পাঁচ দিন ব্যাপি এই উৎসব চলতে থাকে।

ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীপূজার মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হয়। ষষ্ঠীপূজার পর হয় মহাসপ্তমী পূজা। দুর্গোউৎসবে অষ্ঠমীপূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূজা। এদিনে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করে বিজয় লাভ করেছিল। কোন কোন জায়গায় অষ্ঠমীর দিন কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে কেবল রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজা হয়। নবমী তিথিতে দেবীদুর্গার নবমী বিহিত পূজা করা হয়। দশমী তিথিতে দেবী দুর্গার দশমী বিহিত পূজা করে দেবীদুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। চারদিন থেকে দেবীদুর্গা ছেলে মেয়েদের নিয়ে কৈশালে যাত্রা করেন। দেবীদুর্গার ডানদিকে অবস্থান করেন লক্ষ্মী ও গণেশ এবং বামদিকে সরস্বতী ও কার্তিক। দেবী লক্ষ্মী ধনসম্পদের প্রতীক। গণেশ জনশক্তির প্রতীক। সরস্বতী জ্ঞানশক্তির প্রতীক ও কার্তিক ক্ষাত্র শক্তির প্রতীক।

দেবী দুর্গার প্রণামমন্ত্র ঃ

হে দেবী সর্বমঙ্গলা, শিবা, সর্বার্থ সাধিকা, শরণযোগ্যা, গৌরি ত্রিনয়না নারায়নি তোমাকে নমস্কার।

দুর্গাপূজারর প্রভাব ঃ

দুর্গাদেবীর পূজায় সমাজের সকল শ্রেণির লোকই প্রয়োজন। দুর্গাপূজার প্রভাবে আমাদের মধ্যে অন্যোয় অবিচারকে প্রতিহত করার শক্তি জাগ্রত করে। সকলের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে। তাঁর দশ হাত কর্মের প্রতীক। তাই তিনি আলস্য নিদ্রা, তন্দ্রা, নির্জীবতা, মহাপাপ দূর করে জাতির মধ্যে কর্মশক্তি জাগিয়ে তোলেন। জাতির জন্য সকল প্রকার অশুভ বিনাশ করার জন্যই তিনি দশ প্রহরনধারিনী। সার্বিকভাবে দুর্গাপূজা এক মিলন মহোৎসব এবং আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার অপূর্ব সম্মিলন।

জেস্ট এডমিশন এন্ড একাডেমিক কেয়ার

প্রকৃত সৃজনশীল শিক্ষার আলোকিত ভূবন

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ৫০% ছাড়

কার্যক্রম সমূহঃ

একাডেমিক:

* ৫ম - ৮ম শ্রেণি

শিক্ষকবৃন্দ:

ঢাবি, জাবি, জবি, ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সেরা কলেজ সমূহের মেধাবী শিক্ষার্থী।

বিষয় ভিত্তিক:

* পঞ্চম - দ্বাদশ
* বাংলা, ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান, BGS & ICT.
* বিজ্ঞান বিভাগ: ৯ম - দ্বাদশ
* ব্যবসায় শিক্ষা: ৯ম - দ্বাদশ
* মানবিক বিভাগ: ৯ম - দ্বাদশ

শিক্ষকবৃন্দ:

ঢাবি, জাবি, জবি, বুয়েট ও ঢাকা কলেজের বিষয় ভিত্তিক সেরা মেধাবী শিক্ষার্থী।

ভর্তি:

* ৬ষ্ঠ শ্রেণির হলিক্রস স্কুল ভর্তি
* ৯ম শ্রেণির হলিক্রস স্কুল ভর্তি
* হলিক্রস কলেজ ভর্তি
* স্বনামধন্য সরকারী/বেসরকারী স্কুল ভর্তি
* বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি (সকল ইউনিট)

শিক্ষকবৃন্দ:

ভর্তি জগতে সেরা স্কুল/কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। এছাড়াও প্রাক্তন স্কুল/ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সারির মেধাবী শিক্ষার্থী।

ফার্মগেট শাখা:

পরিচালক- ০১৭৩৫-৮৯১৯৩৬

অফিস: ০১৬৪০-৭৩৪৪৩৭

শারদীয় শুভেচ্ছা
১৪২৫

On Going Project (Tejkunipara)

On Going Project (Ibrahimpur)

Handover Project, 2016

--- নিজেদের জন্য করি---

ফ্ল্যাট বুকিং চলিতেছে...

লোকেশন ঃ ইব্রাহিমপুর

ফ্ল্যাট সাইজ ঃ ১২৫০, ৮৫০ (কম বেশি)

ডায়মন্ড স্টার হাউজিং লিঃ

হটলাইনঃ ০১৭৪৫-১৫১৮৯৪

ই-মেইলঃ amithalder1122@gmail.com

A Product of
BASHUNDHARA GROUP
For the People, for the Country

ইউরোপিয়ান প্রযুক্তিতে তৈরি বাংলাদেশের সেরা নুডল্‌স

বসুন্ধরা নুডল্‌স

স্বাদে Yummy
হাউজফুল Tummy

বসুন্ধরা ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
The Home of Nutrition

কাস্টমার কেয়ার ঃ ১৬৩৩৯

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

সচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন

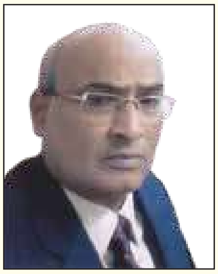
প্রফেসর স্বপন কুমার বনিক

নিতাই চন্দ্র সাহা

আশীষ কুমার সরকার

প্রণয় কান্তি বিশ্বাস

চন্দন কুমার দে

সঞ্জীব কুমার সাহা

ড. গৌরাঙ্গ মোহন্তা

রথীন্দ্র নাথ দত্ত

গৌতম কুমার ঘোষ

আনন্দ মোহন মন্ডল

বাবুল চন্দ্র রায়

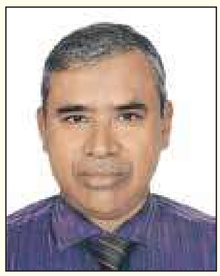
অজিত কুমার দেবনাথ

খোকন কান্তি শর্মা

প্রকৌশলী সনজিত কুমার ঘোষ

বিমল কুমার সাহা

প্রণব সাহা

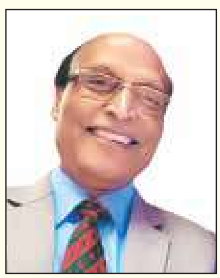
প্রণব কুমার সাহা

অমলেন্দু রায়

ডাঃ চন্দ্র শেখর বোস

ডাঃ রনধীর কুমার কুণ্ডু

ডাঃ সুশংকর কুমার মন্ডল

ডাঃ দেবব্রত হালদার

সঞ্জয় চ্যাটার্জী

মহাদেব ঘোষ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

সুবল চন্দ্র রায়

অরুণ কুমার সাহা

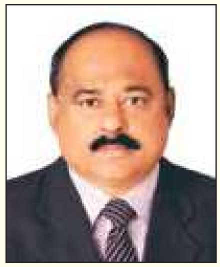
সুজিত চ্যাটার্জী

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

জীবন কৃষ্ণ মোদক

বিপুল কুমার বিশ্বাস

প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার

ইঞ্জি. ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

অনুপ কুমার সাহা

অপূর্ব কুমার রাহুত

বিষ্ণুপদ রায়

গোপাল চন্দ্র দেবনাথ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

বিপ্লব কুমার সরকার

লিটন কুমার দাস

নিতাই চন্দ্র মণ্ডল

সঞ্জীব কুমার বণিক

ডাঃ মৌসুমী সরকার

চন্দন কুমার সাহা

নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মধু সূদন মন্ডল

বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

অখিল বিশ্বাস

তাপস কুমার সাহা

বিশ্বজিৎ কুমার কর্মকার

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

প্রদীপ কুমার সাহা
সভাপতি

শান্তনু দাস বাপ্পী
সহ-সভাপতি

সঙ্গীত কুমার ঘোষ
সহ-সভাপতি

প্রমোদ রঞ্জন রায়
সহ-সভাপতি

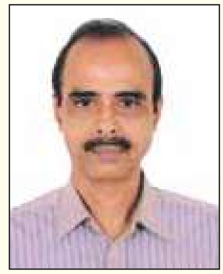
নেপাল দে
সহ-সভাপতি

ভবেশ গোস্বামী
সহ-সভাপতি

শিশির রঞ্জন দাস
সহ-সভাপতি

দীপক লাল কর্মকার
সহ-সভাপতি

সুখলাল নন্দী
সাধারণ সম্পাদক

অশোক ধর
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

অরুন চন্দ্র ভৌমিক
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

হীরালাল বাইন
অর্থ সম্পাদক

প্রিয়লাল শর্মা
সহ: অর্থ সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় রায়
সাংগঠনিক সম্পাদক

শ্যামল মিত্র
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

বিশ্বজিত রায়
দপ্তর সম্পাদক

প্রবীর কুমার সরকার
প্রচার সম্মাদক

প্রকাশ কুমার দাস
সহ প্রচার সম্মাদক

এড. বিনয় কৃষ্ণ পোদ্দার
আইন বিষয়ক সম্পাদক

গোপাল চন্দ্র দত্ত
গণ সংযোগ সম্পাদক

সঞ্জীব মৈত্র
গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

রতন কুমার রায়
সহ গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

অরুণ চৌধুরী
সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মানিক লাল দাস
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

কেশব সেন
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

রনধীর বিশ্বাস
ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক

কবিতা রাণী পাল
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

নমিতা চক্রবর্তী
সহ মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

অসীম কুমার দাশ
ছাত্র যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক

দীপ্তি সাহা
পূজা বিষয়ক সম্পাদক

মিনা ভৌমিক
সহ পূজা বিষয়ক সম্পাদক

সুবিমল শিকদার
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

পরিমল কুমার বিশ্বাস
সদস্য

শ্যামল কুমার দাস
সদস্য

বকুল রানী দেবী
সদস্য

রনজিৎ কুমার পাল
সদস্য

রনজিৎ কুমার সরকার
সদস্য

লিটন চন্দ্র দাস
সদস্য

মিলন কৃষ্ণ দাস
সদস্য

সনৎ দত্ত
সদস্য

বাবুল চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

গৌর চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

সুভাষ মজুমদার
সদস্য

যদু নাথ ঘোষ
সদস্য

সুদীপ কুমার ভদ্র
সদস্য

স্বাগতম কুমার সাহা
সদস্য

উজ্জ্বল কুমার বৈদ্য
সদস্য

অমরেশ চন্দ্র দাস
সদস্য

ইঞ্জি. উত্তম কুমার দাস
সদস্য

মিতালী রায় চৌধুরী
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

কনিকা রানী পাল

গৌরী কর্মকার

স্বর্ণা সেন

মিনি রানী কীর্ত্তনীয়

মিনতি শর্মা

রীতা রায়

মাধবী প্রভা দাস

মনিকা শর্মা

টুম্পা দাস

দুলাল দেবনাথ

নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চন্দন দেবনাথ

সঞ্জয় কুমার দাস

নির্মল কান্তি ওঝা

বিজন বিশ্বাস

রাম প্রাসাদ

জয়শ্রী শর্মা

নারায়ন চন্দ্র দে

সমীর চন্দ্র দত্ত

আলোকা রাণী সরকার

চঞ্চল চৌধুরী

বিমল কৃষ্ণ দেব

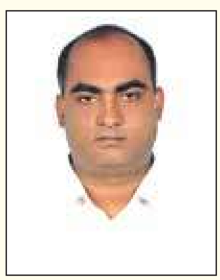
স্বপন দাস

চঞ্চলা সরকার

পরিমল চন্দ্র পাল

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

প্রদীপ কুমার সাহা

উষা রাণী দত্ত

গোবিন্দ হালদার

বিপুল কান্তি রায়

রতন বিশ্বাস

প্রদীপ কুমার বাড়ৈ

প্রদীপ কুমার সেন

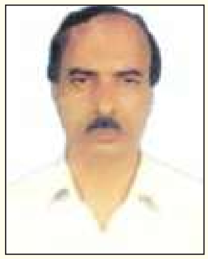
দেবেশ চন্দ্র সরকার

ঝন্টু চন্দ্র সাহা

সাগর মজুমদার

তনুশ্রী রাণী পাল

সুপ্রীয়া রাণী সাহা

রতন কুমার মিত্র

ছোটন কুমার দে

সুমন ঘোষ

রতন কুমার মজুমদার

সুমন দে

ভবেশ কুমার শর্মা

নির্মল চন্দ্র নাথ

সজ্জিত কুমার দেবনাথ

শংকর কর্মকার

প্রণব কুমার রায়

তপন মিত্র

রীতা অধিকারী

বিমল হালদার

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

ইঞ্জি. সুব্রত দেবনাথ

শিবু কুমার দাস

অসীম কুমার দে

অনন্যা রায় তমা

সুজিত দেবনাথ

রঞ্জিত কুমার নাথ

মিহির মজুমদার

রিপন সাহা

দীপক কুমার দাস

প্রদীপ কুমার পাল

নীতিশ কুমার দাশ

তাপসী ঘোষ

বিউটি রাণী ঘোষ

মৌসুমী রায়

রাজীব দাশ

দেবব্রত চক্রবর্তী

Famous brand of Taiwan
এখন ঢাকার বনানী, গুলশান, ধানমণ্ডি ও উত্তরায়
SOMEWHERE WE
Brewlong
Chatime
YOU ARE ALL INVITED
Banani branch :
Bulu Ocean Tower, 40 Kamal Ataturk Avenue (1st Floor)
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
Dhanmondi branch :
67 Satmasjid Road, GH Heights (4th floor) Dhanmondi
Dhaka-1207, Bangladesh
Gulshan branch:
114 Gulshan Avenue (1st Floor), Dhaka, Bangladesh
Uttara branch:
Uttara, Sector 9, Sonargaon Jonopoth Avenue
Gulshan-1 branch :
22 crystal palace (2nd Floor), South Avenue
Gulshan-1, Dhaka-1212
Chatime
তাইওয়ানের বিখ্যাত ব্র্যান্ড

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি

কমল চন্দ্র রায়
সভাপতি

সুজিত ঘোষ
সহ সভাপতি

বিক্রম চন্দ্র দাস
সহ সভাপতি

রতন কুমার সরকার
সহ সভাপতি

শুভ্র দেব মিত্র
সহ সভাপতি

অনিন্দ রায়
সহ সভাপতি

অশ্রু রায়
সহ সভাপতি

অজয় কুমার সরকার
সহ সভাপতি

সবুজ চন্দ্র দাস
সাধারণ সম্পাদক

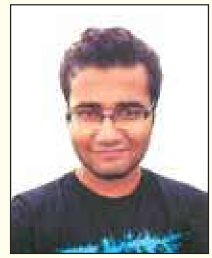
বিনয় শর্মা
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

পার্থ বাড়ৈ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

সাগর ঘোষ
আইন বিষয়ক সম্পাদক

শাওন মিত্র
কোষাধ্যক্ষ

দেবব্রত রায় শুভ
সাংগঠনিক সম্পাদক

দীপ্ত রায়
সাংগঠনিক সম্পাদক

রাহুল চন্দ্র দাস
সাংগঠনিক সম্পাদক

মিহির মন্ডল
দপ্তর সম্পাদক

সমীর রায়
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

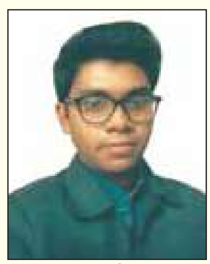
মেঘনাথ বিশ্বাস
সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক

সজল দাস
শিশু কিশোর বিষয়ক সম্পাদক

অঞ্জন শর্মা
পুজা ও ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

চৈতি শ্রী পর্না দত্ত
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক

আশিষ মল্লিক
সদস্য

সুরঞ্জিত গুপ্ত
সদস্য

শ্রাবণ মজুমদার
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি

হৃদয় সরকার
সদস্য

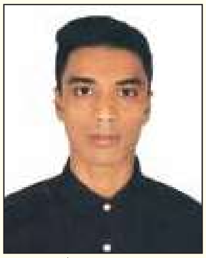
সৌরভ সুর
সদস্য

হৃদয় শর্মা
সদস্য

সাগর মন্ডল
সদস্য

দুর্জয় চন্দ্র দাস
সদস্য

ভাস্কর পান্ডে
সদস্য

বিবেক রায়
সদস্য

মিলন দত্ত
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

অদ্রি দাশ কথা

প্রিয়াংকা শর্মা

প্রকৃতা বাইন পাড়ড়ি

তিথি ঋতৃপর্ণা দত্ত

অর্পিতা পাল

মিলেনিয়াম রায় পুজা

অদিতি বিশ্বাস

শাশ্বতি বিশ্বাস

অমিত মজুমদার

শিশির মন্ডল

অন্তর চন্দ্র দাস

অমিত মন্ডল

উমেশ চন্দ্র ঘোষ

নিলয় চন্দ্র দাস

সমীরণ কুমার ঘোষ

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

মনোজ ঘোষ

রাহুল কান্তি সরকার

সৈকত চন্দ্র দাস

অভিজিত রায়

ঝন্টু বাগচী

নরোত্তম মল্লিক

অনুপম পাত্র

নয়ন চন্দ্র দাস

নীহার রঞ্জন বাড়ৈ

রানা চন্দ্র দাস

সজল কুমার বিশ্বাস

শুভ চন্দ্র দাস

অপু দাস

দীপ্ত ঘোষ

দীপঙ্কর হালদাল

প্রীতম কৃষ্ণ ঘোষ

অনুপম মন্ডল

পংকজ রায়

প্রসেনজিৎ বর্মন

বিধান বাড়ৈ

অজয়

সবুজ বাড়ৈ

সুবীর বাড়ৈ

নান্টু চন্দ্র দাস

সুদাম চন্দ্র দাস

অনুপ হালদার

স্বপন চন্দ্র দাস

প্রনব বাড়ৈ

অনিক চন্দ্র দাস

প্রীতম বিশ্বাস (দ্বীপ)

পাপিয়া বাইন

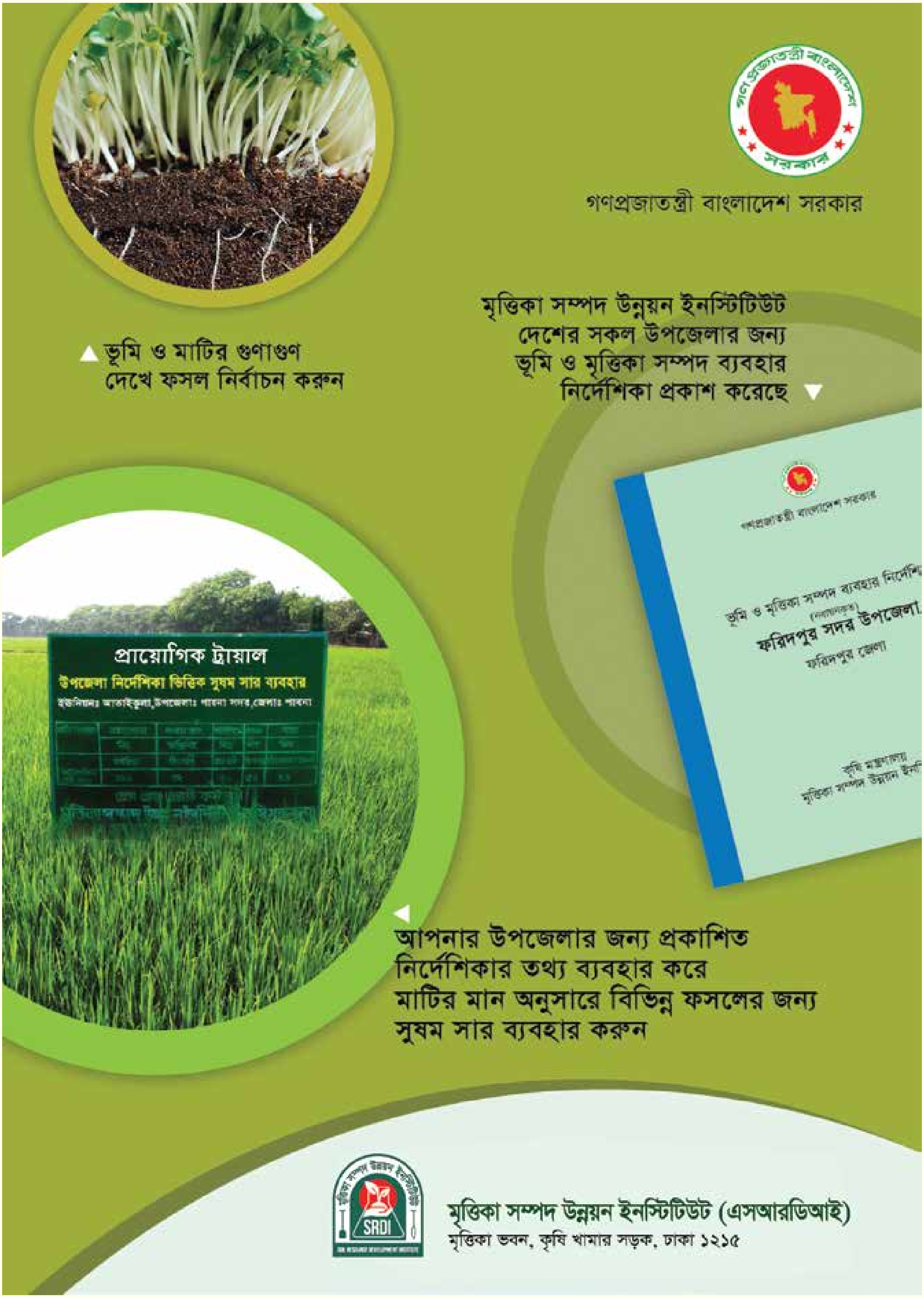

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি ও মাটির গুণাগুণ দেখে ফসল নির্বাচন করুন
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট দেশের সকল উপজেলার জন্য ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফরিদপুর সদর উপজেলা
ফরিদপুর জেলা
প্রায়োগিক ট্রায়াল
উপজেলা নির্দেশিকা ভিত্তিক সুষম সার ব্যবহার
আপনার উপজেলার জন্য প্রকাশিত নির্দেশিকার তথ্য ব্যবহার করে মাটির মান অনুসারে বিভিন্ন ফসলের জন্য সুষম সার ব্যবহার করুন
SRDI
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)
মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা ১২১৫

দূর্গাপুজার প্রীতি

শুভেচ্ছা

ও অভিনন্দন

এন সি এল

শান্তিনগর, ঢাকা।

আজকের সঞ্চয় দুর্দিনের বন্ধু

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

মাসিক সঞ্চয় জমা, মাসিক সঞ্চয় ডিপোজিট (এম.এস.ডি), লোন প্রদান, হাউজিং প্রজেক্ট, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প, হাসপাতাল প্রকল্প, পরিবহন প্রকল্প, বিশুদ্ধ জল বোতলজাত প্রকল্প, সমবায় বিপনী প্রকল্প, হোম সার্ভিস প্রকল্প বৃদ্ধা আশ্রম প্রকল্প সহ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ করা।

❖ আপনার ইচ্ছাই সঞ্চয়ের সাহস যোগায়।
❖ আজকের সঞ্চয় আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।
❖ মিতব্যয়ী হোন, সঞ্চয় করুন।
❖ সঞ্চয় যার, উন্নতি তার।

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ:-এ সঞ্চয় করুন এবং স্বাবলম্বী হোন

সমিতির মূল লক্ষ্য ঃ

সমিতির সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অত্র প্রতিষ্ঠানকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। সদস্যদের আর্থিকভাবে সচ্ছলতার মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করা।

সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যবলী ঃ

(ক) আর্ত, পীড়িত, নির্যাতিত ও সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সহযোগিতা করা।
(খ) সদস্যদের সঞ্চয়মূখী করার লক্ষ্যে তাদের উদ্বুদ্ধ করে পারিবারিক সমাজিক ও রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করা।
(গ) প্রতিষ্ঠানের তহবিল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।
(ঘ) সদস্যদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব পেশায় প্রতিষ্ঠিত করা।
(ঙ) সদস্যদের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা।
(চ) বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।
(ছ) দরিদ্র ও দুঃস্থদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ক্লিনিক/ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।
(জ) সদস্যদের গৃহায়ন সমস্যা দূরীকরনের লক্ষ্যে হাউজিং প্রকল্প চালু করা।
(ঝ) সাধারণ ও কর্মমূখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
(ঞ) মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা।

সদস্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকা ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে সমিতির কার্যক্রম ঢাকা মেট্রোপলিটন শহর ও তৎসংলগ্ন উপ-শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে ভবিষ্যতে সমিতির কর্ম এলাকা সমগ্র বাংলাদেশের যে কোন জেলা/উপজেলা/বিভাগীয় শহরের মধ্যে নিয়মানুযায়ী বৃদ্ধি করা হবে।

সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ

(ক) যারা রাষ্ট্র বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত নাই কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে দণ্ডিত নাই।
(খ) যারা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে কাজ করতে আগ্রহী।
(গ) যারা সমবায় ভিত্তিক কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
(ঘ) যারা নিয়মিত ও নির্ধারিত চাঁদা/সঞ্চয় প্রদানে সক্ষম।
(ঙ) যারা অত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধানের প্রতি অনুগত থাকবেন।
(চ) ১৮ (আঠার) বছর বয়সোর্ধ সনাতন ধর্মাবলম্বী সকল নারী/ পুরুষ। তবে ১৮ বছরের নিচে অথাৎ নাবালকের ক্ষেত্রে তার অভিভাবক উক্ত হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।

ভর্তির নিয়মাবলী ঃ

১) সদস্যদের ভর্তি ফি ১০০/= টাকা।
২) মাসিক সঞ্চয় ১০০/= টাকা তবে সদস্যবৃন্দ ইচ্ছা করলে ২০০/=, ৫০০/= ১,০০০/= অথবা আরো বেশী সঞ্চয় করতে পারবেন। জমার আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ পাবেন।
৩। ভর্তির সময় ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, নমিনির ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ও নমিনির জাতীয় পরিচয় পত্র (যদি থাকে) জমা প্রদান করতে হবে।

অস্থায়ী ঠিকানা ঃ মেডিসিন কর্নার, ১৮১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
যোগাযোগ ঃ ০১৭১১ ৯০৫২৬০, ০১৯১৭ ০৫৭৬৭৬, ০১৭০৬ ১০৮০৩০

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যকরী কমিটি

১০, খেলাঘর রেলওয়ে মার্কেট, তেজকুনিপাড়া, ঢাকা-১২১৫

শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মণ
সভাপতি

অরুণ চন্দ্র ভৌমিক
সহ-সভাপতি

সুখলাল নন্দী
সাধারণ সম্পাদক

প্রিয়লাল শর্মা
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

হিরালাল বাইন
কোষাধ্যক্ষ

মৃত্যুঞ্জয় রায়
সদস্য

শিশির রঞ্জন দাস (বাবু)
সদস্য

প্রমোদ রঞ্জন রায়
সদস্য

নেপাল দে
সদস্য

সঞ্জীব মৈত্র
সদস্য

রনধীর বিশ্বাস
সদস্য

প্রবীর কুমার সরকার
সদস্য

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	আবেদনকারী সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	আবেদনকারী সদস্যের নাম
০১	শ্রী প্রদীপ কুমার সাহা	২৮	শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস
০২	শ্রী শ্যামল মিত্র	২৯	শ্রী রনজিৎ কুমার সরকার
০৩	শ্রী ভবেশ গোস্বামী	৩০	শ্রী গনেশ চন্দ্র বিশ্বাস
০৪	শ্রী কেশব সেন	৩১	শ্রী গৌর চন্দ্র ঘোষ
০৫	শ্রী শ্যামল কুমার দাস	৩২	শ্রী চঞ্চল চৌধুরী
০৬	শ্রী অশোক কুমার ধর	৩৩	শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস
০৭	শ্রী বিশ্বজিৎ চন্দ্র শীল	৩৪	শ্রীমতি নমিতা রায়
০৮	শ্রী সংগীত কুমার ঘোষ	৩৫	শ্রী অনিল কৃষ্ণ বিশ্বাস
০৯	শ্রীমতি কবিতা রানী পাল	৩৬	শ্রী গোবিন্দ হালদার
১০	শ্রীমতি নমিতা চক্রবর্তী	৩৭	শ্রী প্রদীপ কুমার বাড়ৈ
১১	শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার পাল	৩৮	শ্রী নারায়ন চন্দ্র সাহা
১২	শ্রী শান্তনু দাস বাপ্পী	৩৯	শ্রী সনৎ দত্ত
১৩	প্রফেসর স্বপন কুমার বনিক	৪০	শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
১৪	শ্রী মানিক লাল দাস	৪১	শ্রীমতি বীণা রানী দাস
১৫	শ্রী বিমল কৃষ্ণ দেব	৪২	শ্রী বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস
১৬	শ্রী চন্দন দেবনাথ	৪৩	শ্রীমতি চঞ্চলা সরকার
১৭	শ্রী দীপক লাল কর্মকার	৪৪	শাশ্বতী বিশ্বাস
১৮	শ্রী মিলন কৃষ্ণ দাস	৪৫	অদিতি বিশ্বাস
১৯	শ্রী বিজন কুমার বিশ্বাস	৪৬	ডাঃ চন্দ্র শেখর বোস
২০	শ্রী রতন কুমার বিশ্বাস	৪৭	শ্রী বাবুল চন্দ্র ঘোষ
২১	শ্রী স্বপন দাস	৪৮	শ্রী নারায়ন চন্দ্র দে
২২	শ্রী গোপাল চন্দ্র দেবনাথ	৪৯	শ্রী রবীন্দ্র নাথ বর্মণ
২৩	শ্রীমতি বকুল রানী দেবী	৫০	শ্রী রাম প্রসাদ সরকার
২৪	শ্রী প্রদীপ সেন	৫১	শ্রী শিবু কুমার দাস
২৫	শ্রী গোপাল চন্দ্র দত্ত	৫২	শ্রী প্রকাশ কুমার দাশ
২৬	শ্রী শচীন্দ্র কুমার সরকার	৫৩	শ্রী নরেশ চন্দ্র দত্ত
২৭	শ্রী দুলাল দেবনাথ	৫৪	শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	আবেদনকারী সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	আবেদনকারী সদস্যের নাম
৫৫	শ্রী দেবেশ চন্দ্র সরকার	৭৩	শ্রী উত্তম কুমার দাস
৫৬	শ্রীমতি অলকা রানী সরকার	৭৪	শ্রীমতি টুম্পা দাস
৫৭	এডভোকেট বিণয় কৃষ্ণ পোদ্দার	৭৫	শ্রীমতি মিনতী শর্মা
৫৮	শ্রী রতন কুমার রায়	৭৬	শ্রী রঞ্জিত কুমার পাল
৫৯	শ্রী সুভাস মজুমদার	৭৭	শ্রী চন্দন কুমার মজুমদার
৬০	শ্রী সমীর চন্দ্র দত্ত	৭৮	শ্রীমতি প্রিয়াংকা সরকার
৬১	শ্রী পরিমল চন্দ্র পাল	৭৯	শ্রীমতি রীতা অধিকারী
৬২	শ্রী অমরেশ চন্দ্র দাস	৮০	শ্রীমতি মিনি রানী কীর্ত্তনীয়া
৬৩	শ্রীমতি মিতালী রায় চৌধুরী	৮১	শ্রী অমর চন্দ্র দত্ত
৬৪	শ্রী পরিমল কুমার বিশ্বাস	৮২	ডাঃ কল্যানী রানী দত্ত
৬৫	শ্রী ঝন্টু চন্দ্র সাহা	৮৩	শ্রী স্বপন কুমার কুন্ড
৬৬	শ্রী অপূর্ব কুমার রাহুত	৮৪	শ্রী চন্দন কুমার সাহা
৬৭	শ্রীমতি শুক্লা বিষ্ণু	৮৫	শ্রীমতি মনিকা শর্মা
৬৮	শ্রীমতি ঊষা রানী দত্ত	৮৬	খোকন কান্তি শর্মা
৬৯	শ্রী বিমল হালদার	৮৭	কনিকা শর্মা
৭০	শ্রীমতি জয়শ্রী শর্মা	৮৮	মধু সুদন মন্ডল
৭১	শ্রী অসীম কুমার দাস	৮৯	জীবন কৃষ্ণ মোদক
৭২	শ্রী সুবিমল সিকদার	৯০	রথীন্দ্র নাথ দত্ত

শারদীয় শুভেচ্ছা

DIPJIT FOR
POWER SOLUTIONS,
RECONDITIONED VEHICLES

DIPJIT ENTERPRISE

Electrical Erectors, Consultants, Importers, Suppliers, Transporters and Auto Dealers

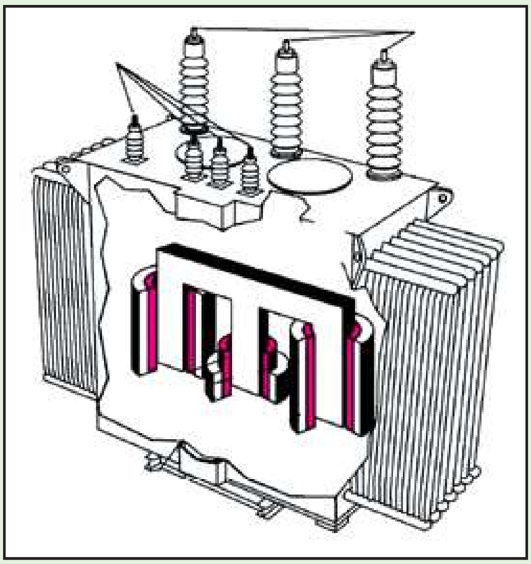

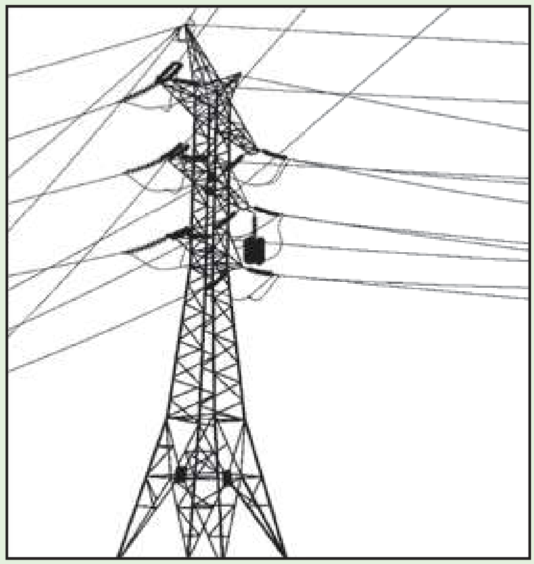

"Hyatt Monowara Garden" (1st Floor),
58, Mirpur Road (Science Laboratory Road), Dhaka-1205
Tel: 02 9611251, 02 9669025

Web: www.dipjit.com | **E-mail : dipjit.enterprise@gmail.com**

শারদীয় দুর্গা
পূজার শুভেচ্ছা
চৈতী জুয়েলার্স
১৭৯/৮০ ফার্মভিউ সুপার মার্কেট (২য় তলা) ফার্মগেট ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৯১২২৬৫০, মোবাইল : ০১৭১১-৩৮৭৭৮৯, ০১৭১১-০৬২১৫৪

মঙ্গলবার পূর্ণ দিবস বন্ধ
নিউ ডিজাইনের দেশী ও বিদেশী রকমারী গিনী সোনার অলংকার অনন্য প্রতিষ্ঠান
শারদীয় দুর্গা
পূজার শুভেচ্ছা
নিউ এ পি জুয়েলার্স
(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)
আমরা শুধু আধুনিক ডিজাইনের ২২, ২১ ও ১৮ ক্যারেটের হলমার্কযুক্ত
অলংকারই গড়ি না বরং স্বর্নের মানও রক্ষা করি
১৫৭ ফার্মভিউ সুপার মার্কেট ২য় তলা ফার্মগেট ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৮১২৭৪১৫, : ০১৮১৫-০৬১২৯৯, : ০১৯৩৬-০৮১৮০০

nrb bazaar

Buy Local Products Globally

ঘরে বসে অর্ডার করুন আপনার পছন্দের পণ্য, ডেলিভারি নিন আপনার দোরগোড়ায়।

অর্ডার করতে কল করুন এই নাম্বারে

+880 9613 717171

উপভোগ করুন আকর্ষণীয় সব অফার

www.nrbbazaar.com +880 9613 717171 /nrbbazaar

nahee SS PIPE
TIMELESS BEAUTY

@ info@nahee.com.bd
www.nahee.com.bd

Specialty of Nahee SS Pipes

- Manufactured by latest advanced technology
- Produced by using best quality SS Sheet/Coil
- Trained & Expert Production Team
- Accurate Diameter
- Right Thickness
- Perfect Mirror Polish
- Perfect Welding and Seam
- Proper Strength
- Properly Bendable
- Laser Print
- Customized Size
- On Time Delivery

corporate office: house-26, road-03, block-i, banani, dhaka-1213. **tel:** +88-02-9871401, 9871402, 9872183, **fax:** +88-02-9870824 **cell:** +88 01777 763 482
factory: abdar, telehati, sreepur, gazipur, bangladesh. **email:** info@nahee.com.bd, **web:** www.nehee.com.bd **facebook :** /naheesspipe

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড

নিবন্ধন নং-৪০৬

কার্যালয় : ১০, খেলাঘর ক্লাব মার্কেট, তেজকুনী পাড়া, ঢাকা-১২১৫
যোগাযোগ : ০১৭১১৯০৫২০৬, ০১৯১৭০৫৭৬৭৬, ০১৭১৬১০৮০৩০

দয়া করে কেউ এড়িয়ে যাবেন না
দেশের সনাতন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও
সামাজিক মুক্তির এটিই একমাত্র সনদ

দৃষ্টি আকর্ষন

দেশের হিন্দুধর্মীয় সংখ্যালঘুরা মাথা উঁচু করে মানুষের মত মানুষ হয়ে বেচে থাকতে চায়। এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা থেকে সম্প্রতি "দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড" নিবন্ধন করা হয়েছে। মূলত: সনাতন সমাজ উন্নয়নই এর একমাত্র লক্ষ্য।

দেশের সচেতন সনাতন সমাজ এ কথা কঠিন বাস্তবতা দিয়ে উপলব্দি করছেন যে, দীর্ঘ কাল যাবত তারা একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে চলে আসছেন। বিরুপ পরিস্থিতি ও প্রতিকুল পরিবেশ তাদের জীবন জীবিকাকে কখনো কখনো অস্থির ও অনিশ্চিত করে তুলেছে। একই সাথে সম্মান ও নিরাপত্তাও থাকে ঝুঁকিপূর্ণ।

আমরা দেখতে পাই সনাতন সমাজ এর জন্য বসে নেই। মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টায় কর্মকান্ড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কিছু সনাতন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক ছাত্র, যুব সংগঠন ভূমিকা রাখছেন।এগুলোর মধ্যে প্রেস ক্লাবে গণজমায়েত, প্রশাসনকে স্মারকলিপি প্রদান, মিছিল ও মিটিং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রাজধানী কেন্দ্রীক এ সব কর্মকান্ডের দ্বারা দেশের হিন্দু জন গোষ্ঠীকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যা প্রশংসার দাবী রাখে।

কিন্তু পরিস্থিতি মূল্যায়নে শুধু এ ধরনের কর্মকান্ডের মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এর জন্য সনাতন সমাজের অর্থনৈতিক শক্তিকে শক্তিশালী করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি একটি বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে অর্থনৈতিক শক্তিকে শক্তিশালী করে হিন্দু সংখ্যালঘূ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তার অন্তর্ভূক্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও উপযুক্ত কর্মস্থান প্রভৃতি সার্বিক মৌলিক বিষয় গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে সকলের দ্বারে পৌছাইতে না পারলে কোন প্রচেষ্টাই কাংখিত কল্যান নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে না।

শতভাগ আত্মবিশ্বাসী হয়ে সততার সাথে আত্মনিবেদিত আমাদের প্রচেষ্টা দ্বারা নিজেদেরকে সমৃদ্ধশালী করতে পারলেই রাষ্টীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আমাদের চিন্তা-চেতনা, গবেষনা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে উঠে এসছে একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিকে নিশ্চিত করেছেন। আজ সমবায় সমিতি হচ্ছে তাদের দেশব্যাপী জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ হবার মূলমন্ত্র। যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হয়েছে তার বর্ণনা করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। এক কথায় তারা তাদের মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করেছেন। তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের যোগান নিজেরাই করে নিচ্ছেন। দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করেছেন। কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষা-নিশ্চিত করার পাশাপাশি লাভজনক খাতে বিনিয়োগ থেকে বড় অংকের বার্ষিক লভ্যাংশ ভোগ করছেন। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে।

পটভূমি

আজ যে স্বপ্নের বীজ বুনতে চলেছি সে প্রেক্ষাপট স্মৃতির পাতায় রাখার আবশ্যকতা শুধুই ইতিহাসের সৌজন্যে। এক্ষেত্রে ১৮১, তেজকুনী পাড়ায় মেডিসিন কর্ণার হলো উৎস ভূমি। শ্রী শচিন্দ্র চন্দ্র বর্মন হলেন এর পরিচালনায়। এলাকায় তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমরা পরস্পরের সাথে পরিচিতি লাভ করতে থাকি। পর্যায়ক্রমে শ্রী সুখলাল নন্দী, শ্রী অপূর্ব রাহুত, শ্রী হীরালাল রাইন, শ্রী অরুন ভৌমিক, শ্রী প্রদীপ সরকার, শ্রী সঞ্জীব মৌত্র, শ্রী প্রমোদ রঞ্জন রায়, শ্রী নেপাল দে, শ্রী তপন রায় প্রমূখ উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে আলোচ্য সমিতির কর্মকান্ড বিস্তারে এগিয়ে চলার সপথ গ্রহণ করা হয়। আমাদের শ্লোগান একটাই:

"যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, বিশ্বাস হৃদয়ে
হবেই হবে দেখা, দেখা হবে বিজয়ে"

সমিতির প্রতিটি পদক্ষেপ হবে মেধাভিত্তিক। মেধার মূল্যায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য সকলকে আন্তরিক আহবান জানাই। তেজগাও থানাকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে মহানগরীর উত্তর-দক্ষিণ সকল থানা এলাকার সনাতন সমাজের সকলকে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রতিটি এলাকার জন্য একই রকম কার্যক্রমের কাঠামো থাকছে। কাজের গতিধারা সচল রাখতে সর্বক্ষেত্রে সহজ সরল নিয়ম পদ্ধতি বজায় রাখা হবে। যে কোন প্রকার ভূলভ্রান্তি তাৎক্ষনিক ভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমাধা করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের সংগঠনটি হবে সর্বাধুনিক একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" এ ভ্রাতিত্ববোধ আমাদের আত্মবিশ্বাসী করবে।

ক্ষুদ্র থেকেই বৃহত্তের সৃষ্টি। আমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হবে। পর্যায়ক্রমে সঞ্চয় ও লাভের অর্থ অধিকতর লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে সমৃদ্ধির সোপানে বেয়ে উন্নতির শিখরে উঠতে হবে। সঠিক ব্যবস্থাপনা, অনুকূল শর্তে নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য অর্থের সংস্থান, সমবায় নীতির সঠিক বাস্তবায়ন, কঠোর পরিশ্রম, সততা, ধৈর্য্য আমাদের চালিকা শক্তি। এভাবেই সহসা আমরা আমাদের মাঝে দেখতে পাবো হিন্দু সমাজের প্রথিতযশা, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দক্ষ, যোগ্য এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক ঝাঁক পরিচালনা পর্ষদ। আমরা দেখতে পাবো দেশ ও আন্তর্জাতিক বহু ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন আমাদের পাশে এসে দাড়িয়েছে। তাঁরাও তাদের সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

অগ্রগতি

আপনারা জেনে খুশী হবেন তেজকুনী পাড়া এলাকায় পুজা অর্চনা করার জন্য হিন্দুদের কোন মন্দির না থাকায় "তেজগাঁও থানা সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ" নামে আমরা একটি সংগঠনের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মন্দির নির্মানের কাজকে এগিয়ে নিয়েছি। এ কাজে আমাদের সহায়তার জন্য এলাকার রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব সহানুভূতির সাথে অকুণ্ঠ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রস্তাবিত মন্দির নির্মাণ করে এর সাথে রাজধানীর ছোট বড় সকল মন্দির গুলোর সাথে আন্ত:মন্দির সম্পর্ক গড়ে তুলব। আন্ত:মন্দির ও এলাকা ভিত্তিক ব্যক্তিগত যোগাযোগের দ্বারা আমরা সমিতির কর্মকান্ডকে সম্পৃক্ত করতে চাই। আপনারা জেনে খুশী হবেন সবার সহযোগীতায় গত বছরের মত এবারেও আমরা মহাসমারোহে দুর্গোৎসবের আয়োজন সুসম্পন্ন করেছি। গত দু'বছর আমরা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে বানী অর্চনা সম্পন্ন করেছি। সময়ের প্রয়োজনে সফলতা অনিবার্য। সকলের সহায়তাই আমাদের চলার পথের পাথেয়।

সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা

১। হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত ১৮ (আঠার) বছর বয়স থেকে যে কোন নারী/পুরুষ। ১৮ (আঠার) বছরের নীচে হলে অভিবাবকের সম্মতিতে সদস্যপদ গ্রহণ করা যাবে।

২। দৈহিক ও মানুসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে হবে।

৩। দেশের সকল হিন্দু সম্প্রদায়কে আত্মীয় পরিজন হিসেবে গণ্য করার মানুসিকতা থাকতে হবে।

৪। সমিতির প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ও অনুগত হতে হবে।

৫। রাষ্ট্রবিরোধী নয়, কোন আদালত কর্তৃক কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে দন্ডিত হয়নি এমন যে কোন ব্যক্তি সদস্য হতে পারবেন।

সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

১। নির্ধারিত ফরমে ১০০/-(একশত) টাকার ভর্তি ফি সহ আবেদন করতে হবে।

২। সাধারণ মাসিক চাঁদা ৩০০/-(তিনশত) টাকা। বিশেষ মাসিক চাঁদা হিসেবে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা এবং ১০০০/-(এক হাজার) টাকা প্রদান করা যাবে। সেক্ষেত্রে তারা আনুপাতিকহারে লভ্যাংশ পাবেন।

৩। ৪ (চার) কপি পাসর্পোট সাইজের ছবি, নমিনির ১ (এক) কপি ছবি সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ডের কপি।

বিনিয়োগ পরিচালনা

সমিতির রয়েছে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প পরিকল্পনা। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মুলধনের যোগান নির্ভর করছে। মুলধনের যোগান অনুযায়ী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে সকলের সাথে আলোচনা করে ঝুকিমুক্ত ও নিরাপদ বিবেচনায় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। উদাহরণ হিসেবে এলাকা ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প (ভবিষ্যতে ব্যাংক লিজিং প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা), নিত্যপণ্যের সমবায় বাজার (ভবিষ্যতে বিশেষ পণ্যের শিল্প গড়ে তোলা), ঔষধের দোকান (ভবিষ্যতে ঔষধ শিল্প/হাসপাতাল), বিউটি পার্লার (ভবিষ্যতে কসমেটিক শিল্প), লন্ড্রী (ভবিষ্যতে ওয়াশিং প্লান্ট), নির্মাণ সামগ্রীর দোকান (ভবিষ্যতে সিমেন্ট শিল্প/লৌহজাত পণ্যের ভারী শিল্প), রেষ্টুরেন্ট (ভবিষ্যতে ইন্টার ন্যাশনাল হোটেল/পর্যটন শিল্প), আড়তদারী (ভবিষ্যতে এজেন্সি ব্যবসা), সেলুন ইত্যাদি। যে কোন ক্ষুদ্র প্রকল্পের সাথে বৃহৎ প্রকল্পের সম্পৃক্ততা থাকে। ক্ষুদ্র প্রকল্পের সফলতার উপর বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে আরো কিছু প্রকল্পের ধরনা দেয়া যেতে পারে :-

এলাকাভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনিস্টিক সেন্টার, শিক্ষার্থীদের জন্য কিন্ডার গার্ডেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক হল নির্মাণ, আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক সব ধরনের পরিবহণ ব্যবসা, চায়নিজ, ফাস্টফুড, প্রিন্টিং, প্যাকেজিং, গার্মেন্টস, রেন্টএ কার, ট্র্যাভেল এজেন্সি, ঠিকাদারী, সিএন্ডএফ, বুকস এন্ড পাবলিকেশন, সেনিটারী-টাইলস, জুয়েলারী, কনফেকশনারী, অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস, রি-ফ্রিজারেশন, জ্বালানী তেল, ইটভাটা, হাউজিং ইত্যাদি হাল্কা ও ভারী শিল্প কল কারখানায় সমপোযোগী বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিনিয়োগের প্রতিটি ধাপে সমিতির বিধি বিধানের আওতায় সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিচার বিশ্লেষণ অনুসরণ করা হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উপযুক্ত লোকবলের পরিচালনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। আমরা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মানে বদ্ধ পরিকর। যে কোন রকম অযোগ্যতাকে পরিহার করা হবে। যে কোন প্রকার শৃংখলা বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য গঠন তন্ত্র অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিকভাবে রাজধানীর ৫০টি থানায় নূন্যতম ২০জন সদস্য নিয়ে মোট ১০০০জন সদস্য ৩০০/-টাকা প্রতিমাসে চাঁদা প্রদান করলে মোট চাঁদার পরিমান হচ্ছে মাসে ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা। তার সাথে এককালীণ সমস্য ফি ১০০/-টাকা হারে আসছে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা)। সুতরাং সমিতির কাজের জন্য মূলধনের কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে ইতোমধ্যেই মহানগরীর প্রতিটি থানায় কাংখিত প্রতিনিধি নির্বাচনের কাজ সমাপ্তির পথে। আশা করছি দুর্গা পুজার উৎসব পরবর্তী এ কাজকে আরো বেগবান করা হবে।

কেন্দ্র থেকে তৃনমূল পর্যায়ে কল্যানমূখী কর্মকান্ড

১। সমিতিভূক্ত সকল সদস্য পরিবারের ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান।

২। চিকিৎসার প্রয়োজনে সার্বক্ষনিক এমবুলেন্স-এর ব্যবস্থা করা।

৩। মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য শশান নির্মাণ/সংস্কার করা এবং পরোলৌকিক কাজের জন্য স্থান নির্মাণ করা।

৪। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে লেখা পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫। বেকার যুবক/যুবতীদের দেশে-বিদেশে চাকুরীর সুব্যবস্থা করা।

৬। ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষায় সহায়তা করা।

৭। দেশের সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করা।

৮। নামমাত্র স্বল্প হারে পুজি/মুলধনের যোগান দেওয়া।

পরিশেষ

অত্যান্ত স্বল্প পরিসরে যথাসম্ভব আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত কামনা করছি। আপনাদের যে কোন গঠন মূলক পরামর্শ আমরা সানন্দে গ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছি। আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনায় সচেষ্ট রয়েছি। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই জনসংযোগ টিম গঠন করা হয়েছে। আপনাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ আমাদেরকে উৎসাহিত করবে। আসুন আমরা দেশের আপামর হিন্দু জনগোষ্ঠী মিলেমিশে নিজেদের ভাগ্য বদলে মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকি। সেই সাথে দেশকেও সমৃদ্ধ করি।

আসুন সবাই মিলে এক সাথে আমরা আমাদের স্বপ্নপূরণ করি।

TOPPER™
Pressure Cooker
সব রেসিপির
সহজ সমাধান
ফুড গ্রেড এলুমিনিয়াম থেকে তৈরি টপার প্রেসার কুকারে রান্না হয় ৫৫% পর্যন্ত দ্রুত গতিতে।
এখন থেকে আপনার পছন্দের রেসিপি রান্না হবে নিমিষেই।
৫ বছরের ওয়ারেন্টি
RFL®
আর এফ এল
এর একটি পণ্য
Hot Line 09613737777 | 08007777777 (Toll Free)
/TOPPER.RFL

The best way
to send money
worldwide
EASY
FAST
SECURE
small world
Money Transfer
Send money in minutes
from your phone with
our FREE mobile App
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES GROUP LTD
Company Registration Number: 05405279
12 Salamanca Place
London, SE1 7HB, UK
info@smallworldfs.com
+44 0 20 7378 1100
www.smallworldfs.com
small world
Money Transfer

ড্রীম হলিডে পার্কের পক্ষ থেকে সকলকে
শারদীয় দুর্গোৎসব এর শারদ শুভেচ্ছা
New Attractions!
E-mail: dreamholidayltd@gmail.com
www.dreamholidayparkbd.com
প্রকৃতির অপরূপ ছোঁয়ায়, তুষার শুভ্র হিমালয়ের নির্মলতায়, মন মাতানো পাহাড়ী ঝর্না আর সমুদ্রের গর্জন শুনতে প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে স্বপরিবারে চলে আসুন ড্রীম হলিডে পার্কে।
DREAM HOLIDAY PARK
পাঁচদোনা, নরসিংদী।
Phone : 9564046, 9570140-41, 7630225, Mob : 01762-696302-306

Marisolves Pte Ltd

Marisolves Pte Ltd, an established trading company based in Singapore, has made a remarkable growth since its inception while dealing with Marine, Oil & Gas & Power Generating Industries.

- We strive to be the Market leader in Asia by providing excellent customer service and quality products to our customer.

Our Services:

- Marine Survey
- Spare Parts
- Navigation & Communication Item
- Fiber Glass & Aluminium Boat Building
- Metal Recycling
- Trading

Spare Parts :

- Diesel & Gas Engine
- Auxiliary Engine
- Turbo Charger
- Heat Exchanger
- Gas Compressor
- Boiler
- Pumps
- Fresh Water Generator
- Refrigerator & Air Conditioner.

Fiber Glass & Aluminium Boat:

We are associated with Fiber Glass & Aluminium Boat Builders. Building of Vessel lengths from 6 Mtrs. up to 30 Mtrs.

- Fishing Boats,
- Passenger Ferries,
- Luxury Motor Yachts.
- Commercial & Work Boats,
- Patrol & Surveillance Crafts,

All boats are manufactured in Accordance to an International Standard where quality is never compromised.

Metal Recycling:

Our metal recycling team deal with wide range of Non Ferrous metals e.g. Titanium, Aluminium, Copper, Stainless Steel and Zinc etc.

Marine Survey:

We offer services which include
- Pre-Purchase & Condition Survey
- Damage Survey
- P&I Pre-entry
- Valuation
- On & Off Hire
- Towing Survey
- Owner Fleet & ISM audit

Contact US:

MARISOLVES PTE LTD
131, Jurong Gateway Road, # 04-263, SINGAPORE: 600131
Tel: (65) 6569 5152 Fax: (65) 65695150
EMAIL: contact@marisolv.com
Website: www.marisolv.com

কবিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
প্রণয় কান্তি বিশ্বাস

তুমি বাঙালির বন্ধু বঙ্গবন্ধু, বিশ্ববন্ধু তুমি।
তুমি জাতির পিতা শেখ মুজিব, শান্তির দূত তুমি ॥

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তুমি বাঙালির অহংকার।
বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, তুমিই স্রষ্টা, ইতিহাস দেবে সাক্ষ্য তার ॥

৭ই মার্চে রেসকোর্সের জনসমুদ্রে, তোমার বজ্রকণ্ঠে আসে স্বাধীনতা ডাক।
তোমার তর্জনীর গর্জনে বীর বাঙালি অস্ত্র ধরে পরাজিত করে পাক ॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছে বাংলা ভাষাকে জগৎ সভায় ঠাঁই।
বঙ্গবন্ধু তুমি বিশ্বমানচিত্রে এঁকেছো বাংলাদেশ, আমরা গর্বিত তাই ॥

তোমার ত্যাগ, তোমার প্রত্যয়, মহিমা তোমার, ভোলা কি কখনও যায় ?
তোমার কৃতিত্ব অলৌকিক, ঐশ্বরিক, যার তুলনা মেলা দায় ॥

তোমার সোনার বাংলা গড়বো আমরা, জয় বাংলা বাংলার জয়।
পুঁজিবাদ, ধর্মান্ধতা, জঙ্গীবাদের প্রাসাদ ভাঙবো এই হোক প্রত্যয় ॥

বঙ্গবন্ধু, তোমার কীর্তি কলঙ্কহীন চির উজ্জ্বল চির অমলিন।
বাঙালি হৃদয়ে তুমি চির জাগরুক, সাধ্যকার শোধিতে তোমার ঋণ ॥

তুমি বাঙালির বন্ধু বঙ্গবন্ধু, বিশ্ববন্ধু তুমি।
তুমি জাতির পিতা শেখ মুজিব, শান্তির দূত তুমি ॥

দুর্গা মায়ের সার্বজনীতা
বিক্রম চন্দ্র দাস

আমরা সবাই ভাই ভাই
আমাদের কোন বিবাদ নাই
চলো সবাই পূজায় যাই
মা আমাদের ডাকছে ভাই
করতে হবে আদর যত্ন
রাখা যাবে না ত্রুটি
সবার উপরে মা যেন
থাকে সন্তুষ্টি।

আমাদের যত চাওয়া পাওয়া
পূর্ণ করবে মা
মায়ের কাছে আমরা সবাই
করি এই প্রার্থনা।

আমরা সবাই মায়ের সন্তান
জানাই মাকে প্রণাম
এসো সবাই দলে দলে
অর্ঘ্য করি সবে মিলে
ঢাক- ঢোল আর করতালে
নৃত্য করবো সবাই মিলে
আনন্দতে গাইবো সবাই
জয় মা দুর্গা বলে।

মেঘের বৃষ্টি
দীপান্বিতা কর্মকার

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
সূর্য বিদায় গেছে,
ঝড়ো হাওয়ার প্রবল নাচন
উঠলো গাছে নেচে।
আমের শাখায় হেলে দুলে
গুচ্ছ গুচ্ছ আম,
সবুজ পাতায় দিচ্ছে উঁকি
কচি মুকুল জাম।
কৃষ্ণচুড়ার লাল আগুনের
কি অপরূপ শোভা,
কালো মেঘের মাথায় প'রে
কৃষ্ণচুড়ার খোঁপা।
হলুদ সবুজ বেগুনী রঙের।
আকাশে আলপনা,
জারুল শিরিশ কানাকানি
ডাকছে ব্যাঙের ছানা।
মাঝে মাঝেই আলোর নাচন
বজ্রপাতের শব্দ
খোকা খুকু মায়ের কোলে
এক্কেবারে জব্দ।
আমার মনে ভীষণ খুশী
পড়ার ব্যাগের ছুটি।
ইচ্ছে করছে জলে কাদায়
করতে লুটোপুটি।
বৃষ্টি কখন থমবে গো মা?
আম তলাতে যাবো;
আম কুড়িয়ে কাল দুপুরে
আমের আচার খাবো।
স্কুলের ব্যাগে থাকবে চাকু
ঝাল-নুন আর চিনি,
টিফিন হলে সবাই মিলে
করবো ছিনিমিনি।
হৈ চৈ আর হট্টগোলে
কানের ঝালাপালা
দিদি মনি বলবে শুনে
এবার তোরা পালা
ক্লাস মনিটর বাজিয়ে দেরে
স্কুলের ছুটির ঘণ্টা,
ঝড়ের বৃষ্টি এমনই হোক
খুশি ভর্তি মনটা।
সবাই মিলে আজো বলি,
ঠাকুর, ঝড় যেন আজ আসে।

দুর্গা পূজা
দেবনীতা দাস অমৃতা

দুর্গা পূজায় করব আনন্দ
করবো নাচ, গান, আরও ছন্দ
এই আনন্দে মেতে উঠবে সবে;
আনন্দের চেয়ে ভক্তি বেশি রবে।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী
আরও আছে ষষ্ঠী ও দশমী।
নানা জায়গায় দেখব পূজা
দুর্গা পূজায় করব অনেক মজা।

পূজা দেখব সবার সাথে,
শান্তি করে মন,
মজা করব যাওয়ার পথে,
দুর্গা পূজা যে এখন।

ওগো- মা,
তুমিই মোদের শক্তি দাতা
তুমিই মোদের আশ্রয় দাতা
কারণ তুমি যে মোদের মাতা।

শ্মশান
বেলা রায়

ঐ দেখা যায় শ্মশান ঘাট
ঐ আমাদের ঘর
ঐ খানেতে থাকতে হবে সারা জীবন ভর।
ও শ্মশান তুই চাস কি
টাকা পয়সা নিস কি ?
ঘুষ আমি খাইনা,
সৎ, মানুষ পাই না।
একটা যদি পাই
অমনি তাকে স্বর্গেতে পাঠাই।

জীবন ও নদী

অসীম কুমার দাশ

জীবন ও নদী স্রোতের মতো বহমান
নদীর একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে
ভাঙ্গা গড়ার খেলায়
আশায় চর জাগে তার বুকে।

জীবন, নদীর মতো দোলাচলে দোলে
ভালোবাসার খেলা খেলেচলে
যৌবনের তোড়ে, গড়ে ভালোবাসার মিনার
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়িষ্ণু জীবন পড়ে ঝড়ে।

দু'পার জুড়ে ঝাউবন
ঘূর্ণিপাকে উড়ে
অজস্র মানুষের বেশে
ঠাই দাঁড়িয়ে, বাঁচার তাগিদে।

সুখের রেশে বরষা ভরা যৌবনে
ভালোবাসার দোল খেলে
টলমল জলে।

বিরহী সুরে গ্রীষ্মের তোড়ে
ধূ ধূ মরুভুমি গড়ে
আশা নিরাশার দোলাচলে
মরুর চর জাগে হৃদয়ে
তবুও বহমান নদী ও জীবন
ছুটে চলে আপন গতিতে।

NOVA STATIONERY & COMPUTER

FOR ALL KIND OF STATIONERY & OFFICE SUPPLY- A RELAIBLE NAME

SHOP # 117, 10, TAHER TOWER SHOPPING CENTER, GULSHAN-2, DHAKA, BANGLADESH.
Tel: 98569154, 01813853771

' ঘর আলো করে আছে আমার দুই সন্তান,
সুখে শান্তিতে পূর্ণ আমার জীবন। নিশ্চিন্ত হতে
আমি স্থায়ী পদ্ধতি টিউবেকটমি গ্রহণ করেছি '
• মহিলাদের জন্য স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি
• পরামর্শ ও সেবার জন্য নিকটস্থ সেবাকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন
আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
HPNSP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রচারে: আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়

“স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি করুন
দেশের সমৃদ্ধির অংশীদার হউন”

দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে
জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

সব উৎসবে
আপনার পাশে
ওয়েল ফুড™
Well Food
Made Fresh Everyday
Bela biscuit
Bread
CAKE RUSK
www.wellfoodbd.com
CORPORATE SALES
01709640082
HOME DELIVERY
01709663665
A Concern of
WELL™ GROUP
WellFoodDhaka
WellFoodsLimited
Well Food Sylhet

বাবা এক অটল
আস্থার নাম
বাবাদের সেই ভালোবাসার নির্মাণকে আরো
মজবুত রূপ দিতে আমরাও আপোষহীন।
সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী 500W স্টিল নিশ্চিত করে
দীর্ঘস্থায়ীত্ব, নমনীয়তা ও সর্বোচ্চ স্ট্রেংথ।
দেয় যুগ যুগ ধরে সুরক্ষার আস্থা
HKG STEEL
নির্মাণে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা
www.hkgsteel.com

www.bankasia-bd.com
MAKE YOUR
DREAM HOME A REALITY
HOME
LOAN
RedRocket/Bank Asia/2016
Call:
16205 (24/7) &
+880 4470019595
Bank Asia
*Terms & conditions apply

BASHUNDHARA GROUP
For the People, for the Country

দেশের বৃহত্তম পেপার ব্র্যান্ড
বসুন্ধরা পেপার
Superbrands
BANGLADESH
পুরস্কারে ভূষিত

এ অর্জন বসুন্ধরা পেপারের সকল ভোক্তা,
ব্যবসায়িক সহযোগী এবং শুভানুধ্যায়ী-সকলের।

সভ্যতার অগ্রযাত্রার বাহক হচ্ছে কাগজ। এ দেশের কাগজের চাহিদা যখন প্রায় পুরোটাই বিদেশ নির্ভর,
১৯৯৩ সালে তখন ব্যক্তিমালিকানায় সর্ববৃহৎ পেপার মিল হিসেবে **বসুন্ধরা পেপার মিলস্ লিঃ** এর যাত্রা শুরু।
আর বিগত ২৫ বছর ধরে **বসুন্ধরা পেপার**-এর প্রতি ভোক্তাদের বিশ্বাস ও আস্থার প্রতিফলন এ বিশ্বখ্যাত Superbrands অ্যাওয়ার্ড।

বসুন্ধরা
মাল্টি পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

বসুন্ধরা পেপার মিলস্ লিঃ

ভিজিট করুন
www.bashundharapapermills.com